আশমানতারা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য-রত্ন, বিদ্যাবিনোদ

দুই টাকা চারি আনা

উপহার

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের লিখিত "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। অনেকের মতে উক্ত গ্রন্থ ঐতিহ্যের সত্যতা-সম্বন্ধে প্রামাণ্য নহে। রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যদুনারায়ণ বা পরে গৌড়-বাদসাহ জালালুদ্দিনের বিষয় ঐ গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইংরাজী বা বাঙ্গালা ইতিহাসে বোধ হয় এত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই,—অবশ্য, আমি আমার সামান্য ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। উপন্যাস উপন্যাস,—ইতিহাস নহে; সুতরাং, ঐতিহাসিক সত্যতার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া উপন্যাস রচিত না হইলেও তাহা উপেক্ষণীয় হয় না,—যদি তাহাতে ঘটনা-বৈচিত্র্য ও চরিত্র-চিত্রণ সঙ্গত ও সার্থক হয়।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এই যুগ-পরিবর্ত্তনের দিনে জাতীয় উত্থানের প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হিন্দু-মুসলমানে অনৈক্য—তাহারই সমস্যা-সমাধান-সূচক কোনও দৃষ্টান্ত দাখিল করা। বসিরহাট বাণী-সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সমাগত সাহিত্যিক-মণ্ডলীকে উক্ত সমস্যা-পূরণ-ব্যাপারে লেখনী-চালনা করিতে উপদেশ দেন। সেই সময় হইতে ঐ বিষয় লইয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে জাগরূক হয়। বিষয়টী দুরূহ হইলেও আমি মহতের বাণী অনুসরণ করিয়াছি মাত্র। দীন লেখনীতে সে উদ্দেশ্য কত দূর সফল হইয়াছে,—হিন্দু-মুসলমান সুধী পাঠক ও পাঠিকাগণ তাহার বিচার করিবেন। বলা বাহুল্য, "সামাজিক ইতিহাসে" বর্ণিত আখ্যায়িকার যে যে অংশ

চরিত্র-সৃষ্টি ও সাম্যের পরিপন্থী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে;—সেগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি এবং চরিত্র ও সাম্যেরই সৌষ্ঠব-সাধনের জন্য কতিপয় অনৈতিহাসিক চরিত্রের অবতারণাও করিয়াছি। যদি এই গ্রন্থ পাঠে আজ এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের অগ্ন্যুৎপাতে বিধ্বস্তপ্রায় হিন্দু-মুসলমান হৃদয়-ক্ষেত্র কথঞ্চিৎ শীতল হয়, তাহা হইলে, আমার কামনা পূর্ণ হইবে।

অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, যাঁহার উৎসাহ-বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া আমি সাহিত্য-সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই গ্রন্থ যাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছি, সেই আমার অগ্রজ-কল্প হিতৈষী টাকীর স্বনামধন্য জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, বিদ্যাবিভূষণ মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তাঁহার অভাবে আমি বড়ই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি। এই গ্রন্থ-মুদ্রণে যাহা কিছু ত্রুটী, তাহার অধিকাংশই ঐ নিঃস্বতা প্রতিপন্ন করিতেছে। আশা করি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমার ঐ দুর্নিবার্য্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশেষে স্বীকার করিতেছি, সোদর-প্রতিম শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ভায়ার প্রথম চেষ্টাই আমার এই গ্রন্থখানিকে লোক-লোচনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার অবসর দান করিয়াছে।

বাজিতপুর, বসিরহাট,
২৪ পরগণা
বৈশাখী-পূর্ণিমা, ১৩৩৪

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ

সার্থক-ভূস্বামী স্বর্গত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
এম, এ, বি, এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ,
বিদ্যাবিভূষণ মহাশয়
দিব্যকরকমলেষু

হে মহান্!

অখ্যাত এক পল্লী-বীথির নিবিড় অন্তরালে
ফুটেছিল বন-যূথিকা ; হয়ত কোনো কালে
শুন্‌ত না কেউ মন পেতে তার বন্য সুরের গান,—
বনেই উঠে অলক্ষিতে বনেই হ'ত ম্লান ;
ভাঙন্-ধরা নদীর কূলের আবাসখানি হ'তে
কোন্ নিশীথে প'ড়্‌ত খ'সে, মিলিয়ে যেত স্রোতে—
ব্যর্থ হ'ত পুষ্প-জনম ;—যদি না সেই দিন
মলয় এসে তার সুরেতে বাজিয়ে যেত বীণ্
তোমার প্রাণের কাণের কোণে। কে বলো আর তারে—
তোমার মত জড়িয়ে ধ'রে—বন্য-যূথিকারে—

চম্পা-বেলা-মল্লী-গোলাপ-গন্ধরাজের মাঝে,
শতেক সুরের সুবাস-বাঁশী সদাই যেথায় বাজে,
বসা'ত সেই রাজোদ্যানে ? কে দিত তার শিরে
নিত্য-ভরা-ভৃঙ্গার-ধার-নির্ঝর ধীরে ধীরে ?
তুমিই যারে বাঁচিয়েছিলে, হে দরদী, আজ
তোমার স্নেহের আবেষ্টনে প'রে নূতন সাজ,
কৃতজ্ঞতার অশ্রু-শিশির-সিক্ত ক'রে বুক,
হ'য়েছিল কত আশায় উদগ্রীব উন্মুখ—
তোমার সুধার পরশ-পাওয়া সৌরভেরি সুর
গাইতে তোমার আঙ্গিনাতে ;—সব আশা তার চূর !
হায় গো আজি কোথায় তুমি ?—বাঁচিয়ে গেলে চ'লে !
এই যে সেদিন দিলে সাড়া শুন্‌বে সে গান ব'লে !
এ ক্ষোভের আর অন্ত যে নাই !—এ যে কেমন ব্যথা,—
মর্ম্মে শুধুই মর্ম্মরিত, পায় না নাগাল্ কথা !
তাই ব'লে কি গানখানি তার নীরব হ'য়েই রবে !—
দেহের পতন হ'লেই ছেদন প্রাণের বাঁধন কবে ?
সূক্ষ্ম তোমার—দিব্য তোমার—অমর তোমার কাণ
শুনুক হে দেব ! তোমার প্রিয় যূঁইফুলের এই গান।

একান্ত ভাগ্যহীন

যতীন্দ্রনাথ

আশমানতারা

প্রথম খণ্ড।

১

রাজধানী গৌড়-নগরীর প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে মর্ম্মরাসনে একজন প্রৌঢ়-প্রায় পুরুষ ও এক কিশোরী বালিকা উপবিষ্ট।

শারদ গোধূলির প্রাক্কাল। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ধবল মেঘ-পুঞ্জকে নানা-রাগ-রঞ্জিত করিয়া, ম্লানারুণ-রশ্মি মরীচিমালীর শেষ-গরিমা প্রকাশ করিতেছিল। প্রাচী-প্রান্তে ছায়া-গুণ্ঠিতা সন্ধ্যা-সুন্দরী দ্বাদশীর খণ্ড-শশধরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিমের কোলে বিলীন হইলেন ও পূর্ব্বাকাশ রাঙাইয়া চন্দ্রকলা প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হইল। নাতি-শীতোষ্ণ মন্দ-সমীরণ উদ্যানস্থ বিশাল জলাশয়ের মুদিত-প্রায় পদ্ম, স্ফুট কুমুদ ও স্থলজ পুষ্পরাজি হইতে সুরভি-সম্ভার বহন করিয়া, সেই উপবিষ্ট পুরুষ ও বালিকাকে উপহার প্রদান করিল। দুইজনই তখন প্রকৃতির সেই শোভা-বিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন,—উভয়েই ভাব-বিভোর,—নির্ব্বাক্।

সহসা সেই স্তব্ধতা-ভঙ্গ করিয়া বালিকা প্রশ্ন করিল;—আচ্ছা বাবা, এর মধ্যে কোন্‌টী সুন্দর,—সূর্য্যাস্ত না চন্দ্রোদয়?

পিতা উত্তর করিলেন ;—দুই-ই সুন্দর মা,—খোদার তৈরি কোন-টাই ত অসুন্দর হতে পারে না।

কন্যা প্রথমে কোনও প্রতিবাদ করিল না,—আকাশের পানে চাহিয়া নীরব রহিল। পিতা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন ;—নিসর্গ-শোভা সব সুন্দর হলেও, মানুষের রুচি নিয়ে তাদের তারতম্য মা! সবাই সব ত পছন্দ করে না,—তাই প্রকৃতির নানা লীলা। কখন্ তার মুখে হাসি উছলে পড়ছে,—কখন্ বা গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে ; এই সে উগ্র, প্রখর,—আবার পরক্ষণেই প্রশান্ত, শীতল ;—কখন্ সে অতি নম্রভাবে বিরাজ কচ্ছে,—আবার কখন্ বা বিভীষিকার নৃত্যে মত্ত হচ্ছে। সব-ই কিন্তু সুন্দর,—মনোহর,—তবে কোনটা স্নিগ্ধ-সুন্দর,—কোনটা বা রুদ্র-সুন্দর! নানাভাবের মানুষ রুচির পরিমাপে তার মনোমত সৌন্দর্য্য বেছে নেয়।

কন্যা ঈষৎ হাসিল,—পিতার করতল নিজ কর-পল্লবে ন্যস্ত করিয়া সাগ্রহে কহিল ;—তা হলে বল, কোন্‌টা ভাল—কোন্‌টা তোমার ভাল লাগে?

পিতা উত্তর করিলেন ;—আমার কাছে সূর্য্যাস্ত অপেক্ষা চন্দ্রোদয়-টাই বেশী ভাল লাগে। সূর্য্যাস্তের মধ্যে যেন কেমন একটা বিষাদ-মাখা নৈরাশ্য জেগে থাকে ;—যেন সেটাকে দেখ্‌লে উদ্যম শিথিল হয়ে পড়ে,—অবসাদের অসাড়তা এসে নেত্রপুট তন্দ্রালস করে ফেলে। কিন্তু চন্দ্রোদয় যেন সেই নৈরাশ্যের মধ্যে আশা,—নিরুৎসাহের মধ্যে নবোদ্যম, আর অবসন্নতার মধ্যে জাগরণের সাড়া তুলে দেয়। তার স্নিগ্ধতায় হৃদয় স্নাত হয়, শীতল হয় ; দাহ যায়, শান্তির উদ্রেক হয়। তাই আমার চন্দ্রোদয়কেই বড় মিষ্ট লাগে।

কন্যা স্থির কর্ণে পিতার কথাগুলি শুনিল। তাহার পর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—কিন্তু বাবা, জগতে এই একটী আশ্চর্য্য,—যতই প্রতিভাশালী হোক না সে, যদি তার পতন হয়, তাহলে তার পানে আর কেউ ফিরে চায় না! আর যে উঠ্‌ছে, তার প্রতিভা থাক্ বা না থাক্,—মানুষ তাকে বড় আদর করে! এটা কিন্তু ভারি স্বার্থপরতা—সংকীর্ণতা আমাদের এই মানব-জাতির!

কন্যার এইরূপ উক্তিতে পিতা একটুও বিচলিত হইলেন না। এইরূপ কথোপকথন এই সান্ধ্য অবসরে তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই হইত। অপুত্রক পিতার মাতৃহারা কন্যাই একমাত্র সান্ত্বনা। কন্যা যে তাহার পত্নীর প্রতিচ্ছবি! তিনি সেই তীক্ষ্ণ-ধী কিশোরী বালার ভাবাভি-ব্যঞ্জনাপূর্ণ বাক্য অতি আগ্রহের সহিতই শ্রবণ করিতেন। বাল্যে মাতৃ-স্নেহ-বঞ্চিতা বালা স্বভাবতঃ একটু ভাবপ্রবণা হয়, তাহার উপর পিতার নিকট হইতে পিতা ও মাতার স্নেহাংশভাগিনী হওয়ায়, তাহার কাব্য-কলাপ ও বাক্য-বিন্যাস একটু স্বাধীনতাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং, আজ এই অপূর্ণ-যৌবনার মুখে প্রবীণার বাণী অভিব্যক্ত হইলেও, স্নেহময় পিতার কর্ণে বিসদৃশ ঠেকিল না। অধিকন্তু, তিনি অতি আদরের সহিত কন্যাকে আপনার বুকে টানিয়া লইয়া, তাহার সুন্দর চিবুকটুকু ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—

আমার আশমান, দুনিয়াটাকে তুই এত শীঘ্র চিনে ফেল্‌লি! তোকে পেরে ওঠা ভার!

বাস্তবিক, কন্যার নিকট পিতার প্রায়ই পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। এই অপরিণত বয়সে সে পিতার সহিত রাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েরই আলোচনা করিত। পিতা নিঃসঙ্কোচে

বালিকার সহিত তর্ক করিতেন—পরামর্শ করিতেন। এমন দিন অনেক গিয়াছে,—তাঁহাকে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কন্যার যুক্তি সমীচীন বলিয়া মানিয়া লইতে হইয়াছে !

বালিকা কিয়ৎকাল পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া রহিল। পরে তাহার উরুদেশে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। বালার সুন্দর মুখখানির উপর রজত-শুভ্র চন্দ্রকিরণ খেলা করিতে লাগিল। কি বিশাল, উজ্জ্বল চোক্ দুটী, তাহাতে চন্দ্রদ্যুতিরই বা কি আনন্দ-নর্ত্তন! নধর গণ্ড, নিটোল নাসা, সংকীর্ণ অধরোষ্ঠ। প্রতিমার ন্যায় সুগঠিতা, প্রতিভার ন্যায় লাবণ্যময়ী,—জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা। বৎসল পিতা অতৃপ্ত নেত্রে দুহিতার অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বালিকা ক্ষণকাল মেঘসম্পর্কহীন জ্যোৎস্নাস্নাত আকাশতলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া পিতাকে আবার প্রশ্ন করিল,—বাবা, একটা কথা তোমাকে অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বো-কর্ব্বো মনে কচ্ছি, স্মরণ থাকে না, আজ মনে হয়েছে,—আচ্ছা বল দেখি,—তোমার হিন্দুকে ভাল লাগে না মুসলমানকে ভাল লাগে ?

পিতা বলিলেন ;—এর উত্তর ত অতি সহজ মা,—হিন্দু হিন্দুকে ভালবাসে, মুসলমান মুসলমানকেই ভালবাসে।

কন্যা বলিল ;—সে ত সাধারণের কথা বাবা,—গৌড়ের ভাবী বাদসা তুমি, তোমার পক্ষে অতটা আত্মপক্ষ-সমর্থন শোভা পায় না ত !

পিতা একটু চাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন ;—তবে কি তুই বল্‌তে চাস্ আশমান, আমার হিন্দুকেই বেশী ভাল লাগা উচিৎ ? এ তোর বড় অন্যায় আবদার বেটী ! আমি আমার জাতিকে ঠেলে রেখে, যে জাতিকে আমরা পদানত করেছি, তাকেই বুকে তুলে

নেবো? তা হতে পারে না। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্য-লাভ, স্বজাতির সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তির জন্য রাজ্য-শাসন। বিশেষতঃ, বিধর্ম্মীকে প্রশ্রয় দেওয়া রাজধর্ম্ম নয়,—তাতে রাজ্য রসাতলে যায়।

পিতার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে কন্যা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিল,—বলিল ;—আচ্ছা বাবা,—বেশ,—আগে আমার এই কথাটীর উত্তর দেও ত দেখি?—মনে কর, তোমার দুটী মেয়ে, একটী সে আমি, আর একটী তুমি ইরাণের মরু-প্রান্তর থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছ। এখন তোমার এই যে দুটী মেয়ে,—এর কোন্‌টীকে তুমি বেশী ভাল বাসবে—আমাকে না তাকে?

পিতা সহসাই উত্তর দিলেন,—কেন—তোকে!

কন্যা গম্ভীর হইয়া বলিল ;—না—তা হতে পারে না,—তা হলে আমি তোমার উপর ভারি রাগ কর্ব্বো।

পিতা সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন?

কন্যা বলিল ;—আমি তোমার কাছে স্নেহের দাবি কত্তে পারি, আর সে যে স্নেহের ভিখারী বাবা! যে দাবি করে,—সে জোর করে আদায় করে নিতে পারে ; আর যে চায়,—সে না পেলে, ব্যথা পেয়ে ফিরে যায়। মানুষের প্রাণে ব্যথা দেওয়ার অধিকার ত মানুষের নেই।

পিতা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন ;—বলছিস্ বটে,—কিন্তু এ জাতি তেমন নয়। এরা জানে,—মুসলমান এদের ধর্ম্মের শত্রু,—সমাজের শত্রু,—দেশের শত্রু,—জাতির শত্রু, যে আমাদিগকে শত্রু বলেই জানে,—তাকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করা সম্ভব কি?

কন্যা বলিল ;—বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে প্রথমে সেই সম্বন্ধই থাকে। পরে বিজেতার উদারতাই বিজিতের হৃদয় থেকে অবিশ্বাসের কালিমা

মুছে দেয়। বাবা, এ জাতিটাকে একটা সামান্য পদার্থ-জ্ঞানে অবহেলা করো না। আজ না হয়, তারা ইস্‌লাম-শক্তির পদতলে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে,—কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, তাদের স্বাধীনতা কত দিনের? আবার সে স্বাধীনতা বন্য পশুর স্বাধীনতা নয়। তারা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা,—সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তারা দেশকে মাতৃ-সম্বোধন করে,—মা—জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর সম্বোধন! বীর্য্যে তারা হীন নয়, মহত্ত্বে তারা কৃপণ নয়। এমন যে একটা বিরাট জাতি, আজ বিধ্বস্ত-প্রায়! কিন্তু চূর্ণীকৃত হীরকখণ্ডের ন্যায় তাদের গরিমা প্রভাহীন হতে পারে না। আজ তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের উপর আর এক নব-ধর্ম্মের অভ্যুদয়,—তাদের সযত্ন-রচিত সমাজের উপর ভিন্ন ধর্ম্মী সমাজের বিকাশ, যেন সহসা বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মতই তাদের স্তম্ভিত করে ফেলেছে।

পিতা বলিলেন;—তবে কি তুমি বল্‌তে চাও,—আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ,—তাদের ধর্ম্ম, তাদের সমাজ থেকে পৃথক হলেও, তাদের ধর্ম্ম,—সমাজকে মেনে নিতে হবে? কোনও মুসলমান তা পারে না।

কন্যা বলিল,—নিশ্চয়ই পারে না। আমি কাউকে কারো ধর্ম্ম বা সমাজকে ছাড়্‌তে বল্‌ছি না ত। আমি বলি,—প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধর্ম্ম নয় বা সমাজ-নীতি নয়। যখন দুটী জাতি এক দেশ-মাতৃকার বক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে,—তখন তাদের মধ্যে সৌহৃদ্য চাই,—সমন্বয় চাই। তা না হলে, দুটীই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পার্ব্বে না,—দুটীই মুষ্‌ড়ে পড়্‌বে।

কন্যার যুক্তিপূর্ণ বাণী শুনিয়া পিতা মুগ্ধ হইলেন,—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন;—সে সৌহৃদ্য কি,—সে সমন্বয় কেমন মা!

কন্যা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল;—সে সৌহৃদ্য ভাইয়ে-ভাইয়ে যে ভালবাসা তাই,—সে সম্বন্ধ প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়। অথবা সে মিলন, অসিতে

অসিতে নয়,—হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মধুর সংঘর্ষ। যেদিন মুসলমান হিন্দুকে চাইবে,—আর হিন্দু মুসলমানকে চাইবে, সেই দিন সেই সম্মিলিত জাতির উত্থান, বড় সুন্দর! যেদিন মুসলমান হিন্দুর যেটা ভাল, সেটাকে আদরে বরণ করে নেবে,—আর হিন্দু মুসলমানের ভালটুকুকে পূজা কত্তে শিখ্‌বে, সেদিন এক নবজাতির উদ্ভব হবে। তাতে হিন্দু হিন্দুই থাক্‌বে,—মুসলমান মুসলমানই থাক্‌বে,—অথচ দুয়ে এক,—একে দুই!

তাহার পর কন্যা বিভোর কণ্ঠে বলিল;—বাবা! যখন তুমি গৌড়-মসনদে বস্‌বে,—তখন এইরূপ শান্তি-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করো,—জগতে অতুল কীর্ত্তি থাক্‌বে।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পিতা কন্যাকে আবার বুকে টানিয়া লইয়া, তাহার কপালে চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিতে করিতে বলিলেন;—আশমানতারা মা আমার,—সার্থক নাম রেখেছিলাম তোর! তুইত ত জানিস্‌,—আমি হিন্দু-মুসলমানে ভেদ-ভাব পোষণ করি না। আজও আবার বল্‌ছি,—আমি আমার প্রতি অনুষ্ঠানে হিন্দুকে তার যোগ্য অধিকার দান কর্ব্বো।

তখন রাত্রি হইয়াছে। কোলাহল-মুখরিতা বিশাল নগরী ক্রমে সুপ্তিমগ্ন হইতে চলিয়াছে। শুধু নৈশ-নিস্তব্ধতার অবসরে, গৌড়োপকণ্ঠ-বাহিনী মহানন্দার পূত-কল্লোল, পণ্যভারালস ধীরগামী নৌ-যানের ক্ষেপণী-ধ্বনি, নাবিকগণের সারি-সঙ্গীতের সহিত মিলিত হইয়া, সেই সুপ্তির মধ্যেও জাগরণের সজীবতা বিজ্ঞাপিত করিতেছিল। পিতা-পুত্রী গাত্রোত্থান করিলেন।

পিতা সাহজাদা আজিম,—পুত্রী তাঁহার বিদুষী কন্যা আশমানতারা।

— —:※:——

২

তখন সৈফুদ্দিন গৌড়ের বাদসাহ। সাহজাদা আজিম তাঁহার বড় বেগমের গর্ভজাত,—তাঁহার ছোট বেগমের পুত্র নসেরিং। নসেরিং আজিমের বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া গৌড়-সিংহাসনের দাবি করিতেন; অপর পক্ষে, আজিম বলিতেন,—নসোরিং-মাতা তাঁহার পিতার উপপত্নী মাত্র,—উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র সিংহাসন-লাভের স্পর্দ্ধা করিতে পারেনা—সুতরাং, তিনিই সম্রাটের ন্যায্য উত্তরাধিকারী বা দায়াদ্।

স্বত্ব-সাব্যস্থ লইয়া অন্তর্ব্বিরোধ সম্রাটের জীবিতাবস্থাতেই সূচিত হইয়াছিল। সম্রাট্ সৈফুদ্দিন নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও ভোগবিলাসী ছিলেন,—তাঁহার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি একেবারেই ছিল না বলিলেই হয়। কালক্রমে তাঁহার জীবন-সূর্য্য যতই পশ্চিমে হেলিয়া পড়িতে লাগিল, বাদসাহ-পরিবার মধ্যে সেই বিরোধের ঘনজাল ততই নিবিড়তর হইতে আরম্ভ হইল,—এবং পরিশেষে দরবার অবধি স্পর্শ করিল।

সে পাঠান-রাজত্বের প্রাথমিক অবস্থা। ১২০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণ সেনের মস্তক হইতে গৌড়ের স্বর্ণ-কিরীট খসিয়া পড়ার পর, প্রায় দেড়শত বৎসর বঙ্গদেশ দিল্লী-সম্রাটের অধীন ছিল বটে,—কিন্তু সমগ্র দেশ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানের বশ্যতা-স্বীকার করে নাই। কিঞ্চিদধিক অশীতিবর্ষকাল পূর্ব্ববঙ্গে সেনরাজগণ স্বাধীনতার ক্ষীণ রশ্মি কোনও ক্রমে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে অব্যবস্থিতচিত্ত দিল্লী-সম্রাট্ মহম্মদ তোগলকের ক্রটীতে, বাঙ্গালার নবাব ময়জুদ্দিন দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিলেন,—এবং তাঁহারই অল্পকাল পূর্ব্বে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বঙ্গ মুসলমান করতলগত হইল। কিন্তু তখনও বাঙ্গালার হিন্দুগণের প্রতিপত্তি

হীন হয় নাই,—বরং বাঙ্গালী হিন্দুর সাহচর্য্যেই নবাব ময়জুদ্দিন স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন।

সেই সময় ভাদুড়ী ও সান্যাল ঔপাধিক দুইটী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠী গৌড়-দরবারে বীর্য্যবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে নানাকারণে গৌড়-দরবারে সান্যাল বংশধরগণের প্রতিষ্ঠা খর্ব্বীকৃত হয়,—কিন্তু ভাদুড়ীবংশের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণই ছিল। শুনা যায়,—ভাদুড়ীরাজ বাদসা-সরকারে মাত্র ১৲ টাকা কর দিতেন, সেইজন্য, ভাদুড়ীচক্রের বা রাজ্যের অপর নাম একটাকিয়া ছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি,—তখন রাজা গণেশনারায়ণ খাঁ সপ্তদুর্গ-বেষ্টিত ভাদুড়ীচক্রের অধীশ্বর,—বাদসাহী দরবারের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি,—বাদসাহের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যখন সম্রাট-পুত্রগণের অন্তর্ব্বিরোধ দরবার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, তখন যে দুইটী দলের সৃষ্টি হইবে,—ইহা অতি সহজ-সরল সত্য কথা। ফলে, সমস্ত মুসলমান নেতা জ্যেষ্ঠ নসেরিতের পক্ষ গ্রহণ করিলেন,—আর হিন্দুগণ আজিমকে সমর্থন করিতে লাগিলেন। কেন,—তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। তৎকালে পাঠান নরপতিগণ যদিও হিন্দুকে রাজনীতিক্ষেত্রে অবাধ অধিকার দিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে—বিশেষতঃ সাধারণ মুসলমান-সমাজে হিন্দু-বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিল। সুযোগ পাইলেই মুসলমানগণ হিন্দুকে লাঞ্ছিত করিবার প্রয়াস পাইতেন। অবশ্য হিন্দুরাও যে সর্ব্বত্র নিতান্ত নিরীহ ভেকের ন্যায় নির্য্যাতন ভোগ করিতেন, তাহা নহে। তবে সে প্রতিহিংসা-সাধন, বিজিতের বিজেতার উপর যতটুকু সম্ভব, ততটুকু। ঐক্যহীনতা হিন্দুর চিরদিনের দৌর্ব্বল্য। সুতরাং, তাঁহাদের হিংসাবৃত্তি অনেকস্থলে অন্তর্নিবদ্ধ অগ্নির

ন্যায় অন্তরকেই অঙ্গারে পরিণত করিত। কিন্তু মুসলমান ঐক্যে অদ্বিতীয়,—তখন তাঁহারা বিজয়স্পর্দ্ধী,—পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ জাতি। তখন তাঁহারা হিন্দুকে হস্তামলকের ন্যায় নিষ্পিষ্ট করিবার আকাঙ্ক্ষা এতই উদ্দামভাবে পোষণ করিতেন যে, তাঁহাদের সে লিপ্সা প্রায়ই ব্যর্থ যাইত না। অধিকন্তু, এত বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া পরিতৃপ্ত হইত যে, তাহাতে মুসলমানের নামে হিন্দুর রোমাঞ্চ হইত! ফলে, হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন,—ভয় করিতেন, আর মুসলমান হিন্দুকে তাচ্ছল্য করিতেন,—অগ্রাহ্য করিতেন।

সম্রাট্ সৈফুদ্দিন গতাসু হইলেন। অমনি নসেরিৎ মুসলমানগণের সহায়তায়, "সামসুদ্দিন" নাম গ্রহণপূর্ব্বক গৌড়-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ রাজধানী-মধ্যে পূর্ণভাবে রাষ্ট্র হইতে না হইতে, অতি ক্ষিপ্রতার সহিত এই ঘটনা ঘটিয়া গেল। আজিম প্রমাদ গণিলেন। রাজ্যলাভ ত দূরের কথা,—জীবন-সংশয়! সহসা যে এতটা পরিবর্ত্তন হইবে,—ইহা তাঁহার স্বপ্নের অগোচর ছিল। তাঁহারই নির্ব্বুদ্ধিতায় বালিকা কন্যার পরামর্শে হিন্দু-মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখিয়াই তিনি স্বজাতির হিংসানল প্রজ্বালিত করিয়াছেন,—এই ভাবিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

এমন সময় একদিন শান্তপদক্ষেপে আশমানতারা তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ডাকিল,—বাবা—

আজিম অন্যমনস্ক ছিলেন। কন্যার আহ্বানে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন,—দেখিলেন,—স্থির৷ তড়িল্লতার কমনীয়তা লইয়া তাঁহার স্নেহের দুলালী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, নৈরাশ্যপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন;—

আর মা,—এবার যে আশমানের সৌধ আশমানেই উড়ে যায়! তোকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াই মা!

কন্যা পিতাকে তিরস্কার না করিয়া থাকিতে পারিল না,—বলিল,—বাবা,—তুমি না বাদসাজাদা,—তুমি না বীর পাঠান!

পিতা অতি নিরুৎসাহব্যঞ্জক কণ্ঠে উত্তর দিলেন;—কিন্তু মা,—আজ আমি যে আমার সমস্ত শক্তি হারিয়ে বসেছি! আমি যে আমার স্বজাতিকে উচ্চাসন দিই নাই! আমি যে পদে পদে তাদের হিন্দুর উপর প্রভুত্ব খর্ব্ব কত্তে কত না চেষ্টা করেছি! তার ফলেই আজ আমি আমার স্বজাতিকে হারিয়েছি। যার প্রতি স্বজাতি বিমুখ হয়, তার মত হতভাগ্য জগতে কে আছে মা!

কন্যা উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিল;—এ বিমুখ হওয়া তাদের নৈতিক নয়,—তারা অন্যায় কচ্ছে। যদি ন্যায়ের সম্মান রক্ষা কত্তে স্বজাতির সাহচর্য্য হারাতে হয়,—সেও শোভন,—সেও গৌরবের। কেন অত অধৈর্য্য হচ্ছ বাবা! স্বজাতি তোমার বিপক্ষ, কিন্তু নিরপেক্ষ খোদা ত তোমার পক্ষে!

পিতা বলিলেন;—জানি, খোদার বিচারে আমি নির্দ্দোষ। কিন্তু প্রতীকারের পথ খুঁজে পাচ্ছি না যে!

কন্যা বলিল;—প্রতীকারের উপায় আমি আজ তোমাকে বল্‌তে এসেছি। বাবা, আমরা রাজা গণেশনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ কর্ব্বো। শুধু মুসলমান তোমাকে ত্যাগ করেছে, কিন্তু হিন্দুত তোমাকে ত্যাগ করেনি। হিন্দুর উপর বিশ্বাস হারিয়ো না। রাজার শক্তিতে নির্ভর করো,—বুঝ্‌বে,—হিন্দু অকৃতজ্ঞ নয়, হীনবীর্য্য নয়। আমার বিশ্বাস, ন্যায়ের সম্মান রক্ষা কত্তে তিনি নিশ্চয়ই তোমার পক্ষ সমর্থন কর্ব্বেন। তাঁর সাহায্য-গ্রহণ আমাদের পক্ষে নিন্দনীয় নয় ত!

শাহজাদা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন ;—তা ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না,—তবে তাই হোক্ মা ! রাজার সাহায্যই গ্রহণ করি।

আশমান চলিয়া গেল।

ক্ষণপরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আজিম বলিলেন ;—খোদা, হৃদয়ে বল দেও,—আমি দুনিয়াদারি চাইনা,—আমার আশমানকে রক্ষা করো,—ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করো।

*　　*　　*　　*

তখনও উষার কনকচ্ছটা পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করে নাই। প্রাসাদস্থ গুপ্তদ্বার-পথে দুইটী মূর্ত্তি বহির্গত হইয়া মহানন্দার তীর-লগ্ন বজরায় আরোহণ করিল। শত্রুপক্ষ কেহই এ সংবাদ জানিতে পারিল না। নৌকা দ্রুতগতি ছুটিল। যখন প্রভাত হইল,—নাবিকগণ নৌকা ও আরোহী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া গান ধরিল ;—

(ওরে আমার) মন-মাঝি আর জ্ঞান-দাঁড়ী !
তারা-নামের পালটী তুলে ভব-পারে দে না পাড়ি।

৩

যে সময় বাদসাহ-পরিবারে পূর্ব্ব-বর্ণিত অন্তর্বিপ্লবের প্রথম সূত্রপাত, সেই সময় পূর্ব্বোক্ত দুইটী পরাক্রান্ত হিন্দু রাজ-পরিবারের মধ্যেও অধিকার-সীমা লইয়া ভীষণ কলহ চলিতেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী,—সান্যালগড় বা সাঁতোড় এবং ভাদুড়ীচক্রের রাজা।

বরেন্দ্র-ভূমিতে চলনবিল বলিয়া একটী বিস্তীর্ণ জলভাগ আছে,—বিশালতায় তাহা একটী হ্রদবিশেষ। তিন চারিটী স্রোতস্বতীর সহিত তাহার সংস্রব ছিল। এই হ্রদের দক্ষিণে সাঁতোড় ও উত্তর ভাগে ভাদুড়ীচক্র। সাঁতোড় হ্রদতট হইতে কিয়দ্দূরে এবং ভাদুড়ী-চক্র প্রায় হ্রদমধ্যে অবস্থিত ছিল। উক্ত হ্রদ কাহারও জায়গীর-ভুক্ত না হইলেও, সাঁতোড় বা ভাদুড়ীচক্র উভয়েই উহার উপস্বত্ব সুবিধানুযায়ী ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ হ্রদমধ্যে কতকগুলি দ্বীপ উদ্ভূত হইল,—সেই দ্বীপ লইয়াই বিবাদের সূচনা।

ইতঃপূর্ব্বে চলন-বিল-মধ্যস্থ দুইটী দ্বীপে রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ নামে দুইটী বারেন্দ্র কায়স্থ-সন্তান বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য, সে যুগে এভাবের দস্যুবৃত্তি বিশেষ নিন্দনীয় ছিলনা, বরং ক্ষেত্র-বিশেষে বীর্য্যবত্তারই পরিচায়ক হইত। যাহাহউক, তাহারা ঐ বিল বা হ্রদের মধ্যে পণ্যবাহী নৌকা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে থাকে। ক্রমে তাহাদের দৌরাত্ম্য এত প্রবল ও বহুদূরব্যাপী হয় যে, সাঁতোড় ও ভাদুড়ীচক্রের নরপতি, এমন কি,—স্বয়ং বাদসাহ পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। বেগতিক বুঝিয়া, সাঁতোড়রাজ অবনীনাথ উক্ত রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের কুলগুরু কালীকিশোর

ভট্টাচার্য্যের শরণাগত হন এবং ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরই চেষ্টায়, তাঁহার শিষ্যদ্বয় রাজা অবনীনাথের সহিত সৌখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হয় ও তাঁহার সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে। সুতরাং, অল্পদিনের মধ্যে সাঁতোড়-রাজ-প্রভাব সমস্ত চলনবিলের উপর ব্যাপিয়া পড়িল। সে প্রভাব ভাদুড়ী-চক্র-রাজ গণেশনারায়ণের পক্ষে অসহ্য হইল। তাঁহার রাজধানী সপ্ত-দুর্গ বা সাতগড়া ঐ বিলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বহুদিন হইতে সম্রাট্-দরবারে সাঁতোড়-গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত,—কিন্তু ভাদুড়ীচক্রের সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। রাজা গণেশনারায়ণ বুঝিলেন, রাজা অবনীনাথ প্রকারান্তরে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত করিয়া তৎপ্রতি ঈর্ষ্যার প্রতিশোধ লইতেছেন। রাজা অবনীনাথের জনবল হিন্দু-প্রধান,—আর রাজা গণেশনারায়ণের শক্তি মুসলমান-প্রধান। সুতরাং, দুইশক্তিতে সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা অতি স্বাভাবিকই ছিল। প্রথমে রাজা গণেশ চলনবিল সমভাগে বিভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব রাজা অবনীনাথকে জানাইলেন,—কিন্তু সাঁতোড়রাজ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। রামা-শ্যামার ডাকাতি ভাদুড়ীচক্রের জমীদারীতে প্রবল প্রতাপে চলিতে লাগিল। সুতরাং, রাজা গণেশ আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি-লেন না,—তিনি তাঁহার বিরাট্ বাহিনী লইয়া সাঁতোড় আক্রমণ করিলেন। অবনীনাথও প্রস্তুত ছিলেন,—সসৈন্য রাজা গণেশের সম্মু-খীন হইলেন।

সে একটা ভীষণ দিনের কথা! যদি এই যুদ্ধোদ্যম কার্য্যে পরি-ণত হইত,—তাহা হইলে হয়ত বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেকটা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত। কিন্তু বুঝি ভগবানের তাহা অভিরুচি ছিলনা,—সেই জন্যই নীতিকুশল কালীকিশোরকে এই বিবাদ-ভঞ্জনের

দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝিলেন,—রাজা-গণেশের বৃহস্পতির দশা,—তাঁহার ভাগ্যচক্র অতীব অনুকূল,—এ যুদ্ধে তাঁহার জয় অবশ্যম্ভাবী,—সুতরাং, কুলপতি রাজা অবনীনাথ একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবেন। কিন্তু কি উপায়ে এই দুই উদ্যত-কৃপাণ প্রতিদ্বন্দ্বীর মিলন ঘটিতে পারে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় গভীর চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন।

* * * *

গোধূলির স্নিগ্ধচ্ছায়া শ্যামায়মান আকাশমণ্ডলকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিতেছিল। সাঁতোড় রাজ্যের সীমান্তদেশে ভাদুড়ীচক্রের অসংখ্য শিবির সন্নিবিষ্ট। বলদৃপ্ত সৈন্য-সম্প্রদায় আসন্ন-সমর-প্রত্যাশায় আকুল আগ্রহে নিশীথ অবকাশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মন্ত্রণাগৃহে রণনীতির নানাবিধ আলোচনা চলিতেছিল। এমন সময় জনৈক ব্রাহ্মণ রাজশিবির অভিমুখে চলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পরিধানে গৈরিক বাস,—স্কন্ধে নামাবলী,—ললাটে সিন্দুর-তিলক,—গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা। দীর্ঘকায় জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ।

প্রহরিগণ ব্রাহ্মণ দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিল,—ব্রাহ্মণ রাজ-সান্নিধানে উপনীত হইলেন। রাজা গণেশনারায়ণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন;—আসুন, ভট্টাচায্য মশায় আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্,—বসুন—তারপর—কুশল ত?

প্রত্যভিবাদনের পর আসনপরিগ্রহ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর দিলেন;—হাঁ--মহারাজ,—কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাদের অকৌশলে বুঝি আর সর্ব্বাঙ্গীন কুশলের সম্ভাবনা থাকে না!

রাজা মৌন রহিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতে লাগিলেন ;—মহারাজ ! ভবিষ্যৎ চিন্তা করেছেন কি ? আপনাদের এই সমরায়োজনে কি শুভ হবে ? আত্ম-কলহে হিন্দু উৎসন্নপ্রায়। মাত্র সাঁতোড় আর ভাতুড়ীচক্র আছে তাই মুসলমান আজও বাঙ্‌লার হিন্দুকে সম্পূর্ণ তাচ্ছল্যের চক্ষে দেখ্‌তে সাহসী হয় নি। আজ আপনারা সেটুকু গরিমাও হারাতে এই অনর্থকর সংগ্রামের অনুষ্ঠান কচ্ছেন !

রাজা গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক হাস্যের সহিত উত্তর দিলেন ;—কিন্তু উপায় কি ? যুদ্ধের ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। আমি বিস্তর সয়েছি,—আর সইবো না। আপনি নিরপেক্ষ বিচার করুন,—দোষ আমার না রাজা অবনীনাথের,—

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন ;—মাপ কর্ব্বেন,—আজ আমি সে বিচারকের দুঃসাহস নিয়ে আপনার কাছে আসি নি। আমি শুধু আপনাকে জানাতে এসেছি,—এ সময় শুভ নয়। একবার গৌড়-সিংহাসনের প্রতি কটাক্ষপাত করুন্ ! আপনি ত সবই জান্‌ছেন ! তা সত্ত্বেও এ কি কচ্ছেন ! মহারাজ ! এ বিবাদ মীমাংসা করে ফেলুন।

রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন ;—সন্ধি কত্তে আমি প্রস্তুত,—কিন্তু চলনের উত্তরভাগ আমার চাই। প্রতিজ্ঞা করেছি,—চলনের উত্তরার্দ্ধ ভাতুড়ীচক্রের সীমাভুক্ত করে তবে সাতগড়ায় ফিরবো।

ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন ;—আপনার প্রতিজ্ঞা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হবে,—সে জন্য আপনি নিশ্চিন্ত::হোন্। অধিকন্তু আমি আপনার বিজয়-লিপ্সাও চরিতার্থ কর্ব্বো।

রাজা বিস্মিত হইলেন,—বলিলেন,—সে কেমন ?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন ;—আমি আপনাদের দুজনকে এমন একটা সৌহৃদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ কত্তে চাই, যা সহজে ছিন্ন হবার নয়, অথচ সেই বন্ধনেই আপনারা বিজয়-গরিমা অনুভব কর্ব্বেন।

রাজা অধিকতর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—একটু স্পষ্ট করে বলুন, ব্যাপার কি?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—এখন সে রহস্য উদ্‌ঘাটন কর্ব্বো না। কিন্তু অঙ্গীকার করুন,—যদি আপনার প্রাপ্য বুঝে পান,—যদি এই সন্ধির ফলে আপনার বংশ-গরিমা সমধিক উজ্জ্বল হয়, তাহলে আপনি সম্মত?

রাজা অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর কালবিলম্ব করিলেন না। সেই রাত্রিতেই সাঁতোড়-শিবিরে উপনীত হইয়া রাজা অবনীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। ভাদুড়ীচক্রের সৈন্য-সমাবেশ, সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিতি ও তাহার শক্তি-বাহুল্যের বিষয় আলোচিত হইল। রাজা অবনীনাথ বুঝিলেন—অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া ভাল কায করেন নাই। পরিশেষে সন্ধির কথা উত্থাপিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহাতে রাজা প্রথমে সম্মত হইতে পারিলেন না। কিন্তু যখনই রাজা গণেশনারায়ণের একমাত্র বংশধর যদুনারায়ণের অনিন্দ্য-সুন্দর মুখচ্ছবি, প্রতিভামণ্ডিত প্রশস্ত ললাট, বীরত্ব-ব্যঞ্জক সুগঠিত দেহ ও অনন্যসাধারণ ধীশক্তির বিষয় চিত্তপটে উদিত হইল, অমনি কুলপতির সমস্ত কৌলিন্য-গর্ব্বকে বিমূঢ় করিয়া, এক নূতনতর বিজয়োল্লাস তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

স্নেহের জয় সর্ব্বত্র। স্নেহাস্পদের সৌভাগ্য-শ্রী বর্দ্ধনের জন্য স্নেহবৎসল অনায়াসে আত্ম-স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া এক অভিনব বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করে, যাহার নিম্নে যেন তাহার সমস্ত আত্মপ্রসাদ,—পরিপূর্ণ সার্থকতা নিহিত থাকে।

সুযোগ্য ঘটক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘটকালিতে সেই রাত্রির মধ্যেই সব গোলমাল একপ্রকার মিটিয়া গেল। রাজা গণেশ দেখিলেন,—চতুর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্তি কোনও স্থলে ব্যর্থ হয় নাই,—এই মিলন-সমরে তিনিই জয়ী।

ঊষাকালের সঙ্গে সঙ্গে দুই মধুর প্রতিদ্বন্দ্বীর শিবিরাঙ্গনে রণঢক্কার পরিবর্ত্তে আনন্দ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দুই পক্ষের শিবির-শীর্ষে পুষ্প-মাল্যযুক্ত শ্বেত পতাকা উড়িতে লাগিল।

৪

যুবরাজ যদুনারায়ণের সহিত রাজকুমারী নবকিশোরীর শুভ-পরিণয় বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইল। দুইটী লোকপূজ্য সংসারের গগনতলে যে এক অকৌশলের কালো মেঘ উদ্ভূত হইয়া ঝটিকার সূচনা করিয়াছিল, আজ মিলনের মলয়-মারুত-সংস্পর্শে তাহা কোন্ দিগন্তে অদৃশ্য হইল এবং নির্ম্মল-স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-কান্তি বিভাসিত হইয়া সমস্ত উদ্বেগ-উত্তেজনা নিঃশেষে দূর করিয়া দিল। তখন দিকে দিকে অনাবিল আনন্দের কোলাহল,—দিকে দিকে পুণ্য-প্রতিষ্ঠার বিপুল আয়োজন,—দিকে দিকে অনাথ-আতুরের চিত্ত-বিনোদন,—সে কি সুন্দর ব্যবস্থা! হায়! যদি জগতের প্রতি কলহ-বিসংবাদ এই ভাবে মীমাংসিত হইত, যদি প্রতি কণ্টকাপূর্ণ বন-প্রদেশ এইরূপ পুষ্প-স্তবকে হাসিয়া উঠিত, যদি প্রতি বিষাদজনিত অশ্রুধারা—প্রতি প্রতিহিংসার মর্ম্মদাহ এই ভাবে নিবারিত হইত, তাহা হইলে, শত বক্ষঃস্থল আজ শ্মশান কেন? শত উন্নত-শির আজ ধূলি-লুণ্ঠিত কেন? শত বিশ্রুত-কীর্ত্তি জাতি আজ পতিত, লাঞ্ছিত কেন? দুরাকাঙ্ক্ষ মানবজাতি প্রাণের বিনিময়ে জয় চায়, কিন্তু হৃদয়ের বিনিময়ে বিজয় অর্জ্জন করিতে কয় জন চেষ্টা করে?

যাহা হউক, যখন এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পর রণাঙ্গনে সম্মুখীন হইবার পরিবর্ত্তে পুত্র-কন্যার বিবাহ-সভায় বৈবাহিকরূপে আলিঙ্গন-বদ্ধ হইলেন, তখন সভামধ্যে এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। বৈরীভাবের পরে পুনর্ম্মিলনজনিত সৌহৃদ্য অধিকতর গভীর, উৎসাহব্যঞ্জক ও মধুর হয়। সুতরাং, তৎসূত্রে আদান-প্রদানও একটু বিচিত্র গোছের

হইয়া থাকে। রাজা অবনীনাথ আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে প্রথমেই চলনবিলের উত্তরার্দ্ধ জামাতাকে যৌতুক দিলেন ;—যাহা লইয়া বিবাদের সূত্রপাত,—এক কথায় তাহা মিটিয়া গেল। উক্ত যৌতুক-ব্যতীত তিনি আরও বহুলক্ষ টাকার দ্রব্যাদিসহ নবম বর্ষীয়া কন্যা সুপাত্রস্থ করিয়া চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিলেন। এ দিকে রাজা গণেশনারায়ণ, তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধভাগ সেই সভাস্থলেই বধূমাতাকে অর্পণ করিয়া, আদান যেরূপ, প্রদান যে তাহা অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নয়, তাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিপন্ন করিলেন। সকলেই এই অসাধারণ আদান-প্রদান ব্যাপার অবগত হইয়া উভয় রাজার স্তুতিগান করিতে লাগিল এবং এই যোগ্যে যোগ্যে যোজনা করিবার প্রধান উদ্যোক্তা কালীকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একবাক্যে প্রশংসা করিল। উভয় নরপতির নিকট হইতে ঘটক-চূড়ামণি নানাবিধ পুরস্কার ও বহু বিঘা জমী ব্রহ্মত্র লাভ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, সেই অবধি এই দুই রাজ-পরিবার মধ্যে ভট্টা-চার্য্য মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, এমন কি, কি সামাজিক, কি বৈষয়িক, কি রাজনৈতিক প্রতি দুঃসম্পাদ্য বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ-গ্রহণ এক প্রকার অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

বিচিত্র শোভাযাত্রা করিয়া বর-বধূ লইয়া রাজা গণেশ সাতগড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। সাঁতোড়ের আনন্দ-স্রোত সাতগড়ায় আসিয়া উৎসব-তরঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল। রাণী ত্রিপুরাদেবা পরমানন্দে, অতি নিষ্ঠার সহিত পুত্র-পুত্রবধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। পুরনারিগণ দম্পতির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লাবণ্য-সম্পদের বর্ণনায় বিভোর হইয়া পড়িল। যেমন বর, তেমনই বধূ,—মণি-কাঞ্চন-যোগ! সেই নবাগতা নবমীর অলোক-সামান্যা জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমার পানে সকলেরই মুগ্ধ দৃষ্টি

পুনঃ পুনঃ নিবদ্ধ হইতে লাগিল। নবকিশোরী—নবকিশোরীই বটে! তখনও সে দেহ-লতায় কৈশোরের পুণ্য-শ্রী ফুটিয়া উঠে নাই, তথাপি, সেই বাল-সৌকুমার্য্য, শৈশব-সরল তরল হাসি, সঙ্কোচলেশহীন সুন্দর চাহনি, পূর্ণকিশোর যদুনারায়ণের চিত্তে এমন একটী সুস্নিগ্ধ যাদু-স্পর্শ সঞ্চারিত করিল,—যাহার অনুভূতিই তাঁহার সুখ, তাঁহার শান্তি, তাঁহার সর্ব্ব সৌভাগ্য-নিদান বলিয়া সাব্যস্থ হইতে বিলম্ব হইল না!

আজ এই অকালমৃত্যুর যুগে বাল্য-বিবাহ নানা অনিষ্টের আকর বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, কিন্তু সে যুগে উহাই পরম শুভজনক ছিল। ফলতঃ, উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য অতি সমীচীন। স্বয়ম্বর-প্রথা যখন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত, যখন পরের হস্তে নারীর সংসার-সাথী নির্ব্বাচনের ভার, তখন যে সময় হৃদয় তরল থাকে, সেই সময়ে সেই হৃদয় যদি অন্য তরল হৃদয়ের সহিত মিলাইয়া দেওয়া যায়, তবে সে মিলন সুন্দর না হইবার কোনও হেতু থাকে না; বরং, নারী যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই স্বামীর সংসারে পরিচিত হইয়া, তত্রত্য প্রত্যেকের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহারে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। আজ কাল আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সংখ্যাল্পতা বাল্য-বিবাহ রহিত হইবার ফলস্বরূপ বলিতে পারা যায়। এখনও কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্য-বিবাহের প্রচলন আছে বলিয়া উহাদের একান্নবর্ত্তিতা স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু যখনই বালবিধবার মরু-দৃশ্য মনে পড়ে, যখনই কন্যাদায়-গ্রস্তের অর্থ-সংগ্রহের দীর্ঘকালব্যাপী আকুল চেষ্টা শত দৈন্যের ভিতর দিয়া, সর্প-জিহ্বার ন্যায় লক্ লক্ করিতে থাকে, তখনই সে ভাবী সুখের—প্রগাঢ় মিলনের পুণ্যচ্ছবি মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রদ্যুতির ন্যায়ই ম্লান হইয়া যায়!

যাহা হউক, শীর্ণা বল্লরী যেমন বর্ষাস্নাত হইয়া, নব নব পল্লব-কিশলয়ে বিকশিত হইয়া উঠে,—বিবাহের জল পড়িলে স্ত্রীলোকও সেইরূপ নবোদ্ভিন্ন সুষমায় ভূষিত হইতে আরম্ভ করে। দেখিতে দেখিতে নবকিশোরীর অস্ফুট-কোরকতুল্য কম-সৌন্দর্য্য দ্রুত জাগরণের সাড়া তুলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সেই কুমারী গৌরী-মূর্ত্তি কালক্রমে ষোড়শী ভুবনেশ্বরী প্রতিমায় পরিণত হইল। চকোর যদুনারায়ণ প্রারম্ভে নবমীর খণ্ডশশীর সুধাপান করিতে করিতে, সুখ-সংকীর্ণ সপ্ত-বর্ষের মধ্যে পৌর্ণমাসীর প্লাবিত জ্যোৎস্নালোকে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন! সে রূপের উৎসব আছে, উচ্ছলতা নাই; উল্লাস আছে, আকুলতা নাই; বিলাস আছে, উদ্দীপনা নাই। আজ মর্ত্ত্য অলকানন্দার কূলে কূলে জল,—সে প্রেম-প্রবাহ বাঞ্ছিতের পানে চলিয়াছে, তাহার ক্ষুদ্র লহরী বিক্ষোভের বার্ত্তা জানে না;—তাহাতে লীলায়িত শান্ত-নর্ত্তন; বীণা-ধ্বনিবৎ, সাম-গীতিময় পূত-কল্লোল; সে প্রবাহে আবিলতা নাই, শৈশবের স্বচ্ছ-নির্ঝর যেন তাহার সমস্ত পঙ্কিলতা উদ্ভূত হইবার পূর্ব্বেই নিঃশেষে ধৌত করিয়া রাখিয়াছে! প্রেমিক যদুনারায়ণ প্রেম-বিভোর হইয়া সেই রূপ-সুধা পান করি-তেন,—তাহাতে সুরার মাদকতা আসিত না, ঋষি-পীত সোমরসের ন্যায় অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে একাগ্রতা আনিয়া দিত!

তাহাই ত হইয়া থাকে—যেখানে নিষ্ঠাবতী হিন্দু-ললনা রাণী ত্রিপুরা দেবীর ন্যায় শ্বশ্রূমাতা, আর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ কুলপতি রাজা অবনীনাথের দুহিতার ন্যায় বধূ। হিন্দুর হিন্দুত্বের ব্যপদেশে নিষ্ঠ-শুচিতা, ব্রত, উপবাস, নিয়মানুবর্ত্তিতা, ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস, দেব-দ্বিজে অন্ধ ভক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, তাহা হিন্দু-নারী-হৃদয়ে যত বেশী সঞ্চিত, পুরুষে তত নাই।

ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান কাল অবধি হিন্দুর সংসারে বিরল নহে। ভাদুড়ীচক্রের রাজশক্তিতে মুসলমান প্রাধান্য থাকিলেও, রাজা গণেশনারায়ণ বংশানুক্রমিক মুসলমানের পৃষ্ঠপোষক হইলেও, তাঁহার রাজ্ঞীর হিন্দু-শাস্ত্রোচিত ব্রতপরায়ণতা, শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানের চিত্তেও ভক্তির উদ্রেক করিত! প্রকৃতি-পুঞ্জের প্রতি তাঁহার জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষ অনাবিল পুত্র-বাৎসল্য, নিরপেক্ষ দয়া-দাক্ষিণ্য তাঁহাকে মাতৃ-অভিধানে অভিহিত করিত। বিশেষতঃ, এই প্রতিভাময়ী রমণীর তেজস্বিতা এত প্রখর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিত যে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা গণেশনারায়ণের চক্ষুও অনেক সময় ধাঁধিয়া যাইত! এমন শিক্ষয়িত্রীর প্রিয়তমা শিষ্যা নবকিশোরী হিন্দুনারীর কি সুন্দর আদর্শে বর্দ্ধিতা ও পরিপুষ্টা হইয়াছিল, তাহা জানিতে প্রাণে বাস্তবিকই একটা আগ্রহ জন্মে। প্রেমের সহিত ভক্তি, পতিপরায়ণতার সহিত হিন্দু-সাধ্বীর স্ত্রীত্ব কি ভাবে তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল;—তাহার মধ্যে কি ভাবে বিলাস ও ব্রহ্মচর্য্য পরস্পর নিতান্ত বন্ধুর ন্যায় পাশাপাশি থাকিয়া, প্রয়োজনমতে পরস্পরের অধিকার ত্যাগ করিয়া সরিয়া দাড়াইত,—সেই সুন্দর পত্নীত্বের বিষয় আলোচনাতেও পুণ্য আছে,—গৌরব আছে।

একদিনের কথা বলিতেছি। বাসন্তী রজনী, শুক্লা সপ্তমী তিথি। যুবরাজ যদুনারায়ণ শয়ন-প্রকোষ্ঠে রজত-পালঙ্কে শয়ান। উন্মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া, চূত-মুকুল ও পুষ্প-বীথির সুরভি মাখিয়া, বিলাস-প্রিয় মলয়-সমীর সমস্ত কক্ষমধ্যে মৃদু স্পন্দন জাগাইয়া যুবরাজের কুঞ্চিত কেশ, ললাট ও বিশাল বক্ষে লুটাইয়া পড়িতেছিল আর কাশ-শুভ্র স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না সেই সুরভি-প্রবাহকে অমরতা দান করিবার জন্যই, তাঁহার আবক্ষ-ভালদেশে সুধার নির্ঝর খুলিয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল। কুমার নীলা-

স্বরতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, কখন্ চান্দ্র সুষমার সহিত নবকিশোরীর তুলনা করিতে করিতে তন্দ্রাবিষ্ট হইতেছিলেন, কখন্ বা বাঞ্ছিতার নুপূর নিক্কণে ও ভূষণ-শিঞ্জনে তাহার আগমন-সংবাদ অবগত হইবার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া পড়িতেছিলেন। নবকিশোরী তখনও আসিল না! মলয়ানিলকে অমর গৌরব দান করিয়া জ্যোৎস্নাসুন্দরী ধীরে ধীরে অন্তর্হিতা হইলেন। প্রিয়া-বঞ্চিত দয়িতের ন্যায় সমীরণ যেন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল! ঈষৎ অধৈর্য্যের সহিত যদুনারায়ণ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া শুইলেন। আবার তন্দ্রা আসিল।

ইত্যবসরে অতি ধীর পাদ-সঞ্চারে গুণ্ঠনবতী নবকিশোরী কক্ষ-প্রবিষ্ট হইল। অতি ধীরে—সন্তর্পণে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল ও নিঃশব্দে স্বামীর চরণ-সন্নিধানে পালঙ্ক-প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া মলয়-মারুত অপেক্ষা মধুরতর ভাবে ব্যজনী-সহযোগে বাতাস করিতে লাগিল।

কিন্তু গৃহমধ্যে সামান্য শব্দ হইলে কৃপণ যেমন জাগিয়া উঠে, তদ্রূপ ব্যজন-ব্যপদেশে ভূষণের ঈষৎ শব্দেই কুমারের তন্দ্রাজড়িত অবসন্নতা তিরোহিত হইল। তিনি একটু বিদ্রূপ করিয়া কিশোরীকে বলিলেন;—কিগো, এত ক্ষণে কি কিশোরীর কৃষ্ণকথা মনে পড়্‌ল?

কিশোরী চমকিত হইয়া বলিল;—তুমি এখনো ঘুমোওনি,—রাত্রি অনেক হয়েছে যে! রামায়ণ পড়্‌তে পড়্‌তে আজ একটু দেরী হয়ে গেছে। আহা বড় ভাল যায়গাটায় এসে পড়েছি। মা বল্লেন,—"বউমা, একটু বসো, তারপর কি হল আর একটু পড়—শুনি।" আমিও ছাড়তে পারি না,— যত পড়ি ততই যেন পড়তে ইচ্ছে করে!

এই বলিয়া কিশোরী ব্যজনী রাখিয়া কুমারের পদস্পর্শ করিল। যদুনারায়ণ অমনি পরমাগ্রহে তাহার অঞ্চলাগ্র ধরিয়া তাহাকে বক্ষে

টানিয়া লইয়া কপোলে চুম্বন করিতে করিতে হাস্য-মধুর কণ্ঠে বলিলেন ;—

থাক্, আর পদ-সেবা কত্তে হবে না। পিপাসা মুখে আর বুকে, পায়ে হাত বুলিয়ে সে পিপাসা আরও বাড়িয়ে দিতে চাও কিশোরি! যেখানে ব্যাধি সেখানে ওষুধ দাও,—একটু কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাক,—এস খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্। হাঁ তারপর, রামায়ণের কোথায় পড়ছিলে? এদিকে যে তোমার রামচন্দ্র "হা সীতে—হা বৈদেহি—" বল্‌তে বল্‌তে অশোক-স্তবকে প্রিয়তমার সাদৃশ্য ভেবে নিয়ে গবাক্ষ-পথ দিয়ে লম্ফ-প্রদানের ব্যবস্থা কচ্ছিল!

কিশোরী কণ্ঠলগ্না থাকিয়াই হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল;—যাক্,—এখন সে পাগ্‌লা ভাবটা কেটেছেত? পরে গম্ভীরভাবে বলিল ;—আজ পড়্‌ছিলাম সীতার পাতাল-প্রবেশ। চোকের জল রাখা যায় না!

যদুনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন ;—ওঃ! তা হলে ত আমার কথা মনে থাকবেই না! ঐখানটায় বাল্মিকী নারীজাতির প্রতি ভারি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। রামচন্দ্র লোকনিন্দার ভয়ে সীতাকে নির্ব্বাসিত করেছিলেন বটে, কিন্তু হৃদয়-সিংহাসনে তাঁকে কতটা সুপ্রতিষ্ঠ করে সতীর সেই চিন্ময়ী প্রতিমাকে পূজা করেছিলেন! কিশোরি, ভেবে দেখ দেখি, সে কি প্রেমের পূজা!

কিশোরী উত্তর দিল ;—বাল্মিকীমুনি যা ঘট্‌বে বা ঘটেছিল, তাইত বর্ণনা করে গেছেন,—তাঁর দোষ কি? আর শ্রীরামচন্দ্র যে পূর্ণ-গর্ভা জানকীকে বনবাস দিলেন, সেটা কত বড় নিষ্ঠুরের কাজ! কোনও স্বামী এমন কাজ কত্তে পারে?

যদু বলিলেন ;—রামচন্দ্রের ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বামী অনায়াসে তা কত্তে পারেন। কিশোরি! তিনি যে রাজা! প্রজা-রঞ্জনই

রাজ-ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম পালন কত্তে আত্মবলি চাই। রামচন্দ্রের সীতা-ত্যাগ—যে সীতার জন্য তিনি কি না করেছেন,—সেই হারানো মাণিক কত আয়াস-স্বীকার করে হাতে পেয়ে পুনরায় ইচ্ছা করে হারিয়ে ফেলা, এ ত্যাগ কত বড় ত্যাগ কিশোরি! জগতের কোন্ সম্রাট্ প্রজার সুখের জন্য এতটা ত্যাগ-স্বীকার কত্তে পেরেছেন বল দেখি?

কিশোরী উত্তর দিল;—সে যা বলছ, ঠিক। কিন্তু অল্পবুদ্ধি প্রজার অন্ধ ধারণা দূর কর্ব্বার কি আর কোনও উপায় ছিলনা, যার জন্য তাঁর আদর্শ সহধর্ম্মিণীকে নিরাশ্রয়া অবস্থায় দূর বনে রেখে আস্তে হল! আর তার জন্য ছলনাই বা কত! সরল প্রেমের, অকপট বিশ্বাসের কি এই প্রতিদান হল! ধন্য নারী সীতা,—তাই এমন ভাবে পরিত্যক্ত হয়েও কাঁদছেন আর বলছেন,—শুধু এক জন্মে নয়, জন্ম-জন্মান্তরেও যেন রামচন্দ্রকেই তিনি পতিরূপে পান! এ জগতে কটা নারী এত পতিভক্তি দেখাতে পেরেছে, বল্‌তে পার?

যদু বলিলেন;—স্বীকার করি, কিন্তু তিনিও রামচন্দ্রের প্রতি নিষ্ঠুরতা কম করেন নি! পরিশেষে, পাতাল-প্রবেশ পর্য্যন্ত করে তিনি তাঁর অভিমানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। তিনিও তার প্রতিশোধটা কম নিয়ে যান নি!

কিশোরী সদর্পে বলিল;—যাবেন না কেন? আবার পরীক্ষা! পদে পদে এত লাঞ্ছনা—এত সন্দেহ—এত যাচাই করা কেন? খাঁটী সোণা কতবার করে দেখ্‌তে হয়? বার বার তাকে আগুনে পোড়াতে হবে কেন?

যদু বলিলেন;— হলই বা? তাতে সোণার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না ত!

কিশোরী বলিল;—না হোক্, যেখানে খাঁটী সোণা চিন্‌বার লোক নেই সেখান থেকে ওরূপ সোণার বিদায় নেওয়াই কর্ত্তব্য। তাইত

সীতা চলে গেলেন। সতী-শিরোমণি সতীত্বের গরিমায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করে, বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে, নিন্দককে মূক করে চলে গেলেন ধরিত্রীর কোলে,—মায়ের কোলে—যিনি মেয়ের ব্যথা বুঝ্‌তে পারেন। কি সুন্দর অভিযান! জন্মে জন্মে যেন সীতাদেবীর আদর্শ নিয়ে জন্মগ্রহণ কত্তে পারি।

এই বলিয়া ভক্তি-বিহ্বলা কিশোরী সীতাদেবীর উদ্দেশে শিরে কর-স্পর্শ করিল। যদুনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—তা হলে দেখ্‌ছি, আমাকেও রামচন্দ্র হয়ে জন্মাতে হচ্ছে। কিন্তু সেটা ত ভেবে দেখ্‌লে না কিশোরি,—সীতা যে চিরদুখিনী!

কিশোরী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল ;—তাতে ক্ষতি কি? যদি ঐরূপ সতীত্ব-গৌরব নিয়ে জন্ম-জন্ম দুঃখভোগ কত্তে হয়, সেও ভাল, আমি তাতে খুব রাজি।

যদুনারায়ণও তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন ;—তবে আমিও বলি, শ্রীরাম-চন্দ্রের লোকরঞ্জনই যেন আমার মূলমন্ত্র হয়। সে জন্য যদি আমার—

টিক্—টিক্—টিক্!! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এক দুষ্ট টিক্‌টিকী কোথায় বসিয়াছিল, যেন কুমারের কথার সমর্থন করিল! যদুনারায়ণ ঐ পর্য্যন্ত বলিয়াই স্তব্ধ হইলেন। নবকিশোরীর হৃদয় কি জানি কেন স্পন্দিত হইল! তখন দুই জনে কি এক ভাবী বিপদের আশঙ্কায়, দুই জনকে আকুল আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিলেন! আলিঙ্গনের প্রগাঢ়তা যেন তবু সেই টিক্‌টিকীর সায়টুকুকে কিছুতেই সরাইয়া দিতে পারিল না! ক্রমে রাত্রির তৃতীয় যাম অতীত হইতে চলিল, কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই। কাহারও চিত্তে সেই দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হইল না। উভয়েই নীরব—চিন্তাকুল—চঞ্চল!

অনেকক্ষণ পরে কুমার ডাকিলেন ;—কিশোরি !

কিশোরী উত্তর দিয়া বলিল ;—এখনো ঘুমোও নি ! ঘুমোও, রাত্রি বেশী নেই। আমি তোমাকে বাতাস কচ্ছি, একটু ঘুমোও। কাল আবার দরবার, খুব সকালেই উঠ্‌তে হবে। বড় অন্যায় হয়ে গেল !

যদু দ্বিরুক্তি করিলেন না। নবকিশোরীও গাত্রোত্থান করিল না, সেই ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধা থাকিয়া স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল।

হায়রে সংস্কার ! তুমি এমন দুইটী হৃদয়কেও বিচলিত করিতে পার !

৫
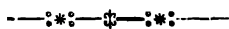
পরদিন প্রভাতেই দরবার বসিয়াছে। মর্ম্মর-মণ্ডিত বিশাল গৃহতলে মহামূল্য আস্তরণ। আস্তরণের এক পার্শ্বে হিন্দু ও অন্য পার্শ্বে মুসলমান অমাত্যগণ পর্য্যায়ক্রমে উপবিষ্ট। প্রকোষ্ঠের উত্তর প্রান্তে চন্দ্রাতপ-তলে দুইখানি রৌপ্য-নির্ম্মিত সিংহাসন, একখানি অন্যাপেক্ষা অনতিবৃহৎ। প্রথম খানিতে মহারাজ গণেশনারায়ণ গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ উপবিষ্ট; দ্বিতীয় খানিতে যুবরাজ যদুনারায়ণ চিন্তাক্লিষ্ট মুখে মেঘ-বিমর্য রবি-দ্যুতির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।

মহারাজের বামপার্শ্বে অন্য একখানি রৌপ্য-সিংহাসন পাতিত হইয়াছে, তদুপরি রাজা অবনীনাথ,—কুমারের শ্বশুর, সান্যালগড়ের অধীশ্বর, বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের সমাজ-পতি। এতদ্ভিন্ন চতুঃপার্শ্বে সেনানী, পারিষদ্-বর্গ, সেনাগণ, শান্তিরক্ষক প্রভৃতি যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া, সেই প্রকাণ্ড জনমণ্ডলীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল।

অকস্মাৎ সম্রাট্ সৈফুদ্দিন গত হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নসেরিৎ সামসুদ্দিন নাম ধারণ করিয়া মুসলমানগণের সাহচর্য্যে গৌড়-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন; কনিষ্ঠ আজিম গৌড় হইতে বাহিরে আসিয়া সাহ উপাধি ধারণ করিয়াছেন ও তিনিই সিংহাসনের প্রকৃত দায়াদ্ এই সংবাদ প্রচার করিয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু মুসলমানের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেছে না। তাহারা বুঝিয়াছে,—আজিম সম্রাট্ হইলে হিন্দু-মুসলমানকে সমান আসন প্রদত্ত হইবে,—বিজিত ও বিজেতার মধ্যে যে তারতম্য,তাহা একেবারে উপেক্ষিত হইবে। অন্যপক্ষে, নসেরিৎ কদাচারী হইলেও বা মসনদের

ন্যায্য উত্তরাধিকারী না হইলেও, হিন্দুর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যদি হিন্দুকে একেবারে নির্ব্বীর্য্য করিতে হয়,—যদি গৌড় সাম্রাজ্যের মধ্যে মুসলমান প্রভুত্ব চির অটল করিতে হয়, তবে হিন্দুকে প্রশ্রয় দেওয়া কোনও ক্রমে কর্ত্তব্য নহে। পদস্পৃষ্ট সর্পকে দংশন করিবার অবসর না দিয়াই অচিরে নিষ্পেষিত করাই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং, হিন্দু-মুসলমান উভয়েকেই যে চায় তদপেক্ষা যে শুধু মুসলমানকে চায়, তাহার পক্ষাবলম্বন শ্রেয়ঃ,—ইহাই অধিকাংশ মুসলমানের ধারণা ও মত। এরূপ অবস্থায় আজিমসাহকে অগত্যা হিন্দুর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে। কিন্তু কয়জন হিন্দু মুসলমানের সহিত প্রকাশ্য শক্রতায় সম্মুখীন হইতে সাহসী হইবে? এক ত বিজিত বলিয়া তাহারা কত অপরাধী, তাহার উপর প্রতিদ্বন্দ্বীর বেশে দণ্ডায়মান হইলে, তাহাদের কি আর রক্ষা থাকিবে? যদি আজিম পরাজিত হন, তৎপক্ষীয় হিন্দুর দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না, এই ভাবিয়া অনেক হিন্দুও তাঁহাকে সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ। সুতরাং, যৎসামান্য হিন্দু-সেনা লইয়া ও দুই চারিটী মাত্র মুসলমান সৈন্যের সহায়তায় আজিমসাহ কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া, কি উপায়ে পিতৃরাজ্য অধিকার করিবেন ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র ভরসা,—রাজা গণেশনারায়ণের সাহচর্য্য। সেই জন্য তিনি বিনয়সহকারে তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া দূত প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজাও বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। নসেরিৎ প্রবল,—আজিম দুর্ব্বল। দুর্ব্বলকে সহায়তা বীরের কার্য্য বটে, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে রাজনীতি সে বীরত্বকে অনুমোদন করে না। সার্থকতার দিক্ দিয়া, সামর্থ্যের অনুপাতে পক্ষ-নির্ব্বাচন কর্ত্তব্য। যেখানে আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রতিহত না হয়, সেই পক্ষই গ্রহণীয়।

যাহা হউক, রাজা একে একে প্রত্যেক সচিবের মতামত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সচিব ইব্রাহিম খাঁ বলিলেন,—তাঁহার মতে এ সময় মহারাজের কোনও পক্ষই গ্রহণ করা উচিত নহে। তাঁহার রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান জাতি-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইতেছে, অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভাতুড়ীচক্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বৈধভাব নাই। আজ যদি তিনি কোনও পক্ষ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, তাহাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃভাব গড়িয়া উঠিতেছে তাহা সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। ভাতুড়ীরাজ-বংশের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর নহে। আরও কথা, বাদসাহ-দরবারে তাঁহার প্রতিপত্তি এখনও অগ্রাহ্য হয় নাই,—তাহাও তাঁহার মুসলমান-পৃষ্ঠপোষকতার ফলে। হিন্দু হইয়া মুসলমানকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া সম্রাট-দরবারে তিনি যে সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন, আজ এই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে তিনি যে পক্ষই গ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার সে সম্মান কমিবে বই বাড়িবে না। যদি তিনি জয়ীর পক্ষে অবস্থিত হন, তাহা হইলে, তাঁহার একদেশদর্শিতার জন্য একটা ঘৃণা জয়ীর হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকিবেই; আর যদি পরাজিতের পক্ষে অবস্থিত হন, তাহা হইলে, ভাবী বিজেতার রোষ-দৃষ্টি ভাতুড়ী-বংশের প্রতিষ্ঠাকে ভস্মীভূত করিবে।

কিন্তু অপর বৃদ্ধ মন্ত্রী ওয়াজেদ্ তাহা সমর্থন না করিয়া বলিলেন;—অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে মহারাজ বেশী দিন নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। আজ আজিম সাহ তাঁহার সাহায্য-প্রার্থী, কাল নসেরিৎ সাহও তাঁহাকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতে পারেন। উভয়েই জানেন, মহারাজের শক্তি কত। সে শক্তি যেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে, সেই পক্ষ দুর্জ্জেয় হইবে। সুতরাং, দুই জনই তাঁহাকে

পক্ষভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইবেন। সে ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হওয়া উচিত,—কোন্ পক্ষ গ্রহণ সমীচীন।

তখন রাজা হিন্দু সচিবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পলিত-কেশ মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়বাগীশ মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিলেন,—বর্ত্তমানে আজিম সাহ বিতাড়িত, পলায়িত। মুসলমান তাঁহাকে সমর্থন করিতেছে না। কয়জন হিন্দুই বা তাঁহাকে সাহায্য করিতে সাহসী হইবে? হিন্দুর এখন সে দুঃসাহস করাও উচিত নয়। তাহাতে এখনও হিন্দুর যেটুকু বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট আছে,—তাহাও লুপ্ত হইবে। বরং, বলবানের পক্ষে থাকিয়া যাহাতে সেই বৈশিষ্ট্যটুকু কোনও প্রকারে বজায় রাখা যায় তাহারই চেষ্টা কর্ত্তব্য। নসেরিং সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রতিপত্তিশালীর মস্তক আজ তাঁহার সম্মুখে অবনত। সুতরাং, আজিম অপেক্ষা নসেরিং শত বলে বলীয়ান্। সে ক্ষেত্রে নসেরিতের পক্ষ গ্রহণ সমীচীন। নচেৎ, ভবিষ্যতে সাঁতোড়ের ন্যায় ভাদুড়ীচক্রের রাজ সম্মানও যে সম্রাট-দরবারে উপেক্ষিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

শেষোক্ত মন্তব্যটুকু প্রকাশ করিয়া ন্যায়বাগীশ মহাশয় একটু অপ্রতিভ-ভাবে মস্তক-কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন।

তথাপি, রাজা অবনীনাথ নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন;—সাঁতোড় চিরদিনই বাদসা-দত্ত সম্মানকে তেমন কিছু গরিমার বস্তু বলে- বোধ করেনি। সুতরাং, সেই অবহেলিত সম্মানকে প্রতিগ্রহণ করে গৌড়সম্রাট্‌গণ তাকে তার ন্যায্য মর্য্যাদা থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত কত্তে পারেন নি।

রাজা গণেশনারায়ণ ঈষৎ হাস্যসহকারে বৈবাহিকের পানে চাহিলেন। রাজা অবনীনাথও তাহার মর্ম্ম বুঝিলেন এবং প্রকৃত আলোচ্য বিষয়ের

অবতারণা করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—আমার মতে মহারাজের এখন কোনও পক্ষ গ্রহণ না করাই কর্ত্তব্য। মুসলমানে মুসলমানে, সাহজাদায় সাহজাদায় লড়াই, আমাদের সে ঝঞ্ঝাটে মিশবার দরকার কি? বরং, তারা পরস্পরে বিরোধ বাধিয়ে ক্ষীণবীর্য্য হয়ে পড়্‌লে আমাদেরই সুবিধা। এখন আমাদের শক্তি ক্ষয় করা কোনও মতে কর্ত্তব্য নয়। আত্মদ্বন্দ্বিতার পরিণামে যখন তারা মাটীতে লুটিয়ে পড়্‌বে, সেই যোগ্য অবসরে আমাদের সঞ্চিত শক্তি সঞ্চালিত করে আমরা হৃতকীর্ত্তি পুনরুদ্ধার কর্ত্তে সমর্থ হবো। এই দুর্দ্ধর্ষ জাতি যেমন আমাদের মুমূর্ষুপ্রায় অবস্থায় গৌরব-কিরীট খুলে নিয়েছে, আমরাও ঠিক সেই অবস্থাতেই তাদের মস্তক থেকে মুকুটখানি ছিনিয়ে নিতে চাই। তবেই ত না প্রতিশোধ! বোধ হয়, সেই প্রতিশোধ-গ্রহণের সুযোগ এসে শীঘ্রই আমাদের আহ্বান কর্ব্বে। তাই বল্‌ছি, মহারাজ, এখন সেই সুযোগের প্রতীক্ষাই করুন্।

রাজা অবনীনাথের কথাগুলি বিরাট দরবারে ভীষণ চাঞ্চল্যের উদ্ভব করিল। তথাপি, ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজাকে সমর্থন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—সাঁতোড়রাজের উক্তি সকলের প্রীতিপ্রদ না হতেও পারে। কিন্তু জাতীয়ত্ব বা নিজ নিজ জাতির স্বার্থ দেখ্‌তে গেলে, সে অপ্রীতির ভয় কল্লে চল্‌বে না। যদি হিন্দুত্ব রক্ষা কর্ত্তে হয়, যদি গৌড়-সিংহাসনের উপর হিন্দুর স্বাধীন ছত্র পুনরুত্থিত কর্ত্তে হয়, তাহলে মহারাজের এখন নিরপেক্ষ থাকাই কর্ত্তব্য এবং এই অবসরে সাঁতোড় আর ভাদুড়ীচক্র দুইশক্তি সম্মিলিত হয়ে মুসলমান প্রাধান্য উচ্ছেদ করার উপায় নির্দ্ধারণ অতীব কর্ত্তব্য। কোনও বীরধর্ম্মী হিন্দু-সন্তানের এই সুবিধা হেলায় হারানো উচিত নয়। সাঁতোড় রাজ ঠিকই বলেছেন।

তখন দরবারস্থ মুসলমান-মণ্ডলে বিষম অস্থৈর্য্যের সাড়া পড়িল। প্রত্যেকের মুখে বিরক্তির অরুণ-রাগ সূচিত হইল। সেনাপতি এনায়েৎ খাঁ গাত্রোত্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন;—মহারাজ, ত্রুটী মার্জ্জনা কর্বেন। সাঁতোড়-রাজ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পক্ষপাত-পূর্ণ যুক্তি প্রত্যেক মুসলমানের চিত্তে আত্মপক্ষ-সমর্থনের উদ্রেক না করে থাকৃতে পারে না। যে জাতি এসিয়ার সুদূর প্রান্ত থেকে অভিযান করে ভারতের বক্ষে এসে বিজয়-নিশান প্রথিত কত্তে সমর্থ হয়েছে, সমগ্র হিন্দুস্থান,—আপনাদের বীরত্বের খনি সমগ্র হিন্দুস্থান যার পদভরে কম্পমান্, বল্‌তে পারেন, সে জাতি সামান্য দস্যুপালের ন্যায়, হৃদণ্ডের জন্য তাদের প্রভাব জানিয়ে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে? মুসলমান তত ক্ষীণ-বীর্য্য নয়, তত ভীরু চলচ্চিত্ত জাতি তারা নয়। তারা ঐক্যে হস্তী-যূথ, শৌর্য্যে মৃগেন্দ্র, প্রতিহিংসায় শার্দ্দূল। আজ আত্মদ্বন্দ্বে গৌড়-মসনদ টলটলায়মান, তাইতেই কি বুঝতে হবে, মুসলমান গেল, চূর্ণ হল, বাঙ্‌লা থেকে এবার তার চির-বিদায় গ্রহণ কত্তে হল! তা নয়। সামান্য দক্ষিণা বাতাসে এ প্রাবৃট্ সন্তাড়িত হবে না। বরং দেখ্‌বেন, স্তূপে স্তূপে, পুঞ্জে পুঞ্জে অসংখ্য জলদ আবার বঙ্গাকাশ ছেয়ে ফেল্‌বে ও তাদের অবিশ্রান্ত বারিধারায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হবে। কেন না, তারা দৈবকে বরণ করে নিশ্চেষ্ট থাকৃতে জানে না, তাদের পুরুষকারে বিশ্বাস ঢের বেশী। তাই তারা শতবার প্রতিহত হয়েও উৎসাহ হারায় না। মহারাজ, আপনি নিরপেক্ষ থাকৃতে চান থাকুন, তাতে অন্ততঃ আমার বিশ্বাস, মুসলমান জাতির বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। আজিম খাঁ নসেরিৎ যিনিই এ যুদ্ধে জয়ী হন, অথবা যদি দুজনই নিহত হন, তাতেও মুসলমান শক্তির কিছুই এসে যাবে না।

যে প্রেরণায় এই মুসলমান-বর্ত্তুল ভারতের আকাশ-পানে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, সে শক্তি বালকের নয়, সে বর্ত্তুল ক্রীড়া-কন্দুক নয়। যত দিন না এই বর্ত্তুলমধ্যে নিহিত শক্তি পূর্ণভাবে ব্যয়িত হবে, ভারত জাতির এমন কোনও আকর্ষণ নাই বা হবে না, যে তাকে ভূতল-শায়ী কর্ব্বে। সামান্য বিক্ষোভ দেখে, আপনারা মনে কত্তে পারেন, এইবার এই পতনোন্মুখ জাতিকে করতলগত কর্ব্বো, কিন্তু সে মহা-ভুল। আমি পুনঃ পুনঃ বল্‌ছি, এ জাতির জীবন আছে, এ বর্ত্তুল সঞ্চিত তেজঃপিণ্ড, শীঘ্র পৃথিবী চুম্বন কর্ব্বে না; বরং দেখ্‌বেন, শীঘ্রই এ সামান্য ঝঞ্ঝা কাটিয়ে, দ্বিগুণ দর্পে উর্দ্ধে উত্থিত হবে,—আপনারা কিছুতেই তার নাগাল ধত্তে পার্ব্বেন না।

এনায়েৎ খাঁর ওজস্বিনী বাণী সমস্ত মুসলমান চিত্তে কি এক দুর্দ্দম্য ভাবের সঞ্চার করিল, হিন্দু-সমাজেও একটা অসহ্য যন্ত্রণার অস্থিরতা জাগাইয়া তুলিল। মহারাজ গণেশনারায়ণও বিচলিত হই-লেন। তাঁহার রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতিই তাঁহার প্রধান বাঞ্ছিত বিষয়। সহসা এ মতদ্বৈধের সৃষ্টি তাঁহার ভাল ঠেকিল না। তিনি অন্যান্য অমাত্যকে মন্তব্য-প্রকাশের অবসর না দিয়া, পুত্র যদুনারায়ণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া, স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন;—যদু, তোমার কি মত?

চিত্ত চঞ্চল থাকিলেও, প্রত্যেকের মন্তব্য যদুনারায়ণ শুনিতে ছিলেন। বিশেষতঃ, এনায়েৎ খাঁর তেজঃপূর্ণ উক্তি তাঁহার অবসাদ-জনিত অন্য-মনস্কতা দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিল। তিনি পিতার অনুজ্ঞা-ক্রমে বলিলেন;—

যেখানে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে মন্ত্রণা-সভা আহূত হয়েছে, সেখানে কোনও জাতি কোনও জাতিকে আক্রমণ করে, মন্তব্য-প্রকাশ বা

যুক্তি-প্রদর্শন, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বড় বিসদৃশ বলে বোধ হয়। হিন্দু মুসলমানে কলহের ভাব উদ্দীপিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আমাদের উদ্দেশ্য হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি। আমাদের এটা সকল সময় মনে রেখে কাজ কত্তে হবে,—বিজেতাই হই, আর বিজিতই হই, আজ আমরা যে ভূমির বক্ষে দণ্ডায়মান; যে ভূমির রসধারা পান করে, আজ আমরা বৰ্দ্ধিত, পরিপুষ্ট—আমরা সকলেই সেই এক ভূমি-সম্পর্কে ভাই—ভাই। জাতীয় প্রতিহিংসা, প্রতিশোধের কথা ভুলে যেতে হবে, সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে। তবে দেশের উন্নতি, সুখ, শান্তি যাহা কিছু সব। গৌড়ে যে অন্তর্বিপ্লব, তার মূলেও ঐ জাতীয় পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান। নসেরিৎ হিন্দু-দ্বেষী, কিন্তু আজিম সাহ হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী। সুতরাং, আমাদের ও আজিম-সাহের উদ্দেশ্য এক। সে ক্ষেত্রে আমাদের নিরপেক্ষ থাকা অন্যায় এবং কোন্ পক্ষ সমর্থন উচিত, তাও সহজে বিবেচ্য। আরও কথা, আজিম পূর্ব্বেই যখন আমাদের সাহায্যপ্রার্থী, তখন আজিম সাহকেই সাহায্য আমাদের সম্পূর্ণ উচিত বলে বোধ হয়।

পুত্রের বাক্যে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন ;—কিন্তু বৎস, নসেরিৎ গৌড়-সিংহাসনে আসীন,—আজিম সহায়-সম্পদহীন পলাতক,—সে ক্ষেত্রে আজিমকে সাহায্য শুভ হবে কি ?

পুত্র উত্তর করিলেন ;—পিতা, সে চিন্তা কত্তে গেলে, ন্যায়কে বিসর্জ্জন দিতে হয়, সত্যকে নির্ব্বাসিত কত্তে হয়। সমস্ত মুসলমান যদি আজ আজিম সাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, আর সমস্ত হিন্দু যদি প্রবল বুঝে নসেরিতের পক্ষ গ্রহণ করে বা সুযোগের প্রতীক্ষায়,

নিশ্চেষ্ট বসে থাকেন, তাহলেও, আমাদের আজিম সাহকেই সাহায্য কত্তে হবে।

রাজা অবনীনাথ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি জামাতার পানে চাহিয়া বলিলেন ;—তা হলে প্রকারান্তরে আমরাই আমাদের পায়ে কুঠারাঘাত কচ্ছি বুঝ্‌তে হবে। এ ত এক রকম মুসলমানকেই সাহায্য !

যদু উত্তর দিলেন ;—ঠিক তাই কি? এ কোনও মুসলমানকে সাহায্য নয় ত,—এ সাম্যের সাহায্য, সাম্যকে সাহায্য। আজ সমস্ত দেশেই প্রায়: মুসলমান এসে বাস কত্তে আরম্ভ করেছে। বীর্য্যে ঐশ্বর্য্যে, জন-সম্পদে তারাই শ্রেষ্ঠ। তারা ত দুদিনের তরে প্রবাসীর জীবন যাপন কত্তে ভারতে আসেনি। তারা এসেছে, ভারতে চিরবাসী হতে, সংসারী হতে, আমাদের মাকে তাদের মা করে নিতে। কোন্ পুরাযুগে একদিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য ঋষিগণও ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে পদার্পণ করেছিলেন। অনার্য্যেরাও তাঁদের বিতাড়িত কত্তে কম চেষ্টা করে নি, কিন্তু পেরেছিল কি? কেমন করে পার্ব্বে? দেশ-মাতৃকাকে যে মা বলে ডাক্‌তে জানে,—যে সে মায়ের সেবা কত্তে জানে,—মা তাকে কোলে এত জোরে আঁকড়ে ধরেন যে, কেউ তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। বিশেষতঃ, মায়ের স্নেহরাজ্যে নবাগত শিশু-অতিথির মা বুলিতে মা যে অধিকতর আকৃষ্ট হন। আমার বোধ হয়, এই দেশ-মাতার মাতৃত্বের মধ্যেও যেন সেই ভাবের লীলা পূর্ণভাবে বিদ্যমান ! আমরা কেমন করে মুসলমানকে তাড়াবো? শুধু অনর্থক দ্বন্দ্ব করে, হীনতা ও অশান্তির মাত্রা বাড়িয়ে লাভ কি? বরং, যতই তাকে বুকে নিতে চেষ্টা কর্ব্বো, ততই সে নিকটে আস্‌বে। তখন হয়ত এমন দিন আস্‌তে পারে, যখন দেখ্‌বো, হিন্দু-মুসলমান মিলে একটা নূতন

জাতি উদ্ভূত হয়েছে, তাতে হিন্দুর যা বিশেষত্ব, তা নষ্ট হয় নি, আর মুসলমানের যা বিশেষত্ব, তাও বজায় রয়েছে। সে এক দুর্জ্জয় জাতি!

এই অবধি বলিয়া কুমার চুপ করিলেন। সভাস্থ সকলে সাধু-সাধু বলিয়া উঠিল। রাজা গণেশনারায়ণ পুত্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা অবনীনাথও জামাতার বাক্যে বিমুগ্ধ হইলেন, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

আজিম সাহের দূত সংবাদ লইয়া প্রস্থান করিল।

৬
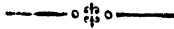
তানোরের সমর-প্রান্তর। শ্যামায়মান সন্ধ্যার স্তিমিত নক্ষত্রালোকে আজিম সাহের শিবির-শ্রেণী আসন্ন-সমর-প্রত্যাশায়. যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবির-শীর্ষে অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকাগুলি, ক্বচিৎ মৃদু-বায়ু-স্পর্শে ঈষৎ আন্দোলিত:হইতেছিল। প্রখর রৌদ্রে দীর্ঘপথ অতিবাহন করিয়া, ক্লান্ত সেনাদল কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য, কেহবা উপবিষ্ট, কেহবা অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় সেই তৃণ-বিরল প্রান্তরে অবস্থিতি করিতেছিল। গোধূলির স্নিগ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে একটা তন্দ্রালস অবসাদের ছায়া সমগ্র বাহিনীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কেবল কতিপয় প্রহরী অনিবার্য্য কার্য্যানু-রোধে, শিবির-প্রাঙ্গণের ইতস্ততঃ সশস্ত্র অবস্থায় পাদচারণ করিতেছিল।

আজিম সাহের শিবির-সম্মুখে সংকীর্ণ অঙ্গনে দুইখানি আসন বিন্যস্ত। একখানিতে আজিম স্বয়ং, অন্যখানিতে কন্যা আশমানতারা। আজিমের আশমান ছাড়িয়া কোথাও যাইবার উপায় ছিল না। কোথায় বা ছাড়িয়া আসিবেন? সে যে তাঁহার মন্ত্রী,—তাঁহার সান্ত্বনা,—তাঁহার ধৈর্য্য, বল, বুদ্ধি সবই।

আশমান ব্যজনী লইয়া পিতাকে বাতাস দিতেছিল, আর পিতা আকাশতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিলেন। দুর্গম পথশ্রান্তি আজ তাঁহার অনুভূতির বিষয় নহে, চিন্তা আজ তাঁহাকে বিমূঢ় করিবার উপক্রম করিয়াছে।

কন্যা মাতার ন্যায় কোমল কণ্ঠে কহিল;—বাবা, অত ভাব্‌ছ কেন বল দেখি! যুদ্ধ ত চিরকালই জয় পরাজয় ঘোষণা করে আস্‌ছে। তুমি সত্যের সমর্থন কত্তে যুদ্ধে নেমেছ, যদি পরাজয়ই হয়, কেউ ত

তোমাকে দোষ দিতে পার্ব্বে না! না হয়, বাঙ্‌লা ছেড়ে চলে যাবে, তুমি অত ভেবো না। দেখ দেখি, এই ক'দিনে তোমার শরীর আধ-খানা হয়ে গেছে। তোমার মুখখানা দেখ্‌লে এখন আমার কান্না আসে।

বলিতে বলিতে আশমানের চক্ষু অশ্রু-সিক্ত এবং কণ্ঠস্বর বাষ্প জড়িত হইল। আজিম সাহ কন্যার 'পানে চাহিয়া, তাহার হাত দুইখানি বুকে টানিয়া লইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন ;—মা, তোকেও কি বুঝিয়ে বল্‌তে হবে, ভাবি কেন? এ জগতে এমন কতকগুলি ভাবনা আছে যা না ভেবে থাকা যায় না। যতই সেগুলোকে ঝেড়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করা যায়, তারা ততই যেন প্রভুভক্ত কুকুরের মত পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে! তখন মনে হয়, এই ভাবনাই সুখ,—এই ভাবনাই সান্ত্বনা। আমি যে ভাবনার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি! জানি, কূল পাব না,—হাত পা ছেড়ে, অসাড় হয়ে পড়ে থাক্‌তেও পারি নাত! মা, যে সাঁতার জানে, সে ত ডুবে যেতে চায় না, চাইলেও পারে না। বাঙ্‌লা ছেড়ে চলে যাবি বলছিস্, কিন্তু অভিমানিনি, বলতে পারিস্, —বাঙ্‌লার উপর রাগ করে কোথা যাবি? গৌড়ের বাদসাজাদা আমি, আর তুই আমার আদরিণী দুহিতা। আমরা যদি পরের দেশে গিয়ে পরের দ্বারস্থ হই,—তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর আমাদের কি আছে? বাঙ্‌লা ছেড়ে যাওয়া হবে না,—হয় গৌড়-সিংহাসন অধিকার কর্ব্বো,—না হয়, এইখানেই আমার শেষ-সমাধি হবে।

কন্যা পিতার নিকট হইতে এইরূপ উত্তরের প্রত্যাশা করিয়াই তাঁহার দুশ্চিন্তার গুরুভার লাঘব করিবার মানসে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। সে বলিল ;—

সে ঠিক, বাঙ্‌লার এক পা বাহিরে আমরা ত যেতে পারি না। দোষ বাঙ্‌লার নয়, দোষ বাঙালীর? অভিমান বাঙলার 'পরে নয়,

অভিমান বাঙালীর উপর। এত শ্যামলতা, এত সজীবতার প্রতিমূর্ত্তি যাদের ধরিত্রী, তারা এত নির্জ্জীব কেন! যে ভূমির তরু-লতা এত শীঘ্র মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, সে ভূমির মানুষ এত অসাড়, এত দীর্ঘসূত্র কেন! অথচ তাদের মধ্যে বীর্য্য আছে, বুদ্ধি আছে, নিপুণতা আছে, মহত্ত্ব আছে। কেমন যেন আত্ম-বিস্মৃতের ন্যায় জেগে জেগে ঘুমুচ্ছে! আজ সাত-সাত দিন হল, আমরা রাজার কাছে সহায়তা চেয়ে পাঠিয়েছি, দূতের অবধি সংবাদ নেই! এ ভারি অন্যায়,—বিশেষতঃ, রাজা গণেশের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে। আজ আমরা দুদিন ধরে তাঁর সসৈন্য উপস্থিতির প্রতীক্ষা কচ্ছি!

আজিম সাহ বিষাদব্যঞ্জক হাসির সহিত বলিলেন ;—মনে পড়ে, সেদিনের কথা—আমি মুসলমানের পক্ষ সমর্থন করেছিলাম বলে তুই তোর অভিমানের ভয় দেখিয়েছিলি? এখন দেখ্‌দেখি ভেবে, মুসলমানকে হিন্দুর উপর আসন দিতে ইচ্ছা হয় কিনা! মুসলমানের অন্য ত্রুটী যতই থাকুক না কেন, তারা জ্বল্‌তে জানে,—হিন্দুর মত ধোঁয়ায় না। তাদের তেজ প্রোজ্জ্বল প্রথমাগ্নির ন্যায়,—আর এরা যেন নির্ব্বাণপ্রায় শেষ বহ্নি! এ দুয়ের সমন্বয় কি করে হবে? আশমান, আমাদের বুঝি মস্ত ভুল হয়ে গেল!

কন্যা পিতাকে ঠিক সমর্থন করিতে পারিল না। বলিল ;—তা ঠিক জোর করে বলতে পারি না বাবা! হিন্দুর ত্রুটী আছে, সে ত স্বীকারই কচ্ছি। কিন্তু তার মধ্যে একটা কথা,—যে দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, সে খপ্‌ করে নিবে যায়। কিন্তু যে ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে জ্বলে ওঠে, সে চট্ করে নিবে যেতে চায় না। এখন আমরা যদি সেই দপ্‌-করে-জ্বলে-ওঠাটার সঙ্গে এই খপ্‌-করে-নিবে-যাওয়াটাকে মিশিয়ে

নিতে পারি, তা হলে সে আগুন কেমন হয় বল দেখি? আর সেটা কি একেবারেই অসম্ভব যে—

বলিতে বলিতে রাজা গণেশের নিকট প্রেরিত দূত আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল ও কুর্ণিশ করিয়া আজিম সাহের হস্তে রাজার পত্র দিল।

পিতা-পুত্রী উভয়ে উৎসুকভাবে পত্র পাঠ করিলেন,—উভয়ের মুখে আনন্দ ও উৎসাহের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। মহারাজ আজিম সাহের পক্ষ গ্রহণ করিয়া সসৈন্য রওনা হইয়াছেন।

অনন্তর আজিম দূতকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত নিতান্ত বিমর্ষভাবে উত্তর দিল,—জাঁহাপনা, আমি ঠিক সময়ে রওনা হয়েছিলাম,—কিন্তু পথে—

আজিম সাহ উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পথে কি?—বল—শীঘ্র বল?

দূত বলিল;—সাহজাদা, আপনি শত্রু-বেষ্টিত। এরই মধ্যে শত্রু-সৈন্য প্রান্তরের অপর প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছে। সাতগড়া থেকে ফিরবার পথেই, এক দল বিপক্ষ সৈন্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। অতি গুপ্তভাবে তাদের কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলাম, এই তানোরের মাঠে আজ রাত্রিতেই তারা আমাদের আক্রমণ কর্ব্বে। আরও শুন্‌লাম্‌, শুধু তারা নয়, অন্য দুই দিক দিয়ে, আরও দুই দল, নসেরিৎ ও তাঁর সেনানায়ক কাসেম খাঁর নেতৃত্বে রওনা হয়ে এই দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই ভয়াবহ সংবাদ শুনে, আমাকে বাধ্য হয়ে, সরল পথ ত্যাগ করে, ঘুরতে ঘুরতে আসতে হয়েছে। সাহাজাদা, বোধ হয় চেষ্টা কল্লে এখনও এ স্থান ত্যাগ করা সম্ভবপর হত, নচেৎ সে বিরাট বাহিনীর সম্মুখে আপনার মুষ্টিমেয় সৈন্য তিষ্টিতে পার্ব্বে না।

চিন্তাকুল আজিম সাহ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—রাজা কতদূর ?

দূত বলিল ;—তিনি বলে দিয়েছেন, সাহজাদাকে যথাস্থানে থেকে আত্মরক্ষা কত্তে, তিনি শীঘ্রই গৌড় আক্রমণ কর্ব্বেন। দুই দিক্ দিয়ে আবদ্ধ হলে নসেরিতের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সাহ-জাদা, আমাদের প্রথম ছাউনি ত্যাগ ভাল হয়নি। গৌড় ঘুরে এখানে আস্‌তে রাজার অনেক সময় লাগ্‌বে।

সহসা অন্য দূত আসিয়া সংবাদ দিল ;—জাহাঁপনা, অদূরে ভীষণ কোলাহল শোনা যাচ্ছে, শত্রুসৈন্য নিকটবর্ত্তী। আমাদের সৈন্যগণ অবসন্ন, বিশেষতঃ, মুসলমান সৈন্য আত্মসমর্পণ কর্ব্বার ভাব প্রকাশ কচ্ছে। কেবল হিন্দু-সৈন্য যুদ্ধ কর্ব্বে বলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেনাপতি গুণরাম রায় ও মীর আলিখাঁ বিশেষ উদ্বিগ্নভাবে আপনার প্রতীক্ষা কচ্ছেন।

আজিম সাহ ইতঃপূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, তিনি দূতকে বলিলেন ;—তাঁদের বলো, সজ্জিত হয়ে এখনি যাচ্ছি, যুদ্ধ অনিবার্য্য।

দূতদ্বয় প্রস্থান করিল। আজিম সাহ কন্যার স্কন্ধে বাহুদুটী ন্যস্ত করিয়া বলিলেন ;—এইবার কি কর্ব্বি মা ?

আশমান পিতার বক্ষে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল ;—বাবা, খোদার উপর বিশ্বাস হারিয়ো না। সব তিনিই ব্যবস্থা কর্ব্বেন। তিনি বীর্য্য দিয়েছেন, কর্ত্তব্যজ্ঞান দিয়েছেন,, সেইমত কায করে যাও বাবা,—তারপর তাঁর যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক্। এস, আজ আমি নিজে তোমাকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে দিচ্ছি। তুমি গিয়ে সৈন্য মধ্যে দাঁড়ালে, দেখ্‌বে তাদের অসাড়তা ঘুচে গেছে, তোমাকে দেখ্‌লে,—

তোমার উৎসাহ বাণী শুন্‌লে, কোনও মুসলমান সেনা চুপ্‌ করে বসে থাক্‌তে পার্ব্বে না, তোমার হয়ে তারা নিশ্চয়ই লড়্‌বে। বাবা,—তুমি যে বাদসাজাদা!

কন্যা পিতার হাত ধরিয়া শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিল।

৭

ঊষার সীমন্তে সিন্দুর-রাগ সূচিত হইতে হইতেই সমস্ত সপ্তদুর্গা ব্যাপিয়া যুদ্ধোদ্যমের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নহবতের প্রভাতী বাদ্য আজ যেন কি একটা সজাগ নিক্কণের চঞ্চল স্পর্শে পুরবাসী প্রত্যেকের চিত্তে উৎসাহের সজীব-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছিল। সে এক উৎসব,—সে এক আনন্দ, যাহা উপভোগ করিবার সামর্থ্য তখনও আমাদের ছিল, এখন আর নাই!

রাণী ত্রিপুরাদেবী পুত্রবধূসহ আজ প্রত্যূষেই মা ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে উপনীতা হইয়াছেন, উভয়েই স্নান-পূতা, পট্টবাসা। আজ পূজার বিশিষ্ট আয়োজন। পুরোহিত হইতে মন্দিরস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির মুখে অতি সতর্কতার চিহ্ন প্রকটিত,—যেন অদ্যকার অর্চ্চনায় কোনও ত্রুটী না হয়। মহারাজ যুদ্ধে চলিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, যুবরাজ যতুনারায়ণ আজ এই প্রথম সেনপতি-পদে বৃত হইয়া সমরক্ষেত্রে চলিয়াছেন। ইতঃ-পূর্ব্বে কুমারের মল্লযুদ্ধে পারদর্শিতা তাঁহাকে 'যতুমল্ল' নামে কীর্ত্তিত করিয়া-ছিল,—কিন্তু তাঁহার রণ-পাণ্ডিত্য কৌতুক-যুদ্ধচ্ছলে বীর-সমাজে প্রতি-পন্ন হইলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার প্রকৃত পরিচয় দিবার অবসর তাঁহার বিশেষ ভাবে ঘটিয়া উঠে নাই,—কেননা, তৎকালে যুদ্ধ-হাঙ্গামা খুব কম ছিল। এইবার সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যুবরাজ পরম উৎসাহে যুদ্ধে চলিয়াছেন। তাই আজ এই পূজা একটু বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক, এ পূজার কাম্য,—বিজয়, অক্ষত কল্যাণ, পূর্ণ সার্থকতা। সেই জন্য রাজ্ঞী ও রাজবধূ উভয়ে অতি সন্তর্পণে, প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন।

আরতি অন্তে সকলেই প্রণত হইলেন। সকলেই নিজ নিজ কামনা

নিবেদন করিয়া, মঙ্গলময়ীর চরণামৃত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দেবী-প্রণামের পর হইতেই, রাণী ত্রিপুরা ও বধূ কিশোরীর মুখ-দর্পণে যেন কি এক ব্যর্থতার বিষাদমাখা ছায়া প্রকাশ পাইতেছিল। প্রণামান্তে উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া যেন কেমনতর উৎকণ্ঠাপূর্ণ অতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কেমন যেন বুক দুরু-দুরু কাঁপিল, দক্ষিণ-অঙ্গ স্পন্দিত হইল। উভয়েই কখন্ ভাবিলেন,—উহা কিছু নয়,—আবার ভাবিলেন,—তাইত! রাণী কখন্ বুঝিলেন,—স্বামী-পুত্র দুজনই সমর যাত্রী,—তাই এ চাঞ্চল্য; কিশোরী ভাবিল,—সেই রাত্রির কথা,—তাই এ উদ্বেগ। আবার ভাবিলেন,—তাহাতেই বা কেন এমন হইবে? কেহ কোনও হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। উভয়ে নীরবে বিমর্ষ চিত্তে প্রত্যাগমন করিলেন।

*　　*　　*　　*

অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। যোদ্ধবেশে কুমার যতুনারায়ণ মাতৃচরণে প্রণত হইলেন। মাতা আশীর্ব্বাদ করিলেন;—এস বাবা, রাজ-রাজেশ্বর হও,—এই মা ব্রহ্মময়ীর চরণামৃত খাও, দেবীর নির্ম্মাল্য সঙ্গে রাখ,—বিজয়ী হবে,—রাজ-রাজেশ্বর হবে।

কুমার মাতৃদত্ত চরণামৃত গ্রহণ করিয়া পান করিলেন এবং কর-পল্লব মস্তকে মুছিয়া, পূজার অর্ঘ্য লইয়া উষ্ণীষে রক্ষা করিতে করিতে ডাকিলেন;—মা!

মাতা পুত্রের পানে চাহিয়া উত্তর দিলেন;—কেন?

কুমার কিছুই বলিলেন না,—মস্তক অবনত করিয়া মৃত্তিকার পানে চাহিয়া রহিলেন। পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া, মাতা স্নেহবিমিশ্র হাসির সহিত বলিলেন;—ওঃ বুঝেছি,—আমি মা যখন আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তখন আর এ সব কেন,—এই ত তোর কথা? পাগল, এটা আর বুঝ্‌তে পাল্লি না,—ওরে আমি যে শুধু তোর মা, আর ব্রহ্মময়ী যে জগতের মা! সেই জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ তোকে দিলাম;—শক্তির শক্তি নিয়ে যুদ্ধে চলেছিস্‌,—জয়ী হয়ে ফিরে আস্‌বি,—রাজ-রাজেশ্বর হবি।

যদু হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—মা, ঐ শেষ কথা-টার বিষয় আমি বল্‌ছি। ও কেমন আশীর্ব্বাদ হল না?

রাণী সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসিলেন,—কেন?

—রাজ-রাজেশ্বর!

তাই ত! মা আমি, ছেলের জন্য এর চেয়ে আর কি কামনা কর্ব্বো!

কুমার সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন;—তাই কি উচিত?

রাণী উৎসুক কণ্ঠে বলিলেন;—একটু খুলে বল্‌,—আমি তোর কথার ভাব বুঝতে পাচ্ছি না!

যদু বলিলেন;—মা, আমরা আজিমসাহকে সাহায্য কত্তে চলেছি;—সম্রাট্ হওয়া আমার বা পিতার কারো আকাঙ্ক্ষা নয় ত! তা হলে যে রক্ষক, সেই ভক্ষক হবে,—এ কেমন কথা মা! আজিমসাহ গৌড়ের ন্যায্য সম্রাট্, আজ শত্রুর চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত, বিতাড়িত,—বড় বিপন্ন। আজ আমরা সেই বিপন্নকে উদ্ধারের জন্য চলেছি,—দিগ্বিজয়ে নয়,—সাম্রাজ্য লিপ্সা আমাদের নেই। আমরা চাই,—মানীর মান রক্ষা কত্তে,—গৌড়ের প্রকৃত অধিকারীকে তাঁর প্রাপ্য শত্রু-কুক্ষি

থেকে কেড়ে নিয়ে দিতে। মা! সম্রাট্ যে আমাদের উপর নির্ভর করে বসে আছেন,—আমরা সেই নির্ভরতার মূলে কুঠারাঘাত কত্তে যাচ্ছি! ও আশীর্ব্বাদ করো না মা,—বরং বলো,—যেন বিজয়ী হয়ে, সফলকাম হয়ে ফিরে আসি।

কিন্তু পুত্রের কথা মাতার মনঃপূত হইল না। তিনি বলিতে লাগিলেন;—দেখ্ যদু, আজ তোরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধে চলেছিস, সে উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ, তা স্বীকার করি। কিন্তু এর মধ্যে একটা মস্ত ভুল হয়ে যাচ্ছে, সেটা তোরা দেখেও দেখছিস্ না! গৌড়ের ন্যায্য সম্রাট্ কে? গৌড় বাঙ্লার রাজধানী,—বাঙ্লা বাঙালীর। বাঙ্লার উপর বাঙালী হিন্দুর যা দাবী,—মুসলমানের তা নয়। কত শতাব্দী চলে গেছে,—সুন্দরবন কেটে, সাগর-উপকূলকে বাসোপযোগী করে তুলেছিল, সে কে? এমন শ্যামল সম্পদে, শোভন সমাজ-শৃঙ্খলায়, অগাধ পাণ্ডিত্যে এ ভূমিকে গরিমান্বিত করে তুলেছিল, সে কে? সোণার বাঙ্লাকে মুসলমানের লোভনীয় করে তুলেছিল, সে কে? বাঙালী হিন্দুই ত! হিন্দুই ত বঙ্গভূমিকে প্রথম মা বলে ডেকেছিল, বাল্যে ঐ বুকে নেচে বেড়িয়েছিল, কৈশোরে—যৌবনে মনের মত করে সাজিয়েছিল, সেই ত তাঁকে রাজলক্ষ্মী-জ্ঞানে বন্দনা করেছিল;—তাই ত আজ হিন্দুরই সেই সাধের বাঙ্লায়, মুসলমান—সে দিনের মুসলমান, উড়ে এসে জুড়ে বস্‌বার উদ্যোগ করেছে! তবে তোরা সেই সেদিনের মুসলমানকে গৌড়-সাম্রাজ্যের ন্যায্য অধিকারী, তোদের কোন্ রাজনীতি মতে বল্‌তে চাস্,—বল্‌ত? আমি বুঝি,—সাম্রাজ্য যে প্রতিষ্ঠা করে, তারই ন্যায্য দাবী তার উপর যতটা বেশী, যে ছলে-বলে-কৌশলে সাম্রাজ্য হস্তগত করে, তার দাবী ততটা হতেই পারে না।

মাতার হিন্দুর প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ উক্তিতে কুমার স্তম্ভিত হইলেন। তিনি তাঁহার মুখ হইতে কখনও এরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে শুনেন নাই। যে মাতা অনুদিন ব্রত-উপবাস, পূজা-পার্ব্বণ লইয়াই ব্যস্ত, অতিথি-ব্রাহ্মণ-সেবা ও আতুরের প্রতি করুণা যাঁহার নিত্য-কর্ম্ম, তাঁহার মুখে আজ একি কথা! কই, একদিনের তরে ত তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ব্যবধান থাকিতে পারে, এ ভাবের কথা উল্লেখ করেন নাই! বরং, মুসলমান প্রজাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ-কারুণ্য অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। অনেক স্থলে তাঁহার মন্তব্য হিন্দুকে উপেক্ষা করিয়া মুসলমানকেই সমর্থন করিয়াছে। তাঁহার সে মন্তব্য তাঁহার পিতারও ঠেলিবার ক্ষমতা ছিল না—এত সুযুক্তিপূর্ণ, অকাট্য। কিন্তু আজিকার মন্তব্যও নিতান্ত অবহেলার নয়, অবহেলা করিবার—সে মন্তব্যে প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্যও তাঁহার নাই। তিনি মাতার কথার উপর বেশী কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না, শুধু এইমাত্র বলিলেন;—

মা, তবে কি মুসলমান হিন্দুর শত্রু?

মাতা ঈষৎ উত্তেজিতভাবে উত্তর দিলেন;—এক হিসাবে তারা হিন্দুর শত্রু নয়ত কি? দেখ্ দেখি, তারা হিন্দুর কি দুর্দ্দশাই না করেছে! কথায় কথায় মন্দির-চূর্ণ, কথায় কথায় ধর্ম্মনাশ;—তারা যেন হিন্দুধর্ম্মটাকে ভারত থেকে চেঁচে-মুছে সাগরের জলে ডুবিয়ে দিতে চায়! যারা রাজ্য নিয়েছে, ঐশ্বর্য্য নিয়েছে,—শুধু ধর্ম্মটা মাত্র হিন্দু জাতির ভগ্নাবশেষের মত পড়ে আছে, সেটাকেও অবধি ঘুচিয়ে দিতে উন্মুখ হয়ে রয়েছে,—তারা হিন্দুর শত্রু নয়?

কুমার বলিলেন;—স্বীকার করি, কিন্তু ঐ সব অনর্থপাতে দোষী কি ষোল আনাই মুসলমান, হিন্দুর কি কোনও ত্রুটী নেই মা?

মাতা উত্তর দিলেন ;—আছে,—শত ত্রুটী আছে হিন্দুর। তবু আমি মুসলমানকে সমর্থন কর্ব্বো না। আমি অন্যমনস্ক রয়েছি বলে সে এসে আমার গলায় ছুরি দেবে, আর আমি চুপ্ করে বসে থাক্‌বো,—এটা মানুষের কথা নয়। যদু, মুসলমান আমাদের দেশে এসেছে, তা তারা যা কত্তেই আসুক না, কেন আমরা তাদের আজ্ঞাবহ হতে যাব, বল্ দেখি ? তারা এ দেশের কি জানে ? এ জাতির, এ ধর্ম্মের, এ সমাজের কি জানে যে, আমরা তাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে যাবো ? বরং, তোর শ্বশুর যা বলেছেন,—যে, যখন তারা আত্মদ্বন্দ্বে হৃতবল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, আমরা সেই যোগ্য অবসরে আমাদের হৃতকীর্ত্তি পুনরুদ্ধার কর্ব্বো,—এ যুক্তি খুব ঠিক। হিন্দুর দেশ হিন্দুর হোক্, হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা হোক্,—প্রত্যেক হিন্দুর এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত।

কুমার একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—আর মুসলমান ?

তারাও থাকুক।

কি করে থাক্‌বে ? তারাও ত একটা জাতি !

গরিমাব্যঞ্জক কণ্ঠে মাতা উত্তর দিলেন ;—তাই বলে তারা হিন্দুর উপরে বস্‌তে পারে না। হিন্দুর সঙ্গে মিলে মিশে বাস কত্তে পারে, তারা কোনও দিন হিন্দুর সহানুভূতি-লাভে বঞ্চিত হবে না। যাও, আর বেশী সময় নষ্ট করো না। মা ব্রহ্মময়ীর কৃপায় বঙ্গনারীর বীরপুত্র তুমি বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করে ফিরে এসো।

এই বলিয়া সস্নেহে পুত্রের চিবুকে হস্ত-স্পর্শ করিয়া, সেই হস্ত স্বীয় মুখে ঠেকাইলেন।

যদু পুনরায় মাতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে মাতা বলিলেন ;— বউমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি,—একটু দাঁড়া—

মাতা প্রস্থান করিলেন। কুমার অপলক নেত্রে সেই তেজস্বিনী দেবী-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিলেন।

* * *

ধীরে ধীরে আসিয়া নবকিশোরী স্বামী-দেবতার পদে প্রণতা হইল। যদুনারায়ণ বড়ই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। পদস্পর্শে চমকিত হইয়া দেখিলেন, সাধ্বী চরণ-লগ্না। তিনি কিশোরীকে পরমাগ্রহে তুলিয়া বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া একটী চুম্বন করিলেন। কিশোরীর চক্ষে জল! কুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন,—সহিষ্ণুতার স্বর্ণ-শৈলে আজ অকস্মাৎ মুকুতা-নির্ঝর ঝরিতেছে! তিনি চঞ্চলভাবে কহিলেন;—একি! কিশোরি, তুমি কাঁদ্‌ছ?

কিশোরীর প্রথমে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। সে তাহার স্বামীর বিশাল বক্ষে মুখখানি রাখিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। স্বামী অতি যত্নে তাহার অগ্রসর-ললাট-স্পর্শী চূর্ণ-কুন্তলগুলি অঙ্গুলী-সাহায্যে যথা-স্থানে বিন্যস্ত করিতে করিতে আবার কহিলেন;—ছিঃ! কিশোরী আমার, এই কি কাঁদ্‌বার সময়! আজ তোমার বিচলিত হ'লে চলে কি? আজ আমি এক গৌরবকর কার্য্যে চলেছি,—তুমি হাসি-মুখে বিদায় দেবে, না তোমার অশ্রু-সজল চক্ষু দেখে বিদায় নিতে হবে! কর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে একি কচ্ছ পাগলি আমার,—

কিশোরী অতি কষ্টে হৃদয়ের আবেগ সংযত করিল বটে, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। যদু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—

বলো,—এত চাঞ্চল্য কেন? তোমাকে আজ এ বেশে দেখ্‌তে আমিত একটুও প্রত্যাশা করিনি কিশোরি!

কিশোরী ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল;—এ যুদ্ধে তোমার কি না গেলে চল্‌ত না?

যদুনারায়ণ স্তম্ভিত। কহিলেন;—কিশোরি, এ কি বল্‌ছ!

কিশোরী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পদধারণ করিয়া ব্যাকুল-ভাবে বলিল;—প্রভু,—স্বামী, শুধু আজ আমায় ক্ষমা করো।

সে কি কাতর চাহনি! যদুনারায়ণ কিশোরীকে কোনও দিন এত বিহ্বল দেখেন নাই। যে তেজস্বিনী বালা মাতা ত্রিপুরাদেবীর মন্ত্রশিষ্যা, তাহাতে সাধারণ নারীসুলভ একি চাপল্য! যে হৃদয় এতদিন কুসুমের ন্যায় কোমল হইলেও হীরকের ন্যায় দৃঢ়তার দৃষ্টান্তস্থল ছিল, সে হৃদয় আজ সহসা এমন হইল কেন!

কুমার কটীবদ্ধ উত্তরীয় দিয়া প্রিয়তমার অশ্রুসিক্ত মুখখানি মুছা-ইতে মুছাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

কই, কোনো দিন ত কোনো আব্‌দার করোনি?

আজ কচ্ছি,—আর কখনো কর্ব্বো না।

কেন,—কি হয়েছে বলো দেখি?

সে তুমি শুনো না।

যদুনারায়ণ হাসিলেন। বলিলেন;—কিশোরি, এই মাত্র বল্‌লে যে আর কখনো আব্‌দার কর্ব্বে না। এও যে আর একটা আব্‌দার!

কিশোরী অপ্রতিভ হইল। করুণ নেত্রে যদুনারায়ণের পানে চাহিয়া বলিল;—সে তোমার শুন্‌তে নেই যে!

কেন?—শুন্‌লে কি হবে?

তোমার বুক দমে যাবে।

যদু আবার হাসিলেন; হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—কিশোরি, তোমার স্বামীকে তুমি এত কাপুরুষ মনে করো!

কিশোরী আরও অপ্রতিভ হইলেও গর্ব্বিত স্বরে বলিল;—কিশোরী যে তেমন স্বামীর স্ত্রী নয়, এ বিশ্বাস তার খুবই আছে, তবু সে যে বড় ভয়ানক কথা!

যদু জেদ ধরিয়া বলিলেন—আমি সেই ভয়ানক কথাই শুন্‌তে চাই, নিঃসঙ্কোচে বলো,—কোনো ভয় নেই।

অগত্যা কিশোরী স্বামীকে আরও আঁকড়িয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল;—

মা ব্রহ্মময়ীর পূজা শেষ হলে, মাকে গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম কল্লাম। চোক্ বুজিয়ে দেখ্‌লাম,—যেন মা তাঁর বরাভয়ের হাত দুখানি বাড়িয়ে দিলেন। আমি মাথা পেতে রইলাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনি যেন অভীষ্ট বর দান কল্লেন—

কিশোরী থামিল। যদুনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—

হাঁ তার পর?

কিশোরী বলিল;—তার পর আর তোমার শুনে কায নেই।

যদু জিজ্ঞাসিলেন;—সেইটাই বুঝি ভয়ানক?

হাঁ।

তবে?—সেইটাই ত তুমি বল্‌বে বলে রাজি হয়েছ!

কিশোরী কিছুক্ষণ নীরব রহিল। পরে প্রিয় দেবতাটীর পানে পলক নিবদ্ধ রাখিয়া ভীত কণ্ঠে কহিল;—তারপর—তারপর যেন তাঁর অভয় হস্তখানি কাঁপ্‌তে লাগল! তিনি ত অভয় দিলেন না, কম্পিত

হাতখানি গুটিয়ে নিয়ে যেন আমার পানে কি রকম করে চাইলেন,—আর তাঁর কপাল থেকে আগুন বেরিয়ে আমার মাথায়—

কিশোরী কাঁপিতে লাগিল। যদুনারায়ণ তাহাকে বুকে চাপিয়া গণ্ডে গুটী কত চুম্বন দান করিয়া কহিলেন;—এই ভয়ানক কথা! দেবীর হাত কাঁপেও নি, কিছুই নয়। ভেবে দেখো না কেন,—যখন তিনি বর-ই দিয়েছেন,—তখন আর অভয়ের বাকি কি? পূর্ণগর্ভা তুমি, শরীর দুর্ব্বল, তাই নিজে কেঁপে, দেবীর হাত কাঁপ্‌তে দেখেছ!

কিশোরী তবু বুঝিল না। বলিল;—কিন্তু মা?

যদুনারায়ণ বলিলেন;—কিশোরি, তোমার স্বামী ও শ্বশুর যাচ্ছেন,—আর তাঁর স্বামী ও পুত্র যুদ্ধে চলেছেন। ভেবে দেখো দেখি, তিনিও কি স্থির থাকৃতে পারেন? তাঁরও হয়ত ভুল হয়ে থাকৃবে। কিন্তু কই,—সেজন্য তিনি ত যুদ্ধে যেতে নিষেধ কল্লেন না; বরং বল্লেন,—যাও, বিজয়ী হয়ে, রাজ-রাজেশ্বর হয়ে ফিরে এসো। কিশোরি, তুমিও ত না রাজমাতা হতে চলেছ!

সহসা মেঘ-নির্ম্মুক্ত রবি-দ্যুতির ন্যায়, নবকিশোরীর মুখমণ্ডলে কি এক অপূর্ব্ব গরিমাভা ফুটিয়া উঠিল! সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল;—প্রভু, মার্জ্জনা করো, সত্যই আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমি আগে বুঝ্‌তে পারিনি,—ভাবী রাজমহিষীর,—ভাবী রাজমাতার সাধারণ নারীর মত শুধু দৈবকে আঁকৃড়ে থাকৃলে চলবে না, নারী-ত্বের সঙ্গে বীরত্বের মিলন করে নিতে হবে। আগে বুঝ্‌তে পারিনি,—কোমলতার কুসুম-স্পর্শ সর্ব্বত্র শুভ নয়, আর কঠোরতার নির্ম্মম আঘাত সময় বড় উপকার করে,—কর্ত্তব্যের পথ পরিষ্কার করে দেয়। তাই আমাকে কোমল-কঠোর হতে হবে। এই আমি ধৈর্য্য ধর্‌লাম,

আর আমি অশ্রু-নিষেকে তোমাদের গৌরবের পথ,—আমাদের ভাবী বংশধরের উচ্চাদর্শের পথ পিচ্ছিল কত্তে চাই না। দাও, তোমার পদধূলির সঙ্গে তোমার অমিতবীর্য্যের কিছু তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—সহধর্ম্মিনীর সীমন্তে ছড়িয়ে দিয়ে যাও,—সে আর কিছুই চায় না।

এই বলিয়া সে আবার স্বামীর পদধূলি লইল। কুমার মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু সহসা কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করিলেন;—কিশোরি, সে রাত্রির কথা মনে আছে?

কিশোরী গম্ভীর ভাবেই বলিল;—খুব মনে আছে,—শুধু তাই নয়, আজ যেন মন বল্‌ছে,—এই বুঝি সে পরীক্ষার আরম্ভ! তাই ত এতটা আগ্রহে তোমার ঠাঁই দৃঢ়তা প্রার্থনা কচ্ছি।

যদুনারায়ণ সচুম্বন আশীর্ব্বাদ করিলেন;—বংশোজ্জ্বলা হও।

কিশোরী ভাব-বিজড়িত কণ্ঠে বলিল;—যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ!

যদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—আর কিছুই চাই না?

কিশোরী সেই ভাবেই বলিল;—হিন্দু-কুলবধূর এর চেয়ে কামনার কি আছে জানি না।

যদু বলিলেন;—কেন?—স্বামী-সোহাগিনী—

অদূরে বিদায়-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। কুমার ব্যস্তভাবে বলিলেন;—ঐ মা এদিকে আস্‌ছেন,——যাই—

যদুনারায়ণ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। কিশোরী করপল্লব-পৃষ্ঠে চিবুক ন্যস্ত করিয়া, অপলক নেত্রে স্বামীর প্রতি চঞ্চল চরণ-ক্ষেপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সে গাম্ভীর্য্যের প্রতিমা, প্রেমের প্রতিকৃতি, সতীত্বের প্রতিমূর্ত্তি! সে কালের হিন্দুরমণীর—আদর্শ বঙ্গ-ললনার একটী নিখুঁত ছবি এই নবকিশোরী!

৮

দূতের কথাই ঠিক। দেখিতে দেখিতে তিন দিক দিয়া তিনটী বিরাট বাহিনী আজিমসাহের ছাউনী বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে। সে বেষ্টনী ভেদ করিবার সামর্থ্য আজিমসাহের ছিল না। কিন্তু আজিমসাহ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করিতেন না, বীরোচিত ধৈর্য্য ও রণ-নিপুণতা তাঁহার যথেষ্টই ছিল। তিনি তাঁহার সেই অল্প সংখ্যক সৈন্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, একদল নিজের ও অপর দুই দল সেনাপতি গুণরাম রায় ও মীর আলি খাঁর নেতৃত্বাধীনে নিয়োগ করিলেন।

আশমানতারার কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গিয়াছিল। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণে ভীত ও অন্য-পক্ষ-গ্রহণোন্মুখ সৈন্যগণ সসজ্জ সাহজাদার আবির্ভাবে ও তাঁহার অগ্নি-গর্ভ উৎসাহ-বাণীতে আপনাদের অকৃতজ্ঞতার জন্য লজ্জিত হইয়া, পূর্ণ নবোদ্যমে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল এবং পতন অনিবার্য্য হইলেও বাঞ্ছিত জানিয়া, যেন কি এক অপূর্ব্ব রণোন্মাদে শত্রু-গতি প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। আভিজাত্যের এই যে ক্ষমতা, যাহা বিকার-গ্রস্ত সমস্ত জনসাধারণকে মতদ্বৈধের বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্তি দিয়া, একপ্রাণতার অব্যর্থ আকর্ষণে আপনার পানে সমষ্টীভূত করে, ইহা বর্ত্তমান যুগে অনেকের নিকট অপ্রার্থিত হইলেও, বোধ হয়, ইহাকে দাবিয়া রাখা মানব-সাধ্য নহে;—ইহা চিরন্তন, সুপ্রতিষ্ঠ। ইহার মধ্যে কি এক অনন্যসাধারণ তেজঃ নিহিত আছে, যাহার সমক্ষে পরোক্ষের সমস্ত অবাধ্য শক্তি স্বতঃই মুষ্ড়িয়া পড়ে, ঠিক যেন অরুণোদয়ে নৈশ-তমসার মত। আশমান পিতাকে অযৌক্তিক কিছুই বলে নাই,—বলিয়াছিল,—তুমি যে বাদসাজাদা!

কিন্তু একত্রবদ্ধ তৃণ-গুচ্ছ প্রমত্ত ব্যাত্যাকে কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? সামান্য আলিবদ্ধ সমুদ্র-তরঙ্গকে কতক্ষণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয়? বিশেষতঃ, কাসেম খাঁর সৈন্য একপ্রকার দুর্জ্জেয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন সেনাপতি কাসেম খাঁর ন্যায় রণপণ্ডিত গৌড়ে খুব কম ছিল। তাঁহার কৌশলপূর্ণ সৈন্য-সঞ্চালনে প্রতিদ্বন্দ্বী অচিরকাল মধ্যে ভূতলশায়ী হইত, এমন কি, পলায়নের অবসর অবধি পাইত না। এ হেন প্রবল শক্তির সম্মুখে আজিমসাহের স্বল্প-শিক্ষিত সেনাদল কতক্ষণ দাঁড়াইবে?

দেখিতে দেখিতে মরণ-পণ আজিম-সৈন্য নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। আজিমের বিশ্বস্ত সেনাপতিদ্বয় বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ এবং বহুতর শত্রু-সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া, মৃত শত্রু-সৈন্য-স্তূপের উপর বাঞ্ছিত শয়নে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। ভীষণ নৈশ-সমর। দিকে দিকে প্রজ্জ্বালিত অগ্নিকুণ্ডের,—প্রোথিত মশালের পীতারক্ত শিখায় তানোরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর মহামারীর শ্মশান-কান্তারে পরিণত হইয়াছে। কোথায় মুমূর্ষুর কাতর ক্রন্দন, কোথায় নীরব নিষ্পন্দতা, কোথায় বিভীষিকার উৎকট হুঙ্কার, অসির ও বর্শার ঝন্‌ঝনা!

হায়! এই তাণ্ডবী লীলার মধ্যেই নাকি মানবের প্রতিষ্ঠা নিহিত রহিয়াছে! জীবন লইয়া এই পাশব কন্দুকক্রীড়া না হইলে নাকি মানুষ আত্ম-প্রাধান্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন্ করিতে পারে না! সব নীতি, সভ্যতা, আধ্যাত্মিকতা যেন এই সংঘর্ষের পার্শ্বে নিতান্ত ম্রিয়মান ভাবে বসিয়া থাকে! তারপর, যখন এই বীভৎস নর্ত্তন কোনও পক্ষের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হইয়া যায়, তখন তাহারা আবার মাথা তুলিয়া স্ব স্ব যুক্তি বা উপদেশ বিজ্ঞাপিত করে,—

ততক্ষণ—যতক্ষণ না আবার সেইরূপ ভৌতিক কাণ্ড আরম্ভ হয়। মানবের এ মহাব্যাধি,—ইহা নিরাময় হইবার নহে; মৃগী রোগের ন্যায় ইহা মানুষকে চট্ করিয়া বিহ্বল করিয়া ফেলে,—ব্যাধির সাময়িক অপস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ,—আবার মানুষ,—বড় ভাল মানুষ!

অশ্ব-পৃষ্ঠে আজিম সাহ কতিপয় সৈন্য লইয়া ·ক্ষত-বিক্ষত দেহে আনায়-বদ্ধ ক্ষিপ্ত শার্দ্দুলের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। জয়াশা তাঁহার নাই,—তিনি তাঁহার এক অতিমাত্র বৈরীর সন্ধানে আত্মরক্ষা করিয়া ইতস্ততঃ ছুটিতেছেন এবং মৃত্যুকে শুধু এই বলিয়া অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছেন যে, বৈরী-নিপাতের পর মুহূর্ত্তেই যেন সে আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করে, তদ্ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই—

দেখিতে দেখিতে সম্মুখেই নসেরিং সাহ—তাঁহার ঈপ্সিত শিকার! আজিম সাহের বিশাল নয়নদ্বয় অধিকতর বিস্ফারিত হইয়া, তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল; দন্তে দন্ত নিষ্পিষ্ট হইল। তিনি বজ্র-কঠোর কণ্ঠে বলিলেন;—নসেরিং, এস—এবার আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মর্ত্তে পার্ব্বো এবং জগৎকে দেখিয়ে মর্ব্বো,—গৌড়ের মসনদ যখন আজিমের নয়, তখন নসেরিতেরও নয়। আজ তোমাকে অপসারিত কর্ব্বো,—ব্যস্—তারপর সুখে ঘুমিয়ে পড়্বো। এস,—আত্মরক্ষা করো, নসেরিং—

বলিতে বলিতে অব্যর্থ লক্ষ্যে বর্শা ছুটিল, সে বেগ প্রতিরোধ করিবার সাধ্য নসেরিতের ছিল না। এ যে মরণোন্মুখ বীরের শেষ আক্রমণ! নসেরিতের প্রাণ শুকাইল, তিনি আঁখি মুদিত করিয়া কম্পিত হস্তে বর্শা ছুড়িলেন।

ঠিক পর মুহূর্ত্তেই নসেরিতের পশ্চাদ্দেশ হইতে এক অমিত-শক্তি-হস্ত-সঞ্চালিত বর্শার আঘাতে নসেরিতের মৃত্যু-শেল প্রতিহত হইল

এবং সেই কম্পিত-হস্ত-চালিত নসেরিতের অস্ত্র-ফলকই প্রাক্তনের অনির্দ্দেশ্য নিয়মে আজিম সাহের বক্ষঃ ভেদ করিল! আজিম ভূপতিত হইলেন এবং নসেরিৎ অক্ষত দেহে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন! আজিমের অবশিষ্ট সেনা পলায়ন করিতে লাগিল, আর নসেরিৎ সাহের বিজয়-ধ্বনি আকাশ-প্রান্তর মুখর করিয়া তুলিল!

আজিম সাহের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত—সুন্দর মুখমণ্ডলে মৃত্যুর কালিমা ক্রমশঃ নিবিড় হইয়া আসিতেছে। পার্শ্বে উলঙ্গ অসি হস্তে মদমত্ত নসেরিৎ; চোখে বিদ্রূপের ভ্রূকুটি, মুখে বিদ্রূপের অট্টহাসি। তিনি আজিমের পানে চাহিয়া বলিলেন;—এখন বুঝ্‌তে পেরেছ বোধ হয়, গৌড়ের মসনদ নসেরিতেরই,—আজিমের নয়? কোথায় তোমার হিন্দু দোস্ত, এসে এবার তোমায় রক্ষা করুক্! বড় যন্ত্রণা হচ্ছে,—ঘুমুতে পার্চ্ছ না,—আচ্ছা আমি শীঘ্র শীঘ্র সে যন্ত্রণার অবসান করিয়ে দিচ্ছি।

নিকটে এক সৈনিক দাঁড়াইয়া ছিল। নসেরিৎ তাহাকে হুকুম করিলেন;—এই, ওর বুকের উপর দাঁড়িয়ে বেশ আচ্ছা করে ঝাঁকরা দিয়ে বর্শাটাকে তুলে ফেল্‌ত, দেখি কেমন মজা করে মরে—

বলিয়া নসেরিৎ পৈশাচিক হাসি হাসিলেন। সৈনিক পিছাইল। বলিল,—হুজুর, মাপ কর্ব্বেন, ওটা আমার দ্বারা হবে না। সাহজাদাকে অতটা হীন চক্ষে দেখ্‌তে পার্ব্বো না।

নসেরিৎ রোষ-দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন,—কি—আমার হুকুম অগ্রাহ্য, বেইমান,—বেত্‌মিজ্‌!

সৈনিক জবাব দিল;—হুজুর, মাপ কর্ব্বেন, আমি আপনার খেয়ালের চাকর হতে পার্ব্বো না। আপনি আপনার আরাম-কক্ষে গিয়ে বিশ্রাম করুন। খাঁসাহেবের আদেশ,—সাহজাদার দেহ-রক্ষার ভার আমার উপর পড়েছে।

বটে নাকি !—তবে আগে তুই তোর নিজের দেহটাকে সামাল কর্—বলিয়া নসেরিৎ সাহ সৈনিককে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সৈনিক কয়েক পদ পিছাইয়া কি একটা ইঙ্গিত করিতেই দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচজন সৈনিক তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

নসেরিৎ স্তম্ভিত। তাঁহার মাথায় কিন্তু অন্য বুদ্ধি যোগাইল। বটে—ষড়যন্ত্র! শীঘ্রই এর ব্যবস্থা কচ্ছি। আগে আমি নিজেই শত্রুকে শেষ করি,—এই বলিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া আজিম সাহের বক্ষোবিদ্ধ বর্শা স্পর্শ করিলেন। সৈনিকগণ চঞ্চল হইল।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে, বাবা আমার—বাবাগো,—বলিয়া করুণকণ্ঠে প্রান্তর-পবনকে বেদনাতুর করিয়া, আলু-থালু বেশে পিতার স্নেহের বাছনি আশমান পিতার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা হইল। সেই বর্ষণ-সিক্তা-প্রকৃতি-সুষমাময়ী বালিকার মুখচ্ছবি উদ্দাম-প্রবৃত্তি নসেরিৎকেও পর্য্যন্ত কয়েক পদ পিছাইয়া দিল।

ক্ষণকাল পরে নসেরিৎ কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন;—হাঁরে আশমানী, হিঁদুর সঙ্গে মিশে, বাপের কাছে তুইও ত দেখ্‌ছি, মুসলমানের আদব-কায়দা খুব শিখেছিস! যা চলে যা—

আশমান শুধু এইটুকু বলিল,—আর কেন? আমাকে আমার বাবার পায়ে মাথা রেখে একটু কাঁদ্‌বার অবসর দিন।

নসেরিৎ হাসিলেন। বলিলেন;—কাঁদ্‌বার ফুরসুৎ ত দেদার দিয়েছি। তা এ যুদ্ধক্ষেত্রে এসে মরা বাপের পা জড়িয়ে কেঁদে কোনও ফয়দা নেই ত। যা,—হিঁদুর—তোর বাপের দোস্তর দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়াগে! তবে যদি ঠাণ্ডা হয়ে থাকিস্, ফতিমা বেগম তোকে একটু ভালবাসে, তার খাতিরে, তোর একটা হেস্ত-নেস্ত করে দেবো গৌড়-বাদসার

সেটা বহুৎ মেহেরবানি জানিস্,—বলিয়া নসেরিৎ গর্ব্বের হাসি হাসিলেন।

আশমান অতি কাতর নেত্রে নসেরিতের পানে চাহিল। বলিল, অভাগিনীকে আর বিরক্ত কর্ব্বেন না, দয়া করে অন্যত্র যান। আপনার আকাঙ্ক্ষা ত পূর্ণ হয়েছে! দুনিয়াদারী পেয়েছেন,—এ সময় আপনার মুখে এ ভাবের কথা শোভা পায় না। আপনাকে মিনতি করে বল্‌ছি, আমাকে একটু কাঁদ্‌তে দিন, এখন আমি আপনার কোনও কথার উত্তর দিতে পার্ব্বো না।

আশমান ডাকিল ;—বাবা—বাবা!

নসেরিৎ হাসিলেন,—বিদ্রূপ-কণ্ঠে বলিলেন ;—কিরে সাড়া পাচ্ছিস্? হুঁ-হুঁ—কেমন ঘুম পাড়িয়েছি তোর বাবাকে! আশমান চৌচির হয়ে গেলেও সে ঘুম আর ভাঙ্‌বে না—বলিয়া নসেরিৎ দ্বিগুণ অট্টহাস্য করিলেন।

আশমানের চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল, তাহার আরক্ত ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কম্পিত হইল। সে বলিল ;—হৃদয়হীন মুসলমান-কলঙ্ক!

নসেরিৎ চীৎকার করিয়া বলিলেন ;—এখনও তেজ—এত দেমাগ্—এখনও বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ না যে তুই আজ বাঁদীরও অধম! আর তোকে মাপ কর্ব্বো না,—তোকেও তোর বাবার মুলুকে পাঠাচ্ছি,—দাঁড়া, পদাঘাতেই তোকে—

ক্রোধে টলিতে টলিতে নসেরিৎ ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু আশমান নড়িল না,—আসন্ন ঝটিকার সময় পক্ষিণী যেমন তাহার শাবক দুইটাকে বক্ষ-কুলায়ে রক্ষা করিয়া বৃক্ষ-শীর্ষে প্রতীক্ষা করে, সেও ঠিক সেই ভাবে পিতার পদদ্বয় বুকে আঁকড়িয়া নিষ্ঠুর নসেরিতের পানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু নসেরিতের পদ আশমানতারার অঙ্গ স্পর্শ করিতে না করিতে মেঘ-গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল ;—নসেরিৎ সাহ, সাবধান !

নসেরিৎ ফিরিয়া চাহিলেন,—পশ্চাতে সেনাপতি কাসেম খাঁ !

নসেরিৎ কাসেম খাঁর পানে ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া বলিলেন ;—একি ! কাসেম খাঁ, আজ তুমিও আমাকে অসম্মান কচ্ছ !

কাসেম খাঁ গম্ভীরভাবেই বলিলেন ;—আমি আপনাকে সাহায্য করে মস্ত ভুল করেছি। আপনাকে হিন্দু-দ্বেষী বলেই জান্‌তাম, কিন্তু আপনি যে এত নীচ, তা আগে আমি টের পাই নি। যান্, শিবিরে যান্। কাসেম খাঁ আজ এই প্রথম একটা অন্যায়কে তাচ্ছীল্য করলে,—যান্,—এখনও কি ভাব্‌ছেন ?

নসেরিৎ ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন।

কাসেম খাঁ আশমানতারার পানে অভয় দৃষ্টি দান করিয়া বলিলেন ;—সাহজাদি, আমারই জন্য আজ আপনি অপমানিত, লাঞ্ছিত,—সে জন্য নিজে বড়ই লজ্জা অনুভব কচ্ছি। আমার ক্রটী মার্জ্জনা করুন। আপনার পিতার সময় নিকট হয়ে আস্‌ছে, তাঁর শেষ কথা পারেন ত শুনে নিন্। আমরা দূরে অবস্থান কচ্ছি,—আর কেউ আপনাকে বিরক্ত কর্ব্বে না।

কাসেম খাঁ অগ্রসর হইলেন,—সৈন্যগণ তদনুবর্ত্তী হইল। তখন ঊষার নবারুণ রশ্মি সমগ্র ত্তানোরের আকাশ-প্রান্তর রাঙাইয়া তুলিয়াছে। কাসেম খাঁর রণ-ক্লান্ত গরিমা-মণ্ডিত মুখ-মণ্ডলে সেই রক্তিমাভা বিম্বিত হইয়া ধন্য হইল। কাসেম খাঁ বীর, হৃদয়বান্, রূপবানও কম নহেন। যৌবনের পুরুষোচিত সমস্ত সৌষ্ঠব তাঁহার বিশাল বপুখানিতে বিদ্যমান। তিনি কিয়দ্দূরে এক বৃক্ষতলে শ্রান্তি-অপনোদনের জন্য

উপবেশন করিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশমতে সৈন্যগণ স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল। কাসেম খাঁ ভাবিতে লাগিলেন ;—

এই প্রকার অপদার্থকে নিয়ে মুসলমান প্রতিষ্ঠাকে ঠেকিয়ে রাখা বাতুলের কল্পনা নয়ত কি? এখনও প্রকাণ্ড সমস্যা রয়েছে,—রাজা গণেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নসেরিতকে পুনঃ পুনঃ বলেছি,—গৌড় ছেড়ে এক পা না যেতে। এখন ত গৌড় একপ্রকার অরক্ষিত, আমাদের সৈন্যের মুখ্যভাগ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আমিও বেশ বুঝতে পার্চ্ছি,—রাজা গৌড় আক্রমণ কর্ব্বেনই ;—তখন সে সামান্য সৈন্য নিয়ে সেনাপতি মুনীম খাঁ কিছুই করে উঠ্‌তে পার্ব্বেন না। না,—আর বেশী বিলম্ব কল্লে চল্‌বে না,—এখনই গৌড়ে ফিরতে হবে। তারপর যা হয়।.........

কি মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি এই আশমানতারার! যৌবনের কমনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে যেন ওর মধ্যে এমন: আরো সুন্দর কিছু এসে সঞ্চিত হয়েছে, যার জন্য তাকে ভালবাস্‌তে বড়ই আকাঙ্ক্ষা হয়! আজ বড়ই অসহায়া। কিন্তু কাসেম খাঁ বর্ত্তমান থাক্‌তে সে ললাম বিদলিত কর্ব্বার সাধ্য কারো নেই।.........

কিন্তু বড়ই চিন্তা, বুঝি এবার মুসলমানকে হিন্দুর কাছে মাথা নত কত্তে হয়। সব দিক্ দিয়ে তাদের সুবিধার চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ছে। নসেরিৎ আহাম্মক, কেন এতগুলো সৈন্য নিয়ে গৌড় ছেড়ে এলো! রাজা একবার গৌড় অধিকার কত্তে পার্লে তাঁকে বিতাড়িত করা বড়ই কঠিন হবে। কন্তু মুসলমানের প্রতিষ্ঠিত আসনে হিন্দু এসে বস্‌বে, পাঠান গৌরব-রবি হিন্দু-মেঘ এসে ঢেকে ফেল্‌বে, সে ত কাসেম খাঁর প্রাণে সইবে না। মুসলমান-শক্তি-সংঘাতে চূর্ণ হিন্দুর প্রাধান্য মেনে নিতে হবে!—কখনো তা হতে পারে না।.........

কিন্তু অতটা জোর করে বল্‌তেও সাহস হচ্ছে না। রাজা কৌশলী, পুত্র যদুনারায়ণ বীর। তারপর আরও কথা, চরমপন্থীকে ততটা ভয় হয় না, যতটা ভয় হয় মধ্যপন্থীকে। রাজার হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে সমান প্রতিপত্তি। সে সমদৃষ্টি এত উজ্জ্বল, এত অন্তর্ভেদী, অন্তরকে এত ধাঁধিয়ে দেয় যে, আমি যে আমি, আমিও দিশাহারা হয়ে যাই! তার উপর যদুনারায়ণ,—তাকে ভাই বলে, বন্ধু বলে আলিঙ্গন কত্তে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাত হয় না,—খোদার মরজী তা নয়। নয় কি! হয়ত আগামী যুদ্ধেই প্রতিদ্বন্দ্বীর বেশে উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন্‌ হতে হবে। হোক্‌—তাই হোক্‌,—কাসেম তাই চায়। কাসেম! কেমন পার্ব্বে ত? প্রকাণ্ড পরীক্ষা সম্মুখে,—উত্তীর্ণ হতেই হবে।

কাসেম খাঁ গাত্রোত্থান করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

*   *   *   *

আজিম সাহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নসেরিতের দুর্ব্ব্যবহার, সৈনিকের নির্ভীক সহৃদয়তা ও পরিশেষে সেনাপতি কাসেম খাঁর ঔদার্য্য কিছুই তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই। পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা আদরিণী দুহিতার অনর্গল অশ্রুধারা, মর্ম্মোত্থিত দীর্ঘশ্বাস ও পাষাণদ্রাবী বিলাপোক্তি সবই যেন ব্যর্থতার অভিনয় করিতেছিল।

কাসেম খাঁর দূরে অবস্থিতির কিয়ৎকাল পরে বুঝিবা প্রভাতের মন্দানিল-স্পর্শে আসন্নবর্ষী জলদান্তরালে ক্ষণিক অরুণ-দ্যুতির ন্যায় আজিম সাহ আরক্ত চক্ষু উন্মীলন করিলেন। বর্শাবিদ্ধ বক্ষঃ, উত্থান-শক্তি-

রহিত বদনে বেদনার অভিব্যক্তি। আশমান কাঁদিয়া উঠিল ;—বাবা—বাবাগো—

আজিম সাহ চমকিলেন। মৃত্যুচ্ছায়া-লাঞ্ছিত মুখে সহসা যেন কেমন একটা সান্ত্বনার অস্পষ্ট ছবি দেখা দিল। তিনি ক্লিষ্ট অথচ তৃপ্তিব্যঞ্জক স্বরে ডাকিলেন ;—আশমান—মা আমার,—

আশমানতারা আকুল কণ্ঠে উত্তর দিল ;—বাবাগো, এই যে আমি,—বলিয়া পিতার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল।

আজিম সাহ বিষাদ-মাখা হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ;—এত কাতর কেন মা, তোকে ত কিছুই বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না। সব ত আগেই জেনেছিলি, প্রস্তুত হয়েও কেন এমন কচ্ছিস্‌ মা! আমার কায শেষ, এখন তোর কায তুই কর্‌। মা! আমি এতক্ষণ ধরে এক স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। দেখ্‌লাম, যেন স্বর্গ থেকে এক ফুলের দোলা এইখানে নেমে এসেছে, আমাকে নিয়ে যেতে। আমি যেন যেতে চাইছি না। এমন সময় আকাশবাণী হল,—যার জন্য তুই ভাব্‌ছিস্‌,—সে নিরাপদ,—যা তোর কামনা,—তোর শত্রুর হন্তাই তার প্রতিষ্ঠাতা,—আর সেই—সেই তোর জামাতা! আশমান, যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোনো বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়েছিস্‌?

হাঁ বাবা!

কে সে,—কে সে সুহৃৎ?

কাসেম খাঁ,—নসেরিতের সেনানায়ক।

আজিম সাহ অস্থির ভাবে বলিলেন ;—কা—সে—ম! সে যে হিন্দুদ্বেষী!

আজিম সাহের বক্ষঃদেশ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্তস্রাব হইতে লাগিল।

আশমানতারা বলিল ;—কাসেম খাঁ উদার,—আরও বুঝ্লাম, নসেরিতের উপর সন্তুষ্ট নয়।

আজিম কষ্টে বলিলেন ;—কাসেম বীর, তার বলেই নসেরিৎ জয়ী। কিন্তু সে যে হিন্দুর শত্রু,—সেজন্য সে আমার পক্ষ গ্রহণ করেনি! মেহেরবান্ খোদা, এ আবার কি শোনালে প্রভু!

অত্যধিক রক্ত-স্রাবে আজিম সাহের চক্ষু মুদিয়া আসিল। তিনি জড়িত কণ্ঠে অতি আয়াসে উচ্চারিলেন ;—আশমান—মা,—চল্—লাম, —খোদা,—আশ—মান রইল,—

বলিতে বলিতে আজিম সাহের বক্ষঃ রক্ত-প্লাবিত হইল। তিনি কম্পিত হস্তে আশমানের হস্তখানি তাঁহার সেই রক্তাক্ত বক্ষে স্থাপিত করিলেন। আশমান চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ডাকিল ;—বাবা,—

আর উত্তর আসিল না,—আজিম সাহের সর্ব্বাঙ্গ একবার স্পন্দিত হইল, বক্ষের মধ্যে কি একটা অস্পষ্ট শব্দ শ্রুত হইল, একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস অন্তরের অন্তস্তল হইতে নির্গত হইয়া শূন্যে মিলাইল। সব শেষ!

আশমানতারা ক্ষণকাল পিতার মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখপানে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। যখন তাহার জ্ঞান হইল,—দেখিল, সম্মুখে কাসেম খাঁ। আশমানতারা তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল ,—খাঁ সাহেব, পিতা মৃত।

কাসেম খাঁ স্থির ভাবে উত্তর দিলেন ;—আজ্ঞা করুন্, সাহজাদার সৎকারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা কর্ব্বো।

আশমান বলিল ;—আমরা গৌড়ে যেতে চাই।

গৌড়ে!

হাঁ।

পিতা-পুত্রী দুইজনই!

হাঁ—গৌড়ের প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানেই আমার পিতার সমাধি হবে।

কাসেম খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন ;—আচ্ছা, সাহজাদি, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

আশমান কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলিল ;—সেনাপতি কাসেম খাঁ, আজ আপনাকে আমি কি দিয়ে খুসী কর্ব্বো? আমার এই মুক্তামালা গ্রহণ করুন্—আর খোদা যদি দিন দেন্ ত—

আশমান আর বলিতে পারিল না, বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠরোধ হইল। সে ধীরে ধীরে মুক্তাহার ছড়াটী খুলিয়া কাসেম খাঁকে দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কাসেম খাঁ অবশিষ্ট উক্তি শুনিবার প্রতীক্ষা না করিয়া বিনীত ও উদারকণ্ঠে বলিলেন ;—মার্জ্জনা করুন্ সাহজাদি! আজ আপনার পুরস্কার--দানের সময় নয়। খোদা যেদিন দিন দেবেন, সেই দিনই না হয়, আপনি আমাকে পুরস্কৃত কর্ব্বেন। আর আজ আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি মাত্র, পুরস্কারের মত এমন কিছুই ত করিনি! আপনি এখানেই অবস্থিতি করুন্, এখনই আমি আপনাদের গৌড়-যাত্রার ব্যবস্থা কচ্ছি।

এই বলিয়া কাসেম খাঁ সাহজাদীর সম্মুখে সম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

৯

বেশী দূর অগ্রসর হইতে হইল না। রাজা গণেশ ইতিমধ্যেই গৌড় আক্রমণ করিয়াছেন। কুমার যদুনারায়ণের অধিনেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত সেনাদল তানোরের অদূরবর্ত্তী স্থানে উপনীত হইয়া, অবিলম্বে বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন্ হইবার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

রণদক্ষ কাসেম খাঁর সৈন্য-চালনায় নসেরিৎ সাহ আজিমকে বিধ্বস্ত করিলেও, আজিম সাহের উৎসাহ-প্রণোদিত সৈন্যগণ নসেরিৎকেও কম ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই। কাসেম খাঁর সুশিক্ষিত বহু সৈন্য সে যুদ্ধে হতাহত হইয়াছিল। তাহা হইলেও, নসেরিতের সৈন্য-সংখ্যা নিতান্ত সামান্য ছিল না। যাহা হউক, সেই সারারাত্রব্যাপী অবিশ্রান্ত সংগ্রামে শ্রান্ত-ক্লান্ত আজিম-ধ্বংসী অবশিষ্ট নসেরিৎ-সেনা কিয়দ্দূর আসিতে না আসিতে, যখন পুনঃ যুদ্ধোদ্যমের জন্য অনুজ্ঞাত হইল, তখন মার্ত্তণ্ডদেব প্রচণ্ড বিক্রমে মধ্যগগনে বিরাজ করিতেছিলেন, সে সময় তাঁহারও অনল-সংগ্রাম চলিয়াছিল!

পুনর্যুদ্ধ নিশ্চিত জানিলেও, এত সত্বর শত্রুর ভেরী-নিনাদ শ্রুত হইবে, কাসেম খাঁ তাহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বিপক্ষকে যুদ্ধ দান করিবার জন্য সুবিধাজনক স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া তিনিই প্রতীক্ষা করিবেন। নসেরিতের দূরদৃষ্টির অভাবে গৌড় আপাততঃ হস্তচ্যুত হইলেও, দ্বিতীয় যুদ্ধের উপরই নসেরিতের তথা মুসলমানের প্রকৃত জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে। সুতরাং, এই যুদ্ধে শত্রু পরাস্ত হইলে রাজা গণেশনারায়ণকে তিনি অনেকটা সহজেই গৌড় হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন,—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

যাহা হউক, তিনি বিচলিত হইলেন না, সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়া নসেরিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আজিম সাহকে বিধ্বস্ত করিয়া নসেরিৎ সাহের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাঁহার বাদসা হইবার বিশেষ কিছু বাকি নাই! হিন্দুর উপর শ্রদ্ধা তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাহারা কাপুরুষ হীনবীর্য্য এই ধারণায় তিনি এমন কি রাজা গণেশনারায়ণকে পর্য্যন্ত বিশেষ ভীতির চক্ষে দেখিতেন না। কিন্তু আজ এই অভাবনীয় ব্যাপার তাঁহাকে বড়ই বিহ্বল করিয়া তুলিল। হৃদয়হীন নসেরিৎ সাহ নিতান্ত নির্ব্বোধের মতই কাসেম খাঁকে সহসা বলিয়া ফেলিলেন ;—খাঁ সাহেব, যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনও উপায় কি নেই ?

এরূপ উক্তি নসেরিতের পক্ষে যে অসম্ভব নহে, ইহা কাসেম খাঁ জানিতেন। বিশেষতঃ, ইতিপূর্ব্বে আশমানতারার প্রতি নসেরিতের দুর্নীত আচরণ তাহাকে তাঁহার উপর বড়ই বীতশ্রদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি বিরক্তিব্যঞ্জক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—এখন আপনি কি চান্ ?

নসেরিৎ মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন ;—তাইত, এ যুদ্ধে যে কি হয়, কি জানি—আর যেন ভাল লাগ্‌ছে না! যুদ্ধ না কল্লেই কি নয় ?

কাসেম খাঁ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন—আপনার কি অভিরুচি ? পলায়নের আর পথ নেই, যুদ্ধ অনিবার্য্য।

নসেরিৎ বলিলেন ;—তা—তা—আত্মসমর্পণ কল্লে চলে না কি ? যা হোক্ এই ভাবের একটা রফা কল্লে মন্দ হত না কিন্তু—

কাসেম খাঁ ধৈর্য্য হারাইলেন, বলিলেন ;—চল্‌বে না কেন? খুব চল্‌বে। তবে তা হলে কাসেম খাঁর হস্তেই আত্মসমর্পণ কত্তে হবে! সাহজাদা, বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনার ন্যায় অপদার্থকে উপলক্ষ্য করে আজ মুসলমান জাতির প্রতিষ্ঠা বজায় রাখ্‌তে চেষ্টা কত্তে হচ্ছে! এই সাহস নিয়ে আপনি গৌড় মসনদের দাবী সাব্যস্থ কত্তে আশা করেছিলেন! ছিঃ! ছিঃ! নসেরিৎ সাহ! আত্মসমর্পণ আপনাকে কত্তে দেবো না। গৌড়-বাদসাহের বংশধর হিন্দুর পায়ের তলায় মাথা নীচু করে দাঁড়াবে, কাসেম খাঁ তা সহ্য কর্ব্বে না। আমি সমস্ত সৈন্যকে সজ্জিত হতে আদেশ দিয়ে এসেছি। যুদ্ধে আপনি অসম্মত হন, বাধ্য হয়ে আপনাকে বন্দী করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে, আপনি স্বজাতি-দ্রোহী—

নসেরিৎ চমকিলেন; শুধু ডাকিলেন ;—কাসেম খাঁ,—

কাসেম খাঁ উদ্ধত ভাবেই উত্তর দিলেন ;—হাঁ তাই, এখনি এসে দেখ্‌তে চাই, আপনি প্রস্তুত। আমি চল্লাম।

কাসেম খাঁর ভ্রূকুটী নসেরিৎ সাহকে বড়ই বিব্রত করিল। বুঝিতে পারিলেন, যুদ্ধ ব্যতীত উপায় নাই। ভাবিলেন, কাসেম খাঁ বীর, যুদ্ধে জয়লাভ হইলেও হইতে পারে। আরও ভাবিলেন, যদি যুদ্ধে জয় হয়, তখন মসনদে বসিয়া একদিন না একদিন কাসেম খাঁকে সায়েস্তা করিতে পারিবেন। এখন কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হইবে, তা হউক, সে বিষাক্ত কণ্টক! আর যদি পরাজয়ই হয়, তখন আত্মসমর্পণ সহজ হইয়া দাঁড়াইবে। যাহা হউক, এখন সাজিয়া-গুজিয়া নামা যাক্ ত!

*　　　*　　　*　　　*

অবিলম্বেই যুদ্ধ বাধিল। পদাতিকের দর্পিত চরণে ও অশ্ব-খুরে উত্থিত ধূলিরাশি দ্বিপ্রহরের রৌদ্র-করোজ্জ্বল বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গোধূলির ম্লানিমা আনয়ন করিল। কাসেম-সেনা রণক্লান্ত হইলেও, যদুনারায়ণের সম্মিলিত-সেনা যেন কিছুতেই তাহাদিগকে দমিত করিতে পারিতেছিল না;—তাহাদের অদ্ভুত শিক্ষার নিদর্শন-স্বরূপ, তাহারা যদুনারায়ণের প্রতি সতর্ক আক্রমণকে ব্যর্থ করিতে লাগিল। রণোন্মত্ত কাসেম খাঁ দুর্দ্দমনীয় শার্দ্দুল-বিক্রমে শত্রু-মধ্যে পতিত হইয়া, মুহূর্ত্তে বহুসংখ্যক সেনার প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন, সে ভীষণ আক্রমণে যদুনারায়ণের সৈন্য পুনঃ পুনঃ হঠিয়া আসিতে লাগিল।

নসেরিং ভাবিয়াছিলেন, কাসেম খাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিয়া কোনও ক্রমে আত্মরক্ষা করিবেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই, কাসেম খাঁর গতি এত দ্রুত অপ্রতিহতভাবে শত্রু-ব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইবে এবং তিনি তাঁহার এই সুদৃঢ় অঙ্গত্রাণ হইতে এত শীঘ্র—এত সহসাই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন।

অনর্থক সৈন্যক্ষয় তা সে যে পক্ষেরই হউক, ইহা যদুনারায়ণের অভীপ্সিত ছিল না। যাহাকে চূর্ণ করিতে পারিলে যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ণীত হয়, তাহাকেই তিনি সন্ধান করিয়া তাহার সম্মুখীন্ হইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যেও এই উপদেশ

দেওয়া ছিল, তাহারা শুধু আত্মরক্ষা করিবে, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে বিপক্ষকে আহত করিবে এবং হনন-বৃত্তিকে বিশেষভাবে দমন করিবে। কাসেম খাঁর বীরত্ব তাঁহার অবিদিত ছিল না। তথাপি যদিও তিনি কাসেম খাঁর সংহার-মূর্ত্তি দেখিয়া একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন, কাসেম খাঁকে প্রতিরোধ করিবার প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমানে অনুভব করেন নাই। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল নসেরিৎ সাহ।

ঘটনাচক্রে সেই নসেরিৎ সাহ তাঁহাব নিকটবর্ত্তী! যদুনারায়ণ অগ্রসর হইলেন। নসেরিৎ সাহও দেখিলেন, যদুনারায়ণ তাঁহার সম্মুখে! নসেরিৎ ভাবিলেন, যখন তাঁহার হস্তে আজিম সাহের পতন হইয়াছে, তখন সেই তাঁহার হস্তেই যদুনারায়ণের মৃত্যু অবধারিত! সুতরাং, ভীতি অপেক্ষা উৎসাহের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হস্তস্থিত প্রহরণ যদুনারায়ণের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু ঘটনার সমাবেশ সর্ব্বত্র এক হইতে পারে না। যদুনারায়ণের শিক্ষিত অশ্ব পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল, প্রহরণ ব্যর্থ হইল। সেই ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গেই যদুনারারণের প্রহরণে নসেরিতের অশ্ব ভূপাতিত হইল। নসেরিৎ উঠিয়া বামে দক্ষিণে এক পলক চাহিয়া দেখিলেন, কাসেমের শিক্ষিত সৈন্যগণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়াছে। আরও দেখিলেন, যদুনারায়ণ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াছেন! নসেরিতের সাহস বাড়িল, তিনি নিষ্কোষিত অসি-হস্তে যদুনারায়ণকে আক্রমণ করিলেন, সৈন্যগণও হুঙ্কার দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিল।

যদুনারায়ণ শান্তভাবে অতি দক্ষতার সহিত শত্রুগণের প্রতি আঘাত ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নসেরিৎ বুঝিলেন, যদুনারায়ণ আর কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিবে? তাহার আর রক্ষা নাই, নির্ব্বোধ অশ্ব

হইতে নামিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিল! তিনি যতই উৎসাহিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার উদ্দাম ভাব ততই বাড়িতে লাগিল, রণনীতি লঙ্ঘন করিয়া তিনি ততই যে-সে-প্রকারে যদুনারায়ণকে ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একে ত শত্রু-বেষ্টিত, তাহার উপর এইরূপ নিয়ম-লঙ্ঘন, যদুনারায়ণকে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইল। তিনি বিপুল বিক্রমে নসেরিৎকে আক্রমণ করিলেন, বিপক্ষ-সেনা এবার আর কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। চকিতের মধ্যে নসেরিতের ছিন্নমুণ্ড মাটীতে লুটাইতে লাগিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কুমার তাঁহার কটীস্থিত ভেরী বাজাইয়া স্বপক্ষকে যুদ্ধ-নিবৃত্তির সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। কাসেম-সেনা তখনও লড়িতেছে, আর কুমার শুধু আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

কাসেম খাঁ সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রথমে নসেরিৎকে সাহায্য করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই, শুধু দূরে দাঁড়াইয়া কৌতূহল-দৃষ্টিতে যদুনারায়ণের যুদ্ধ-কৌশল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু যখন কুমার অন্যায় আক্রমণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষিপ্ত মৃগেন্দ্রের ন্যায় নসেরিতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সাহায্যার্থ দ্রুত অগ্রসর হইলেন। নিকটবর্ত্তী হইতে হইতেই নসেরিৎ নিহত, সঙ্গে সঙ্গেই ভেরী-নিনাদ! কাসেম খাঁ আশ্চর্য্য হইলেন। দেখিতে দেখিতে যদুনারায়ণের সমস্ত সৈন্য আত্মরক্ষা করিতে করিতে যুদ্ধ-স্তব্ধতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনুরোধ করিতে লাগিল। অগত্যা কাসেম খাঁও ক্ষণিক সন্ধিসূচক ভেরী বাজাইলেন।

কাসেম খাঁ যদুনারায়ণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। কুমার ললাটস্থ স্বেদ-জল তর্জ্জনী-সাহায্যে মোচন করিতে করিতে কাসেম খাঁকে বলিলেন ;— খাঁ সাহেব ! আর কেন ? এই খানেই যুদ্ধ শেষ করা যাক্ ?

কাসেম খাঁ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন ;—হিন্দুবীর ! কাপুরুষ নসেরিৎকে নিহত করে স্থির কল্লেন্ কি,—মুসলমান এই পর্য্যন্ত !

তা নয়,—তবে আমি যেন বুঝ্ছি,—আজিম ও নসেরিৎ সাহের সহিত সংগ্রামের পরিসমাপ্তি এইখানে।

হলেও, যুদ্ধের পরিসমাপ্তি এইখানে হতে পারে না। তা যদি হয়, তা হলে বুঝ্তে হবে, মুসলমানেরও শেষ এই খানে।

হাসিয়া কুমার বলিলেন ;—খাঁ সাহেব, এ ত আর হিন্দু মুসলমানে জাতিতে জাতিতে লড়াই নয় !

মোটামুটী দেখ্তে গেলে তাই বটে। কিন্তু এ যুদ্ধ যদি আজ এই খানেই থেমে যায়, তা হলে মুসলমানকে যে হিন্দুর আজ্ঞাবাহী হয়ে চল্তে হবে,—এটা ঠিক। যে এতদিন যার উপর প্রভুত্ব করে এসেছে, সে যে আজ তার কাছে ছোট হয়ে যাবে, কাসেম খাঁ তা দেখ্তে পার্ব্বে না।

কুমার আবার হাসিলেন,—বলিলেন ;—বুঝ্তে পেরেছি খাঁ সাহেব ! কিন্তু গৌড় অধিকার করে বস্লেও আমাদের উদ্দেশ্য তা নয় যে, আমরা মুসলমানকে ছোট করে দিতে চাই। গৌড় থেকে মুসলমানকে নিষ্কাশিত কর্ব্বার বাসনা আমরা এক দণ্ডের জন্যও পোষণ করি না। আমরা চাই, আমাদের কাম্য,—হিন্দু-মুসলমানে সাম্য।

কাসেমও হাসিলেন,—হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—কুমার ! আপনার কাম্য প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তা হয় না। একস্থলে দুইটী বিভিন্ন জাতির প্রতিষ্ঠা হতে পারে না ,—অন্ততঃ হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে তা একেবারেই

অসম্ভব। বর্ত্তমানে ভারতে হিন্দুর যা অবস্থা আর মুসলমানের যা অবস্থা, তাতে মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে তুল্য অধিকার ভোগ করে সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারে না। এখন তার হিন্দুর উপরে আসন অক্ষুন্ন রাখ্‌তে হবেই।

কুমার গম্ভীর হইলেন, বলিলেন;—খাঁ সাহেব! আপনার স্বজাতি-প্রীতির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু আপনার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে হিন্দুকে অতটা হীনচক্ষে দেখা সঙ্গত কি? আরও মানুষকে বা একটা জাতিকে জয় কত্তে হলে, যুদ্ধের দিক্ দিয়ে—দৈহিক শক্তির দিক্ দিয়ে কতটা কৃতকার্য্য হওয়া যায়?—যা হোক্, যুদ্ধই যদি আপনার একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে বোধ হয়, তা হলে আসুন, আমি সাম্যের পক্ষ নিয়ে আর আপনি মুসলমানের পক্ষ নিয়ে পরস্পরে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই;—অনর্থক লোকক্ষয় করে কি হবে? না হয়, আমাতে ও আপনাতেই একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাক্।

এই বলিয়া যদুনারায়ণ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাসেম খাঁ দেখিলেন তাঁহার সৈন্য বড়ই ক্লান্ত, অধিকন্তু, সাহজাদার মৃত্যুতে ভগ্নহৃদয়। সৈন্যবল হিসাবে কুমারই প্রবল। সে অবস্থায় বাহিনীতে বাহিনীতে সংঘর্ষ অপেক্ষা তত্তৎ বাহিনীর অধিনেতায় অধিনেতায় সংঘর্ষ বরং আশাপ্রদ। বিশেষতঃ, যদুনারায়ণের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের প্রস্তাব তাঁহার সমর-পিপাসু বীরহৃদয়কে স্ফীত করিয়া তুলিল। তিনিও প্রস্তুত হইয়া বলিলেন;—আচ্ছা বেশ, তবে তাই হোক্।

তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। দুই বীরপুঙ্গবের উন্মুক্ত কৃপাণের উপর আরক্ত সূর্য্য-রশ্মি ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্য-সম্প্রদায় স্ব স্ব নেতার পশ্চাদ্ভাগে কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের অভিনয় অতি উৎকণ্ঠিত ভাবে দর্শন করিতে লাগিল।

ধন্য কাসেম খাঁ! গতদিনের সারারাত্রব্যাপী সমর, অনাহার, অনিদ্রা, তাহার উপর অদ্যকার সমস্ত দিনের রণ-ক্লান্তি,—কোথায়! কিছুই যেন তাঁহার হয় নাই! যেন এই মাত্র যুদ্ধে নামিয়াছেন! তিনি প্রতি আক্রমণে যদুনারায়ণকে বিব্রত করিতে লাগিলেন।

যদুনারায়ণ দেখিলেন, এ স্থলে শুধু আত্মরক্ষা করিয়া চলিলে, দিবা কি,—সমস্ত রাত্রিতেও যুদ্ধের সমাপ্তি হইবে না। অধিকন্তু, কাসেম খাঁর যেরূপ মনোভাব, তাহাতে তিনি তাঁহাকে নিহত করিতে চান,—শুধু পরাজয় করিতে নহে। সুতরাং, কাসেম খাঁর প্রতি অস্ত্রাঘাত না করিলে সামান্য অন্যমনস্কতায় তাঁহার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

তখন উভয় পক্ষেই অস্ত্রাঘাত চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল একযোগে উভয় নেতার পতনের প্রত্যাশা করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে অলক্ষিতে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। সেই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র বিস্তীর্ণপ্রান্তরে গোধূলির ম্লানচ্ছায়া ঘনাইয়া আসিল। তখনও দুই বীর উন্মত্ত বিক্রমে যুঝিতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, পদোত্থিত ধূলিতে ধূসরিত।

সহসা যদুনারায়ণের দুর্দ্দমনীয় অসি-সংঘাত কাসেম খাঁর স্কন্ধদেশ গুরুতর রূপে আহত করিল। কাসেম খাঁর অসি হস্তস্খলিত হইল.—তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই যদুনারায়ণ চীৎকার করিয়া বলিলেন ;— কাসেম-পক্ষীয় সেনাগণ, তোমরা চঞ্চল হয়ো না। আমি তোমাদের অভয় দিচ্ছি। আমি মুসলমানের শত্রু নই। তোমাদের সেনাপতি মূর্চ্ছিত, বিশেষ আহত। এখন তাঁকে গৌড়ে নিয়ে যেতে হবে, তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা কত্তে হবে। সকলে গৌড়ে চল। তোমাদের উপর কোনো

অত্যাচার হবে না, কোনো অবিচারের ভয় তোমাদের নেই। সে জন্য আমি দায়ী। গৌড় মুসলমানের, মুসলমানেরই আছে, কোনও চিন্তা নেই। এস ভাই সব !

১০

অল্পে-অল্পেই আপাততঃ সমস্ত গোলমাল একপ্রকার মিটিয়াছে। যদুনারায়ণের প্রত্যাবর্ত্তনের পরদিনই রাজা গণেশনারায়ণ সমুদয় গৌড়ীয় আমীর-ওমরাহকে আহ্বান করিয়া, এক দরবারের অধিবেশন করিলেন এবং তাহাদিগকে বুঝাইলেন, বাঙ্গালার মুসলমান জাতিকে বিধ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা সমরাভিযান করেন নাই, গৌড়ের ন্যায্য সম্রাট্‌কে সহায়তাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ঘটনাক্রমে সাহজাদা আজিম সাহ হত। সুতরাং, যতদিন পর্য্যন্ত অপর ন্যায্য ও উপযুক্ত সম্রাট্‌ সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত না হইতেছেন, তত দিন তিনি সেই ভাবী সম্রাটের প্রতিনিধি-স্বরূপ সাম্রাজ্য চালনা করিবেন। তাহাতে হিন্দু বা মুসলমানের প্রতি কোনও প্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হইবে না। অধিকন্তু, বর্ত্তমান সাম্রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে, হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, যিনি যে কার্য্যে নিয়োজিত আছেন, তাহারা তাহাতেই বহাল থাকিবেন. কাহারও কর্ম্মচ্যুতির সম্ভাবনা নাই। এমন কি, সেনাপতি কাসেম খাঁ, যাহার অধিনেতৃত্বে ও প্ররোচনায় নসেরিংসাহ আ‍ি ম সাহকে ধ্বংস করিয়াছেন, তাঁহাকেও তাঁহার আরোগ্য-লাভের পরে ঐ সেনাপতিত্বের ভার অর্পণ করা হইবে। রাজা তাঁহার ভাদুড়ী-চক্রের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একপ্রাণতার ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, সমগ্র গৌড়-সাম্রাজ্যে তিনি সেই স্রোত সঞ্চালিত করিবার কামনা করিয়া, আজ এই গুরুদায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়াছেন। তাঁহার একান্ত অভিলাষ, গৌড়ের প্রতি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই পরস্পরের দ্বৈধভাব দূর করিয়া, তাঁহার এই মহদনুষ্ঠানে অমূল্য সাহায্য দান করিবেন।

রাজা গণেশ নারায়ণের এই সহৃদয়তা ও সুযুক্তিপূর্ণ উক্তিতে প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না, থাকিলেও, বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া, কোনও আমীর বা ওমরাহ তাঁহার এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে সাহসী হন নাই।

দুই একদিনের মধ্যেই রাজধানীর পূর্ব্ব শান্তি ও আমোদ-উৎসব ফিরিয়া আসিল। দিবারাত্রব্যাপী কর্ম্ম-কোলাহল, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সচ্ছল-সজীবতা বিশাল নগরীকে তাহার ক্ষণিক বিমূঢ় অবস্থা হইতে সজাগ করিয়া তুলিল। কাল-বৈশাখী সন্ধ্যার অপগমে মেঘ-নির্ম্মুক্ত স্নিগ্ধ কৌমুদীর ন্যায় গৌড়-নগরীর পূর্ব্ব শ্রী পূর্ণ বিভায় হাসিতে লাগিল। মাত্র, সাহজাদা-দ্বয়ের অন্তর্বিরোধ-জনিত অকাল-মৃত্যুর শোকচ্ছায়া কতিপয় হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল। রাজা গণেশনারায়ণ মৃত সম্রাট-নন্দন-যুগলের প্রতি সম্মান-সূচক যথোচিত কর্ত্তব্য বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

যুদ্ধে যদুনারায়ণও অল্প-বিস্তর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে দুই একদিন বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আরোগ্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পিতার সহায়তায় নিযুক্ত হইলেন। রাষ্ট্র-বিপ্লব দীর্ঘদিন স্থায়ী না হইলেও সেই অল্প সময়ের মধ্যেই নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে এবং এই অল্পদিনেরই ত্রুটী সংশোধন করিতে দীর্ঘদিন লাগিয়া যায়। তদ্ব্যপদেশে পিতা-পুত্র কেহই আপাততঃ গৌড় ত্যাগ করিতে পারিলেন না। রাজা বৈবাহিক অবনীনাথকে সর্ব্ববিষয় জানাইয়া ভাদুড়ীচক্রের রাজকার্য্য-পরিচালন জন্য অনুরোধ-পত্র পাঠাইলেন। আর রাণী ত্রিপুরাদেবী আছেন, তাঁহাদের চিন্তার কোনও কারণ ছিল না।

কাসেম খাঁ গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। হইলেও, সে আঘাত ততটা সাংঘাতিক হইত না, যদি তিনি বিজয়ী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই

ঐরূপ আঘাত পাইতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, এই যুদ্ধে তাঁহার পতন ঘটিলে মুসলমান জাতির পুনরুত্থান সুদূর-পরাহত হইয়া দাঁড়াইবে। তাহাই যখন কার্য্যতঃ ঘটিতে চলিল, তখন তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত অস্ত্রাঘাত অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ের আঘাত এত মর্ম্মন্তুদ হইল যে, হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এক নিবিড় অন্ধকার তাঁহার উভয় নেত্রকেই অকর্ম্মণ্য করিয়া দিল, তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন।

আজ চারিদিন অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিয়াছে। গৌড়-প্রাসাদের এক সুবিস্তৃত সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে রৌপ্যময় কাঞ্চন-খচিত পালঙ্কে দুগ্ধ-ফেণ-সন্নিভ কুসুম-কোমল শয্যায় কাসেম খাঁ শয়ান।

কিন্তু শুশ্রূষাকারিণী কে ওই বালা! আশমানতারা নয়? তাইত! স্বয়ং সাহাজাদী সেনাপতি কাসেম খাঁর সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন! রাজা সদ্যঃপিতৃহীনা বালিকার ঔদার্য্যপূর্ণ আগ্রহাতিশয্য এড়াইতে পারেন নাই।

এস্থলে বক্তব্য, পর্দ্দানশীনতা মুসলমানজাতির বিশেষত্বজ্ঞাপক প্রথা থাকিলেও, কন্যাগতপ্রাণ আজিমসাহ কন্যাকে সেভাবে পর্দ্দার আড়ালে থাকিতে শিক্ষা দেন নাই। অধিকন্তু, গণেশনারায়ণ কর্ত্তৃক গৌড় অধিকারের সময় হইতেই সম্রাট্-প্রাসাদে পর্দ্দার প্রভাব অনেকটা খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল। এমন কি; ভীতা মুসলমান-মহিলাগণ তৎকালে প্রকাশ্যভাবে রাজার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

কিছুতেই কাসেম খাঁর চৈতন্য-সঞ্চার হইতেছে না, মূর্চ্ছার সহিত জ্বরের আধিক্যে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। গৌড়-নগরীর দুইজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও রাজবৈদ্য পরস্পরে

পরামর্শ করিয়া অতি সতর্কতার সহিত চিকিৎসা করিতেছেন। আশমানতারা স্বহস্তে ক্ষতস্থানে ঔষধ লেপন করিতেছে এবং মূর্চ্ছা অপনোদনের জন্য হাকিমের উপদেশানুযায়ী নানা প্রক্রিয়া করিতেছে। দিবা নাই, রাত্রি নাই, সময়ে আহার নাই, নিদ্রা নাই, আশমান কায়-মনে রোগীর পরিচর্য্যা করিতেছে, আর সময়ে সময়ে রোগীর শীর্ণ-শ্রীর পানে চাহিয়া কৃতজ্ঞ-নেত্রে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।

ক্রমে জ্বরের প্রাবল্যের সহিত সেই নিঃসংজ্ঞ অবস্থাতেই রোগীর বিকার-ভাব দেখা দিল। এতদিন রোগী নির্ব্বাক্ ছিল, শুধু মাঝে মাঝে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ও অস্থিরতা তাহার প্রাণের সাড়া দিত। আজ রোগী অধিকতর অধীর, তাহার উপর অনর্গল প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। রোগী কখন্ বলিতেছে,—সাবধান নসেরিৎ সাহ! আমার সম্মুখে নারীর অসম্মান! যাও, এখান থেকে চলে যাও। তুমি আবার বাদসাহী নিতে চাও! না,—নসেরিৎকে বাদসাহী দেওয়া হবে না, দেওয়া যেতে পারে না, সে পাজি, বড় পাজি!...... ...

কাকে দিই, কে সম্রাট্ হবে? খাটী মুসলমান চাই। যে বাক্যে মুসলমান, কার্য্যে মুসলমান। খামখেয়ালী মুসলমান আমি চাই না। আমি এমন মুসলমানের হাতে রাজদণ্ড দিতে চাই, যিনি বিলাসের দাস নন্, চাটুকারের ক্রীড়নক নন্। আমি এমন সম্রাট্ চাই, যিনি ন্যায়ের সম্রাট্, ধর্ম্মের সম্রাট্, খোদা-প্রেরিত স্বর্গদূত, যাঁর অনুজ্ঞায় সমস্ত বাঙলা কি, সমগ্র ভারত ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হবে।............

আহা সে কি সুন্দর দৃশ্য! সমস্ত ভারত জুড়ে এক জাতি শুদ্ধ মুসলমান! সকলেই একযোগে "আল্লাহো আকবর" পূত ধ্বনি

তুলছে। মন্দিরের পরিবর্ত্তে মসজিদে মসজিদে ভারত ছেয়ে গেছে। এক জাতি, এক ধর্ম্ম, এক সমাজ, সব এক! খোদা! দুনিয়া কি এমনতর হতে পারে না!

এই বলিয়া রোগী কাঁদিয়া ফেলিল। আশমানতারা অতি যত্নে অশ্রু মুছাইয়া দিল। রোগীকে বাধা দিতে সাহস পাইল না, আজ তিন দিনের পর রোগীর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। রোগী আবার বলিতে লাগিল ;—

নসেরিংকে নিয়ে কি বিপদেই পড়েছি! ভাল কায করিনি, শুধু বেগমসাহেবার কথায় যুদ্ধে নেমে ভাল কায করিনি। একেবারেই মানুষ নয়! ছি! ছি! চায় কিনা হিন্দুর পদানত হতে! সুদূর তুরস্ক হতে মুসলমান যে ভারতের বুকে দর্পিত পদক্ষেপ করেছে, সে সেই ভারতের ধূলিতে মাথা লুটিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে! সে অবস্থা মুসলমানের যেদিন হবে, সেদিন সে যেন ভারত থেকে চির-বিদায় গ্রহণ করে।.........

বড় হিংসা হয়,—বাহবা না দিয়েও থাক্‌তে পারিনে—কুমার যদুনারায়ণ! আহা কি সুপুরুষ! শুধু তাই নয়, সৌষ্ঠবের সঙ্গে পৌরুষ যেন খেলা কচ্ছে! যদু, তুমি কেন মুসলমান হওনি, তাহলে আজ আমি তোমাকে ভাই বলে আলিঙ্গন করে ধন্য হতাম! আর—আর—সম্রাট্—

সহসা রোগী অত্যন্ত অস্থির হইল। ঝাঁকিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল ;—

যায়—যায়—গেল—নসেরিং গেল—যদু—নসেরিংকে—না—না—হিন্দু মুসলমানকে—সাহজাদাকে—অসহ্য—যাই—যাই,—ওঃ !—নসে—রিং—মৃ—ত্যু!!

পরে শয্যায় শুইয়া পুনরায় গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল ;—কিন্তু কুমার, এখনো কাসেম জীবিত। ভেবেছ, নসেরিৎকে মেরে, মুসলমানের সমস্ত গৌরব হরণ করে নিয়ে যাবে! হা—হা—হা! পিপীলিকাকে নিষ্পিষ্ট করে অত অহঙ্কার করো না। এখনো কাসেম-সর্প ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, এসো, সম্মুখীন্ হও।.........

আনন্দ! বড় আনন্দ! যুদ্ধ করে আনন্দ আছে। তুমি হিন্দু হলেও তোমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গৌরব আছে। কিন্তু তুমি হিন্দু, মুসলমানের শত্রু। তোমাকে শেষ কর্ব্বো, যত শীঘ্র পারি শেষ কর্ব্বো। আজ আমি আমার জাতীয়ত্ব-রক্ষার খাতিরে, যুদ্ধ-জনিত গৌরবানন্দকে বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত। যত্, যাও—রসাতলে যাও।

এই বলিয়া রোগী উদ্ভ্রান্ত ভাবে অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় বলিতে লাগিল ;—একি! হাত এমন হয়ে গেল কেন! সব অন্ধকার—সব অসাড হয়ে যাচ্ছে কেন! আমার তরবারি!—এঁ্যা—গেল—সব গেল —আর রক্ষা নাই, হায়—মুসলমান—

বলিতে বলিতে রোগী নির্জীবপ্রায় হইয়া শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িল। আশমানতারা এতক্ষণ যেন কেমন হইয়া রোগীর প্রলাপ-বাক্য শ্রবণ করিতেছিল। সহসা রোগীর শয্যায় পতনে ও নিস্তব্ধতায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি রোগীর চোকে মুখে জল-সেচন করিল ও মস্তকে জল-প্রলেপের সহিত মৃদু ব্যজন করিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। কাসেম খাঁ নয়ন উন্মীলন করিলেন। শয্যার অদূরে হৈমাধারে সুগন্ধি দীপ জ্বলিতেছে। আশমানতারা দেখিল, কাসেম খাঁ নিষ্পলকনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছেন। আশমানতারা আশাপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল ;—খাঁ সাহেব!

কাসেম খাঁ উত্তর দিলেন ;—অ্যাঁ—কে আপনি ?

আমি আশমানতারা খাঁ সাহেব !

কাসেম খাঁ কি ভাবিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন ;—আশ—মান—তারা !

হাঁ, আমি সাহজাদা আজিম-কন্যা আশমানতারা, আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না ?

হাঁ—চিন্‌তে পাচ্ছি বোধ হয়। আমি কোথায় ?

গৌড়ে।

গৌড়ে !

আজ্ঞা হাঁ—গৌড়-প্রাসাদে।

ওঃ ! তবে কি আমি বন্দী !

না, আপনি মুক্ত।

মুক্ত ! সাহজাদি ! আপনি আমাকে বিদ্রূপ কচ্ছেন !

না খাঁ সাহেব ! এ ত বিদ্রূপের সময় নয়।

ওঃ বুঝেছি। সাহজাদি, সেদিন আমি আপনার মৃত পিতার সহিত আপনার গৌড়-যাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, তারই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন এই। কিন্তু সহৃদয়া নারি ! তুমি ভাল কায করনি। শত্রুর কুটীরে মমতার অঞ্চলে কেন আশ্রয় দিলে নারি ! কাসেম খাঁ হিন্দুর কৃপা ভিক্ষা করে বেঁচে থাক্‌তে চায় না। কাসেম খাঁর চোকের উপর সেই যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, সেই অন্ধকার তার কাল-রাত্রির অন্ধকার হলেই ভাল ছিল ! ওঃ—কি সর্ব্বনাশই হল !

তখন আশমানতারা সান্ত্বনা-সূচক কণ্ঠে বলিতে লাগিল ;—আপনি অত বিচলিত হচ্ছেন কেন খাঁ সাহেব ! রাজা বা তাঁর পুত্র কই কেউ ত এখনো আমাদের প্রতি কোনও দুর্ব্ব্যবহার করেন নি ! আমি

যখনই রাজার কাছে আমার পিতার সমাধি-নির্ম্মাণের প্রস্তাব জানিয়েছি, রাজা শত কর্ত্তব্য দূরে রেখে সর্ব্বাগ্রে আমারই মনোনীত স্থানে সমাধি-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা. করেছেন। সে না হয় হতে পারে, তিনি পিতার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু আপনার প্রতি ব্যবহার, এ ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা ঘন ঘন তত্ত্বাবধান এ সকলের মধ্যে উদারতার চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ছে না কি? পিতা-পুত্রের একান্ত চেষ্টা, আপনি সুস্থ হন্। সেদিন রাজা সভা আহ্বান করে সমস্ত আমীর-ওমরাহকে ডেকে নিজ মুখে ব্যক্ত করেছেন, তিনি ভাবী মুসলমান-সম্রাটের প্রতিনিধি মাত্র। তাঁর কাছে মুসলমানের কোনও অধিকার খর্ব্বীকৃত হবে না। মুসলমান বা হিন্দু যিনি যে পদে আছেন, সেই পদেই বহাল রইলেন। এমন কি, আপনি সুস্থ হলে আপনাকেই প্রধান:সেনাপতির পদ গ্রহণ কত্তে হবে, সে জন্যও তাঁরা স্থির হয়ে বসেছেন।

কাসেম খাঁ বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন;—সে কি! রাজা কাসেম খাঁর হস্তে এত বড় একটা শক্তি দিয়ে বিশ্বাস কত্তে পার্ব্বেন!

আশমান বলিল;—এ কুমার যদুনারায়ণের অনুরোধ।

কাসেম আরও বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন;—সাহজাদি! এরা কচ্ছে কি!

এরা হিন্দু-মুসলমানে মিলন চান, সাম্য-স্থাপন এঁদের উদ্দেশ্য।

তাও কি কখনো হয়!

হয় কি! হতে চলেছে! আপনি সেরে উঠুন, দেখবেন সাম্যের উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে!

১১

আরোগ্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কাসেম খাঁর উদ্যম ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কুমার যদুনারায়ণ স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাহার উপর আশমানতারার সেবা। শেষোক্ত কারণেই কাসেম খাঁ যেন অধিকতর দ্রুতভাবে সুস্থতার সংবাদ পাইতে লাগিলেন।

তাঁহার মধ্যে আর একটী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। হিন্দুর প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ-বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহা যেন ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতে লাগিল! যেন সে বহ্নি-কুণ্ডের ইন্ধনের উপর কি একভাবের ভস্মরাশি সঞ্চিত লইয়া, তাহাকে আর জ্বলন্ত অবস্থায় থাকিতে দিতেছিল না! যদুনারায়ণের সদয় ব্যবহার, গণেশনারায়ণের মুসলমান জনসাধারণের প্রতি নিরপেক্ষ সহানুভূতির সংবাদ প্রায়ই তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত বিশ্বাসের ভিত্তি টলাইয়া দিতে লাগিল। যদিও বদ্ধমূল সংস্কার মধ্যে মধ্যে মাথা খাড়া দিয়া উঠিত, তথাপি কি এক দুর্ব্বলতা আসিয়া তাহাকে এমন ভাবে ঘুরাইয়া ফেলিত যে, তিনি কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেন না!

সেনাপতি কাসেম খাঁ যুবক,—রূপবান, হৃদয়বান্ যুবা; শুধু উচ্চ-পদস্থ বলিয়া তিনি সম্ভ্রান্ত তাহা নহেন,—বাদসাহ পরিবার-সম্পর্কেও তাঁহার সম্ভ্রান্ততা সর্ব্ববাদিসম্মত। সেরূপ ব্যক্তির পক্ষে সাহজাদী আশমান-তারার প্রতি কোনও নৈসর্গিক আকর্ষণ নিতান্ত অসঙ্গত বলিতে পারা যায় কি?

তিনি তাঁহার রোগ-জনিত স্বপ্ন-ভঙ্গের পর মুহূর্ত্ত হইতেই দেখিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে আশমানতারা! নিশ্চল প্রতিমার মত নয়, তাহার সে পেলব সৌন্দর্য্য শুধু বাহ্য-বিলাস লইয়া তাঁহার নেত্রদ্বয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে না, সে রূপ মমতা লইয়া আসিয়াছে, করুণা লইয়া আসিয়াছে, বুঝিবা তাঁহার জন্য প্রেমও লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! আহা কি মাধুরী-বিজড়িত চাহনি! কি হাস্য-বিলসিত সান্ত্বনাপূর্ণ কথাগুলি! কি লীলান্বিত অঙ্গ-সঞ্চালন! কি সুন্দর, কি মোহন, কি উপভোগ্য লাবণ্য! কাসেম খাঁ, তুমি ধন্য, তোমার জীবন সার্থক! আবার ধন্যই বা কিসে? এ সুষমাময়ীর সেবা ত তাহার প্রাপ্য-ই,—এ মাধুর্য্য উপভোগ করিবার তাঁহার ত ন্যায্য দাবিই আছে! কাসেম খাঁ কিসে অযোগ্য? আজ গৌড়ীয় মুসলমান সমাজে কে এমন আছে, যে তাঁহার অধিকারকে খর্ব্ব করিতে পারে?

কাসেম খাঁ আশমানতারাকে ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাহার পক্ষে কোনও প্রকারে অপ্রার্থিত নহেন জানিয়াই ভালবাসিয়াছেন। তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, এক ত্রুটি, আশমান হিন্দুদ্বেষী নয়। কিন্তু সে তাহার পিতার শিক্ষা, বাল্যের সংস্কার বা অপরিপক্ক মস্তিষ্কের ধারণায়। আজ এই যৌবনের অবসরে তাহার সে বিকৃত রুচি মার্জ্জিত হইতে কতক্ষণ? কেশরিণী মনুষ্য-সহবাসে কত দিন আত্মবিস্মৃত থাকিতে পারে? যখনই সে তাহার কেশরীর সন্ধান পাইবে, তখনই সে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবে। তবে বেশী অধীর হইলে চলিবে না। রূপ, সামর্থ্য ও আভিজাত্যের দিক দিয়া আশমানতারা তাঁহার। সুতরাং, এত ব্যস্ততাই বা কেন? শুধু হৃদয় জয় করিতে কতক্ষণ? পারিপার্শ্বিক অবস্থা যখন অনুকূল, হৃদয় কতক্ষণ প্রতিকূল থাকিবে? বিশেষতঃ, এ

হৃদয় সামান্যা অশিক্ষিতার হৃদয় নয়, এ হৃদয় ঔদার্য্যময়ী রমণীর—শ্রেষ্ঠ মানব-বংশোদ্ভবা বালার। যাহাতে এত কারুণ্য, এত স্থৈর্য্য, এত কুশলতা, এত মায়া, এত মধুরিমা, এত প্রবণতা, সে হৃদয় আপনার করিয়া লইতে, কাসেম খাঁর ন্যায় সর্ব্বাংশে সৌভাগ্যবানের পক্ষে এতই কি অসম্ভব হইবে! কখনই নয়,—তবে সময় চাই, অবকাশ চাই, প্রতীক্ষা চাই। আজই আশমানতারাকে তাঁহার করিবার চেষ্টা হয় ত কুফল প্রসব করিতে পারে। সুতরাং, আপাততঃ ঘটনার স্রোতে গা ভাসাইতে হইবে। হিন্দুর বর্ত্তমান নিরপেক্ষতার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন প্রাধান্য আছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, যদি আজ তিনি উন্নত মস্তকে আশমানতারার প্রার্থী হন, হয়ত তাহাতে আশমান রাজি না হইতেও পারে। অধিকন্তু, তাঁহার পুনঃ পুনঃ হিন্দুর প্রতি ঔদাস্য তাঁহাকে সমধিক বিপন্ন করিয়া তুলিবে। সুতরাং, এখন তাঁহাকে হিন্দুর সেই কপট সহৃদয়তাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

ফল, আশমানকে তাঁহার চাই, আশমানকে না পাইলে যেন তাঁহার চলিবে না, এই ভাবের ব্যাকুলতা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মন আকুল আগ্রহে তাহার প্রার্থিতার আহ্বান-গীতি গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে! মন বলিতেছে,—এস আশমান প্রিয়তমা আমার, ভাবী জীবনের ধ্রুবতারা আমার, এস—ধীরে ধীরেই এস। পুষ্প-পল্লবের ন্যায় কোমল পা-দুখানির শান্ত বিক্ষেপে ধীরে ধীরেই এস। দুকুল-প্লাবী বিপুল সৌন্দর্য্যের বন্যা লইয়া আমার বক্ষে এস। আমি সেই সুধা-প্লাবনে হৃদয় স্নাত করিয়া, সেই সুর-সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া পূর্ণ নবোদ্যম লাভ করি। স্বাস্থ্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ যতই সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যেন ততই উদ্দাম

হইয়া উঠিতেছে। সহসা তোমার আবির্ভাবে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! সে পীন-বক্ষে, গোলাপ-গণ্ডে, নলিননেত্রে কি যে মাদকতা আমাকে পাগল করিয়া তুলে! "আজ কেমন আছেন খাঁ সাহেব!" এই কুশল প্রশ্ন যেন একটা সম্পূর্ণ রাগিণীর সমস্ত কম্পন-মূর্চ্ছনা লইয়া আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে,—আমি সে স্বর-লহরীতে বিভোর হইয়া যাই, আত্মহারা হইয়া যাই; যেন সেই আত্ম-বিস্মৃতির মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষাই শুধু জাগ্রত থাকে—আহা বীণা আবার বাজুক, আবার শুনি! তাহার পর, আহা সে যে কত আরাধনার—যখন তোমার মৃণাল-বাহু-বল্লী আরক্ত করতলে ধুনিত কার্পাসের সমস্ত কোমলতা অপহরণ করিয়া শীর্ণ ললাটে সাদর স্পর্শাভিনন্দন দান করে, তখন দিব্যানন্দে প্রাণ এত চঞ্চল হয় যে, না, আর নয়, আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলি, প্রাণ খুলিয়া বলি—আশমান আমার, আমি তোমার—তোমারই!

ইহাই কি সেই দুর্ব্বলতা!

১২

কাসেম খাঁ এখন প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন, সামান্য বলাধানের বাকি আছে। আর একটু সবল হইলেই তিনি তাঁহার কর্ম্ম-ভার গ্রহণ করিবেন। কোনও দিকে আর বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। আশমান-তারার পরিচর্য্যা আর তাঁহার প্রয়োজন হয় না। তবে নিজের ঐকান্তিক সেবার সার্থকতা-জনিত যে চিত্ত-প্রসাদ, তাহাই লাভ করিবার জন্য আশমানতারা সকালে সন্ধ্যায় একবার করিয়া কাসেম খাঁর কক্ষে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে কাসেম খাঁর উদারতার ঋণ সে যে কিয়ৎপরিমাণেও পরিশোধ করিতে পারিয়াছে, ইহাতে তাহার কত আনন্দ, সে জন্যও সে যায়। ভীষণ ঝটিকায় নিঃসহায় অবস্থায় সে যে তরু-কাণ্ড আশ্রয় করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল, অন্য ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভে সেই তরুই ভগ্নশাখ উন্মূলিতপ্রায় হইয়াছিল; আজ আবার তাহারই প্রচেষ্টায়, তাহারই সহায়তায় তাহা সজীব হইয়া নব পল্লব-পুষ্পে বিভূষিত হইতে চলিয়াছে, ইহা বড় চরিতার্থতার, বড় প্রসন্নতার; সে কৃতার্থতা—সে প্রসন্নতা উপভোগ করিবার যথার্থ অধিকার তাহার আছে বৈ কি! সে প্রাতে ও দিবাশেষে কাসেম খাঁর প্রকোষ্ঠে গিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিত, রোগীর আশু সুস্থতার কামনায় চিত্তবিনোদনের জন্য দুএকটী শিষ্ট—সরল মিষ্ট রহস্যালাপও করিত এবং কাসেম খাঁকে সাময়িক আনন্দ দান করিয়া নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। কোনও কোনও দিন পিতৃ-কাহিনী

অকপটে বর্ণনা করিয়া উদারহৃদয় কাসেম খাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করিত ও নিজে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া তৃপ্ত হইত। কাসেম খাঁও এই শোক-সন্তপ্তা পিতৃহীনার মর্ম্মোচ্ছ্বাস্ প্রকৃত দরদীর ন্যায়ই উপলব্ধি করিতেন, তিনিও সমবেদনার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেন। কিন্তু আশমানতারার প্রতি তাঁহার অনুরাগ যে সেই নিঃশ্বাসকে আরো গাঢ় করিয়া তুলিত, আশমানতারা তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিত না।

পরিচর্য্যার পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আশমানতারা রাত্রির অধিক সময় পিতার সমাধি-ভবনে অতিবাহিত করিত। সে নিজ হস্তে সমাধি-সজ্জার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিত। সমাধির গৃহ-মার্জ্জনা সে যেন তাহার পিতৃসেবা, সমাধির পরিচ্ছন্নতা-সাধন সে যেন তাহার পিতার প্রসাধন-কার্য্যে সহায়তা! সযত্ন-চয়িত পুষ্প-স্তবকে সযত্ন-রচিত প্রসূন-মাল্যে এই নিষ্ঠাবতী পিতৃপরায়ণা স্বর্গত পিতার অর্চ্চনা করিত। স্নেহময়ের অভাব-জনিত বেদনায় অস্থির হইলে কখন্ বা অবিরল অশ্রুধারায় সমাধি-স্তূপ অভিষিক্ত করিত, কখন্ বা তাহার পিতৃদত্ত সাধের সারঙ্গটী বাজাইয়া, সমাধি-পার্শ্বে বসিয়া অতি করুণ রাগিণী—সহযোগে পিতার বিলাপ-গাথা কীর্ত্তন করিয়া শান্ত হইত;—সে ঘুমাইয়া পড়িত। হায়! বোধ হয়, সেই সময় সেই সমাধি-গহ্বর হইতে উঠিয়া, তাহার পরমারাধ্যের অশরীরী আত্মা তাহার সেই অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে ও বিয়োগ-বিধুর হৃদয়ে তাঁহার স্নেহ-কোমল অদৃশ্য হস্তাবমর্ষ দান করিয়া সান্ত্বনার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া যাইতেন!

নিদাঘ পূর্ণিমার পূর্ণকল শশধর আজ দাবদগ্ধ বসুন্ধরাকে তাহার যথাসাধ্য শীতলতা দিয়া স্নিগ্ধ করিবার প্রত্যাশায় সমস্ত রাত্রির জন্য আকাশপটে বিরাজ করিবে এই অঙ্গীকারে উদিত হইয়াছে।

আশমানতারা

আতপ-ক্লিষ্টা প্রকৃতি কৌমুদি-স্নাত হইয়া, মেদুর সমীরে কুন্তল এলাইয়া বিরামলাভ করিতেছিল এবং তাহার স্পন্দন-জনিত ভূষণ-শিঞ্জনের ন্যায়, পক্ষিগণ রজত-জ্যোৎস্নায় নিশা-প্রভাতের কল্পনা করিয়া মধুর কাকলী তুলিতেছিল।

সাহজাদা আজিমসাহের সুধা-ধবলিত সমাধি-ভবনের গাত্রে চন্দ্রকিরণ পড়িয়া যেন তাহার শুভ্র-শুচিতা দ্বিগুণিত করিয়া তুলিয়াছে। সমাধি প্রকোষ্ঠ আলোকোজ্জ্বল পূত সুগন্ধির স্নিগ্ধ ধূম সে ঔজ্জ্বল্যকে অধিকতর মধুর করিয়া রাখিয়াছে। প্রস্ফুট গোলাপ-বেলা-রজনীগন্ধার গুচ্ছ-স্তবক-মাল্য-সম্ভার সমাধির উপরে অতি সন্তর্পণে অতি সৌষ্ঠবের সহিতই যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে।

আজ এইমাত্র আশমানতারা বুঝি তাহার পিতার সমাধি-অর্চ্চনা শেষ করিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার চিত্ত-প্রশান্তি ঘটে নাই। আজ সে বড় বিকল, বড় অধীর, বড় আকুল। সে এই কতক্ষণ ধরিয়া অশ্রুপাত করিল, পিতার সমাধির উপর মাথা রাখিয়া কত কাঁদিল। তবু যেন সে তাহার আরাধ্য-দেবতার সাড়া পাইল না! তাই বুঝি অভিমানে সারঙ্গটী লইয়া মর্ম্মস্পর্শী মধুরতম স্বরে সে গাহিতে লাগিল ;—

সমাধি-শয়নে মুদিত নয়নে
মহানিদ্রা-ঘোরে আছ নিমগন,—
তনয়া তোমার করে হাহাকার
মুখরি নিশীথ সমাধি-গগন।
গেছে দূরে সরে' প্রলয়ের মেঘ,
গেছে থেমে বটে ঝটিকার বেগ,

এ সময়ে হায়, তুমি গো কোথায় ?
কে করিবে সবে প্রীতি-আলিঙ্গন !
মুকুল-শৈশবে, মাতৃহারা যবে,
একাই দিলে যে তুই স্নেহ-ধারা,
ধরা শূন্য-জ্ঞানে, চাহি মোর পানে
রাখিলে যে নাম "আশমানতারা" ;—
শশী সনে তারে কে বলো বিকাশে,
কত দিন রবে আঁধার আকাশে,
রাখিয়া আশ্বাসে, ছিঁড়ি মায়া-ফাঁসে,
কোন্ মহাপাশে হইলে লগন !

সে কি মধুর সুর-সংযোগ ! তাহার প্রতি মীড়-মূর্চ্ছনায়, প্রতি কম্পনে-গমকে হৃদয়ের সমস্ত আকুল অভিব্যঞ্জনা মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া উঠিল ! সমাধি-মন্দিরের প্রতি পদার্থের মধ্যে, সেই সঙ্গীতের করুণ ক্রন্দন যেন পূর্ণ বিধুরতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ! যেন সমাধি-ভবনটাই সেই সঙ্গীতে যোগদান করিয়া কাঁদিতে লাগিল ! দীপ-শিখা, পূত ধূম কাঁপিয়া কাঁপিয়া কাঁদিল, পুষ্পপুঞ্জ লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিল, বুঝি সমাধি-স্তূপও নীরব গাম্ভীর্য্যে কাঁদিল ! সমাধিস্থ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আজিমসাহ বোধ হয়, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কাঁদিলেন ! অথবা তাহার মুক্ত আত্মা কন্যা-পার্শ্বে বসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে শোকাতুরার প্রবোধ-দানের ব্যবস্থা করিলেন !

গান শেষ হইল। আশমান অশ্রু-মার্জ্জনা করিয়া সারঙ্গটী যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে, জ্যোৎস্না-বিধৌত বহিরঙ্গনে অন্যমনস্ক দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া উঠিল। এক পদ সোপানে ন্যস্ত, অন্য পদ ভূমিতলে রক্ষা করিয়া

শূন্য পানে নিষ্পলক দৃষ্টি উৎকর্ণভাবে দণ্ডায়মান কে ওই দীর্ঘাকার পুরুষ !!
আশমান ভীতিপূর্ণ কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল ;—কে ?—

আগন্তুকও চমকিয়া উঠিলেন। সোপান হইতে পা নামাইয়া, বোধ হয়, ভাবিলেন, উত্তরদানের বিলম্বে সমধিক বিপদের সম্ভাবনা, তিনি উত্তর দিলেন ;—সাহজাদি, ভয় নেই, আমি কুমার যদুনারায়ণ। আপনার চিত্ত-দ্রাবী সুর-সঙ্গীত আমাকে উদ্যানের অপর প্রান্ত হতে টেনে এনে, এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতই এইখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল ! আমি কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হয়েছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন্। কিন্তু বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি, এত মধুর এত সুন্দর গান শুনে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হওয়াও ভাল, এতে হৃদয় পবিত্র হয়ে যায়, ধন্য হয়ে যায়। চুরি করে দেবভোগ্য অমৃতপানেও অমরত্ব লাভ হয় !

কুমার সেইখানে দাঁড়াইয়া এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু আশমান তাহার দুই একটী শব্দ শুনিল মাত্র ! তাহার হৃদয়ে তখন দ্রুতস্পন্দন চলিয়াছে, নূতন ভাবোচ্ছ্বাসে হৃদয়-সমুদ্র তাহার উদ্বেলিত ! কখন্ সে মনে করিতেছে,—লজ্জাহীনা প্রগল্‌ভার ন্যায় সে অকপটে আত্মনিবেদন করে, তখনই স্বভাব-সিদ্ধ সঙ্কোচ আসিয়া তাহার বুক চাপিয়া মুখ টিপিয়া ধরিতেছে। কিন্তু তাহার বিমূঢ় থাকিলে চলিবে না ত ! আত্ম-প্রকাশের এ অপূর্ব্ব সুযোগ সে ত্যাগ করিতে পারে না। সে অনেকটা সংযত হইয়া বলিল ;—যুবরাজ ! আপনি কোনো ক্রুটী করেন্ নি ত !

যদুনারায়ণ বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন ;—সে কি ! এই গভীর নিশীথে সমাধি-মন্দিরে পিতৃশোক-সন্তপ্তা সাহজাদীর শান্তিভঙ্গ, এ ক্রুটী নয় !

আশমান গম্ভীরভাবেই বলিল ;—না কুমার, এ আপনার ক্রুটী নয়, আপনি ঠিকই করেছেন। আমি প্রতিদিন আপনার প্রতীক্ষা কচ্ছি।

আসুন—নিঃসঙ্কোচেই আসুন। আপনি আমার পিতার পরম মিত্র, আপনার আগমনে আজ তাঁর সমাধি তৃপ্ত হয়েছে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আশমানতারা যদুনারায়ণের হাত ধরিয়া সমাধি-সন্নিধানে লইয়া গেল এবং ভাবাবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিল;—বাবা! তোমার শত্রু-হন্তা, সাম্য-ধর্ম্মের ভাবী প্রতিষ্ঠাতা, কুমার যদুনারায়ণ এসেছেন!

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে এই মৃতের প্রতি আহ্বান-বাণী যদুনারায়ণের সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ আনিয়া দিল। তিনি সমাধি স্পর্শ করিয়া পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিলেন। পরে আশমানতারার পানে চাহিয়া দেখিলেন—এ কি মূর্ত্তি! শিশির-স্নাত ফুল্ল স্থলপদ্মের ন্যায় এ কি মুখচ্ছবি! কপোল-চুম্বী চূর্ণালক-গুচ্ছে, বর্ষণ-ক্ষান্ত সুবিশাল নেত্রপল্লবে এ কি রূপ! কুমার আরও কতদিন আশমানতারাকে দেখিয়াছেন, কিন্তু সে এমনটী ত নয়! সে ক্ষণিক বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় চিত্তাকাশে বিম্বিত হইয়া নিবিয়া গিয়াছে। আজ যেন সে মেঘ-মুক্ত নব রবির ন্যায় স্থির, শান্ত, ভাস্বর! যদুনারায়ণ যেন দেবী-প্রতিমার ন্যায়ই আশমানতারাকে দেখিলেন!

পরে চক্ষু নত করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন;—আপনি আমার প্রতীক্ষা কচ্ছিলেন!

আশমান বলিল;—হাঁ কুমার, আপনার নিকট আমার বিশেষ বক্তব্য আছে।

আপনি অকপটে বল্‌তে পারেন, আমি আপনার কোনো অনুরোধ অপূর্ণ রাখ্‌বো না।

আশমান একটু হাসিল,—হাসিতে হাসিতে বলিল;—আপনার নিকট

আমার প্রথম অনুরোধ, আপনি আমাকে আর এতটা সম্মান করে কথা কইবেন না।

যদুনারায়ণ আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন ;—সেকি ! কেন ?—

আশমানতারা গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক কণ্ঠে কহিল ;—এটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন, এ স্থলে আমাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা চল্‌বে, তাতে কুপ্রবৃত্তির কোনো চিহ্ন থাক্‌তে পারে না, পাপের নিঃশ্বাস এ পুণ্যক্ষেত্রে কখনই বইতে পারে না ?

হাঁ জানি।

তবে শুনুন্‌, আপনি আমার পিতৃ-নির্দ্দিষ্ট স্বামী ! আমি আপনার দাসী !

যদুনারায়ণ উদ্বেগ-পীড়িত কণ্ঠে বলিলেন ;—সে কি ! তা কি কখনো হয় !

আশমান দৃঢ়তার সহিত বলিল ,—যুবরাজ ! আমার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বলে গেছেন, তাঁর হন্তা নসেরিৎ সাহ যাঁর হস্তে নিহত হবে, তিনি হিন্দু-মুসলমানে সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনিই তাঁর জামাতা ।

যদুনারায়ণ নিতান্ত বিপন্নভাবে বলিলেন ;—সাহজাদি, তুমি আমায় একি প্রহেলিকায় ফেল্লে ! আমি যে বিবাহিত—আমি যে হিন্দু !

আশমান স্থিরভাবেই উত্তর দিল ;—এ প্রহেলিকা নয়—অতি সত্য ! আপনি হিন্দু এবং বিবাহিত, আমি তাও জানি। কিন্তু এ ত তাঁর শুধু মুখের কথা নয়—এ যে স্বর্গদূতের ভবিষ্যদ্বাণী বলে তিনি প্রকাশ করে গেছেন !

পরে আশমানতারা অতি কাতর নেত্রে কুমারের পানে চাহিয়া, মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল ;—প্রভু, অধীনীকে প্রত্যাখ্যান কর্ব্বেন না !

কুমার ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন ;—সাহজাদি, আমায় মাপ করো, আজ আমি তোমায় কোনো উত্তর দিতে পাচ্ছি না, আমাকে ভাব্‌তে সময় দাও।

আশমান অবিচলিত কণ্ঠে শুধু বলিল ;—উত্তর কিছুই চাই না! আজ আমি আমার পিতার সমাধি-সমক্ষে তাঁরই নির্দেশমতে আমার মুক্তামালা আপনার কণ্ঠে পরিয়ে দিলাম, আপনার যা অভিরুচি হয় কর্ব্বেন—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আশমান অকস্মাৎ নিজ কণ্ঠদেশ হইতে মুক্তাহারছড়াটী উন্মোচন করিয়া, যদুনারায়ণের গলদেশে পরাইয়া দিল!

যদুনারায়ণ তখন গভীর চিন্তামগ্ন, ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ। পলকের মধ্যে আশমানতারা এতটা কাণ্ড করিল, তিনি তাহাকে বাধা দিবার অবসরও পাইলেন না, মাত্র স্তম্ভিতভাবে সেই সমাধি-মন্দিরতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন! আর আশমানতারা তাঁহার পদ-প্রান্তে সেই সমাধি-পার্শ্বে লুটাইতে লাগিল!

প্রাক্তন !!

আশমানতারা

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

১

আর দেখ্‌ছ কি ভায়া, আস্তে আস্তে পাত্‌তাড়ি গুটোও,—এখানে আর থাকা নয়।

তাইত ভশ্চায্যি মশায়, কালে কালে হল কি! গতিক ত সুবিধে বলে বোধ হচ্ছে না।

দেশ মুসলমানে ছেয়ে যাবে হে,—কিছুতেই আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। মাথা খারাপ হলে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতক্ষণ ঠিক থাক্‌তে পারে?

কি কাল মুসলমান এসে বাঙলায় ঢুকেছিল!

তাদের দোষ কি?

তারাই ত এসে আমাদের মাথা খেলে।

তারাই মাথা খেলে, না আমরা তাদের সংসর্গে গিয়ে নিজেদের মাথা নিজেরাই খেলাম!

তারাও খেলে,—আমরাও খেলাম।

তারা যখন আমাদের ঘাড়ে এসে চেপে বসেছে, তখন আমাদের ঘাড় মট্‌কাবার চেষ্টা ত কর্ব্বেই। কিন্তু আমরা কি কল্লাম!

আমরা সেই ঘাড়টাকে যাতে বেশ সহজে ভাঙতে পারে, তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি! এ হচ্ছে আমাদের একরকম স্বেচ্ছামৃত্যু!

বাস্তবিক তাই। রাজা গণেশনারায়ণের গৌড় অধিকার করা থেকে আমরা অনেকটা আশা করেছিলাম, বুঝি বাঙ্‌লার ভাগ্যাকাশ আবার মেঘশূন্য হল। মুসলমানের দর্প চূর্ণ হবে, হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম অত্যাচারীর হাত হতে নিস্তার পাবে। এখন দেখ্‌ছি, সে আশা অলীক, সম্পূর্ণ অলীক!

দেখুন, মশায়, আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, বাদসার বেগমেরা ঠিক যাদু জানে। নইলে এমনটা কি হতে পারত?

কি রকম—কি রকম?

আর কি রকম। কেন শোননি নাকি! গুজব যে দেশময়!

কি—কি গুজব?

রাজা এই বৃদ্ধ বয়সে,—

আরে না—না সে গুজবই, তাতে কিছু সত্য নেই। তিনি স্বর্গে গেছেন, মিথ্যা অপবাদে তাঁর আত্মাকে ক্ষুণ্ণ কত্তে নেই। তাঁর বিষয় আমি যতটুকু জানি,—তিনি সম্রাট্ সৈফুদ্দিনের পরিবারবর্গকে অভয় দেবার জন্য মাত্র স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। অনেকে বলে, তিনি কোনো কোনো বেগমকে নিকে করেছিলেন, বাজে কথা। আর তাই যদি হত, কুলপতি সাঁতোড়রাজ বৈবাহিক হলেও তিনি সেটা নীরবে সহ্য কর্ত্তেন না। তার উপর রাণী ত্রিপুরাদেবীর ন্যায় পত্নী।

আর তা হলে, এই শ্রাদ্ধ-ব্যাপারেই ত একটা হুলস্থুল হয়ে যেত।

তা বুঝি হয় নি?

কই, সর্ব্বস্থানের ব্রাহ্মণেরাই ত শ্রাদ্ধ-বাসরে মধ্যাহ্ন-ভোজন করেছিলেন। পণ্ডিত, অধ্যাপক কেউই ত অনুপস্থিত ছিলেন না, আমার অবশ্য,—শোনা কথা।

ভায়া, প্রকাশ্যে কিছু কর্ব্বার থাকলে দেখতেও পেতে, শুনতেও পেতে। সাতগাঁ, বিক্রমপুর প্রভৃতি বহুতর স্থানের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শারীরিক অসুস্থতা বা দৈব-দুর্ব্বিপাক এমনি একটা-না-একটা কারণ দেখিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হননি, সে খবর রাখ?

বল্‌তে পারি না, তবে আমার যতটুকু বিশ্বাস—যদি তাই হত, সেটা রাজা অবনীনাথ ত নিশ্চয়ই—

আরো শুনেছি, তিনি যখন গৌড়ে থাকৃতেন, তখন ঠিক মুসলমানের মতই থাকৃতেন, আর সাতগড়ায় বা পাণ্ডুয়ায় যে হিন্দু,—সেই হিন্দু।

হতে পারে, সে আর কিছু বিচিত্র নয়। মুসলমান-প্রধান স্থানে তিনি মুসলমানের আদব-কায়দা যতটা সম্ভব অবলম্বন কর্ত্তেন। মুসলমানগণের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি সেটুকু করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অনেক স্থলে তিনি ত হিন্দুকে ঠেলে রেখে মুসলমানকে কোলে টেনেছেন। চাই হে সেটা চাই, নইলে পরকে আপন করা যায় না।

মুসলমানের সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা রাখবার আর তাঁর কি এত প্রয়োজন ছিল? প্রতিনিধি হয়ে বসে গৌড় শাসন না করে নিজেই সম্রাট্ হয়ে বস্‌লে আজ হিন্দুর মুখ কতটা উজ্জ্বল হত।

সেটা বল্‌তে পার বটে।

আর অত ঘেঁষাঘেঁষির ফল কি হয়েছে জান?

কি হয়েছে?

ওঃ! তা হলে খবর ত কিছুই রাখ না দেখ্‌ছি।

হাঁ—হাঁ, সেদিন ঢেঁড়া দিয়ে বেড়াচ্ছিল বটে, হিন্দু-মুসলমান সব সমান, যদি কেউ ভেদ-ভাব পোষণ করে, ভাবী সম্রাটের প্রতিনিধি কাছে দণ্ডনীয় হতে হবে। তা—তাতে কি হল?

ভায়া, দর্শনশাস্ত্র পড়ে তোমার মাথাটা একেবারেই বিগ্‌ড়ে গেছে দেখ্‌তে পাচ্ছি! হিঁদুর হিঁদুয়ানি রাখ্‌তে গেলেই, মুসলমানকে তফাৎ রাখ্‌তে হবে। যাকে ছুঁলে নাইতে হয়, ছায়া মাড়ালে দেহ অপবিত্র হয়, তাকে কে আলিঙ্গন দেবে বল দেখি? আমরা আমাদের শাস্ত্র-সম্মত নিষ্ঠাটাকে বজায় রাখ্‌তে গেলেই ত মুসলমানের প্রতি ভেদ-ভাব পোষণ কত্তে বাধ্য হবো। মুসলমানের জাত যায় না, জাত যেতে যায় আমাদেরই। তারা যদি এসে আমাদের কোল দেয়, তারা ত পতিত হবে না, হতে আমরাই হবো। পতিত হবো ভেবে ভয়ে সরে দাঁড়ালেই আর রক্ষা নেই। আমি ত দিব্যি দেখ্‌ছি, ঘোষণাটাই হিন্দুর মরণ, আর তুমি অক্লেশে বল্‌ছ তাতে কি হয়েছে! বুঝতে পাচ্ছনা, এ কংসরাজার বদ্‌ফরমাস!

বুঝতে পাচ্ছি বটে, এখন থেকে আমাদের একটু সাবধান হয়ে নিজেদের বাঁচাতে হবে।

আর সাবধান! এ এগুলে ভেড়ের ভেড়ে পেছুলে নির্ব্বংশ! ভায়া, দেখ্‌ছ কি আর? সরে পড়ো। বাঙ্‌লা ছেড়ে কোথায় বা যাবে? অন্ততঃ সাতগড়া থেকে পালাও। নচেৎ, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হবে, পিতৃ-পুরুষ নরকস্থ হবেন।

আহা তুমি যে পাগল হয়ে গেলে দেখছি একেবারে! এক নিঃশ্বাসে অতটা ভেবে ফেলছ কেন? হাজারই হোক্, কুমার যদুনারায়ণ ব্রাহ্মণ-সন্তান, বিশেষ রাণী ত্রিপুরাদেবী যাঁর গর্ভধারিণী, তিনি যে হিন্দুর প্রতি একেবারেই উদাসীন হবেন, আমার কিন্তু—

ভায়া হে, ও তে আর কিন্তু-ফিন্তু নেই বুঝলে কিনা? মোহ—মোহ—মোহ বড় ভয়ানক জিনিষ!

মোহ! কিসের মোহ? ঐশ্বর্য্যের, প্রতিপত্তির না সাম্রাজ্যের?

না হে বন্ধু তা নয়। ভাদুড়ীচক্রের রাজকুমার, কুমারই বা কেন বলি, আজ ত অধীশ্বর। তাঁর পক্ষে তার কোনোটী বিশেষ কিছু লোভনীয় নয়। হলেও সেগুলি তাঁর মুটোর মধ্যে। এ মোহ রূপের—প্রেমের—

সেকি!

তাই।

বলো কি!

আমি শুধু বলছি না, এ গৌড়ব্যাপী জনরব।

ভায়া, প্রকৃতিস্থ ত!

ওহে, কথাটা একটু সমঝে বলো।

এখানে এই আমরা চারজন মাত্র, তাই বলছি। রাজার মৃত্যুর পর হতেই এ গুজবটা খুব জোর চলেছে। আমীর-ওমরার মধ্যেও একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

হেতু? প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা ত কুমারের সম্পূর্ণই আছে!

আরে খেই হারাও কেন ভায়া!

হ্যাঁ-হ্যাঁ মোহের কথা কি বলছিলে? একটু খুলেই বলনা হে!

খুব আস্তে—

সাহজাদী আশমানতারার নামটা অবশ্য শুনেছ?

হাঁ হাঁ আজিমখাঁর কন্যা, অপূর্ব্ব সুন্দরী—শুনেছি, গুণবতীও বটে।

সে—ই!

রাজা অবনীনাথ জানেন? রাণী?

বোধ হয়—না।

ভয়ানক কথা! বল কি অ্যাঁ! কিন্তু কি করে হবে? রাজা অবনীনাথের কন্যা, তিনিও ত অনিন্দ্যসুন্দরা, স্বয়ং লক্ষ্মী বল্লেও হয়।

ভায়া, কাব্যশাস্ত্র ত পড়্লে না,—কেবল কং নমঃ—খং নমঃ করেই বেড়ালে!

তবু জাতি-বৈষম্যের বিষয় ত একটা—

রেখে দাও তোমার জাতি-বৈষম্য। অমন পরাশর মুনির মুণ্ডু ঘুরে গেল!

তার পর আর কি শুনেছ?

ঐ পর্য্যন্তই শুনেছি;—কুমার আশমানতারার প্রেমে পড়েছেন।

চুপ্ চুপ্—ভশ্চায্যিমশায় পিছনে আস্ছেন। কতক্ষণ পিছু নিয়েছেন,—কি জানি,—হয়ত সব শুন্তে পেয়েছেন।

না হে না,—অনেকটা তফাতে আছেন। আমি আগেই টের পেয়েছি। বোধ হয়, শুন্তে পান নি। আর পেলেই বা কি?—এ কথা একটু কাণে যাওয়াও দরকার।

ওহে চলো,—চলো এই পথ দিয়ে—

তখন সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়। ভূতভাবন তর্কনিধি, বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ, গদাধর বেদান্ত-রত্ন ও রামরাঘব ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্য প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সংকীর্ণ পথে চলিয়া গেলেন। আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত নীতিজ্ঞ কালীকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগকে একবার আহ্বান করিবেন ভাবিলেন, কিন্তু আবার কি বুঝিয়া নিরস্ত হইলেন ও বিমর্ষভাবে গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

২

প্রথম খণ্ডে বর্ণিত ঘটনার পর বহুদিন গত হইয়াছে। রাজা গণেশনারায়ণ লোকান্তরিত হইয়াছেন। যদিও তিনি ভাবি-সম্রাটের প্রতিভূ-স্বরূপ গৌড়-সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন, সম্রাটের যাহা কিছু প্রাধান্য বা প্রতিপত্তি, তাহা তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে অতি সহজেই পাইয়াছিলেন,—শুধু সম্রাট্ এই খেতাবটুকু গ্রহণ করেন নাই, এই পর্য্যন্ত। তাঁহার সুশাসনে, নিরপেক্ষ শিষ্ট ব্যবহারে, মুসলমান নেতৃবৃন্দ এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তৎকালে সম্রাট-নির্ব্বাচন তাঁহারা নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়াই বোধ করিতেন। সাহজাদা আজিমের একমাত্র কন্যা আশমানতারা। মুসলমান-শাস্ত্রানুসারে নারী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয় না। সাহজাদা নসেরিং নিঃসন্তান। সুতরাং, এই সম্রাট-নির্ব্বাচন লইয়া পাছে কোনও প্রকার মতদ্বৈধের উদ্ভব হয় ও তাহাতে এমন সুশৃঙ্খলতাপূর্ণ শান্তি, এমন নিরাবিল, নিস্তরঙ্গ এক-প্রাণতা বিনষ্ট হইয়া যায়, এই ভাবিয়া তাঁহারা উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন পর্য্যন্ত করিতে বিরত থাকিতেন। রাজা দেখিলেন, আশমানতারার গর্ভজ পুত্রই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। সময়-সাপেক্ষ হইলেও, তাহার জন্য প্রতীক্ষা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তাঁহার দৃষ্টিও কাসেম খাঁর উপর পড়িয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বুদ্ধিমত্তায়, অভিজাত্যে বা রূপৈশ্বর্য্যে একমাত্র কাসেম খাঁই সর্ব্বসুলক্ষণবতী আজিমকন্যার যোগ্যপাত্র। কিন্তু তাহার অতিরিক্ত জাত্যভিমান, ধর্ম্মান্ধতাও অত্যন্ত প্রবল। এই মিলনের ফলে, হিন্দু-মুসলমানে যে সম্প্রীতি জাতি-নির্ব্বিশেষ বিচারের বায়ু-সংস্পর্শে ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইতেছে, হয়ত তাহাতে নানাবিধ অন্তরায় উপস্থিত

হইবে। তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। তবে কাসেমখাঁকেই আশমানের স্বামী-নির্ব্বাচন যুক্তিসঙ্গত—আজই নয়, কিছু দিন পরে। কাসেমের হৃদয় আছে। সেই হৃদয়কে হিন্দুর পানে টানিয়া আনিতে হইবে, সৌজন্যের আকর্ষণে। তাহাকে বুঝাইতে হইবে, শুধু বাঙ্গালার কেন, সমগ্র ভারতের যে অবস্থা, তাহাতে ভূমি-সম্পর্কে জাতীয়ত্বের সীমা-নির্দ্দেশই সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলার ও সমৃদ্ধি-সাধনের একমাত্র উপায়। প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য এক। পন্থা বিভিন্ন হইলেও, রীতি-নীতি বিভিন্ন হইলেও, প্রতি ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট বস্তু এক এবং অদ্বিতীয়। শুধু কথায় নয়,—কার্য্যে, শুধু কাসেমকে নয়,—কাসেমের প্রতি স্ব-ধর্ম্মীকে ইহাই দেখাইতে হইবে। তাহার পর, যখন তাহারা হিন্দুকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে নিজেরাই লজ্জিত হইবে, সেই সময় আশমান কাসেমখাঁর হস্তে অর্পিত হইলে সার্থক হইবে। তিনি জানিতেন, আজিমের শিক্ষায় ও তদনুস্থত গুণে আশমানতারা হিন্দুর পক্ষপাতিনী। সুতরাং, তখন মিলনের পরেও যদি কিছু বৈসাদৃশ্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা ঐ ঔদার্য্যময়ী বালার সংশ্রবে ঘুচিয়া যাইবে এবং ঐ মিলনজ সন্তান যেদিন গৌড়ের শাসন-দণ্ড স্বহস্তে ধারণ করিবে, সেইদিন হইতে প্রতিনিধির আর কোনও প্রয়োজন হইবে না, তিনি স্বরাজ্যে গিয়া নিশ্চিন্তমনে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিবেন। এই ভাবিয়াই রাজা গণেশ সম্রাট্-নির্ব্বাচনের কোনও প্রসঙ্গই তুলিতেন না।

নিরুদ্বেগে রাজকার্য্য চলিতে লাগিল। রাজা কাসেম খাঁকে অপত্যবৎ স্নেহ করিতেন, কাসেমখাঁও অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করিতেন। হারেমে যদুনারায়ণের ন্যায় কাসেমখাঁর অবারিত গতি। কাসেমখাঁ সেনাপতি, কিন্তু মন্ত্রণাসভায়, বিচারকার্য্যে কাসেম যদুনারায়ণের পার্শ্বেই তুল্যাসনে উপবিষ্ট। অন্যান্য উজিরগণ কাসেমের

সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হইতেন, আবার হিন্দু-প্রতিনিধির মুসলমানের প্রতি আকর্ষণের কথা স্মরণ করিয়া এবং তৎসহ কাসেম খাঁর পটুতার বিষয় বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার প্রতিষ্ঠা যৌক্তিক বলিয়াও স্বীকার করিতেন। প্রতি অনুষ্ঠানে রাজা যেমন যদুর পরামর্শ লইতেন, তেমনই কাসেমখাঁকেও জিজ্ঞাসা করিতেন। কোথাও ত্রুটী নাই, কোনও দিকে বিচ্যুতি নাই। একদিকে হিন্দুর উৎসব, অন্য দিকে মুসলমানের আনন্দ-কোলাহল! গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, মন্দিরে মন্দিরে, মসজিদে মসজিদে এক অভিনব মিলনের—ঐক্যের—সাম্যের সংবাদ ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল!

কিন্তু কাসেমখাঁর ভাগ্যে এই সাম্যের অভিনয়ে যোগদান বেশী দিন ঘটিল না। কিছুদিনের মধ্যেই আবার তাঁহাকে সমর-ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল। গৌড়-সম্রাটের মৃত্যু ও তৎপুত্রদ্বয়ের আত্ম-কলহের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, তৎকালীন দিল্লী-সম্রাট্ অনতিবিলম্বে গৌড় আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। গৌড়ের প্রতাপ তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং, যথোপযুক্ত যুদ্ধ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে কিছু সময় লাগিল এবং সুদূর হিন্দুস্থান হইতে গৌড়-সীমান্তে পৌঁছিতেও নিতান্ত কম কালক্ষেপ হইল না। যথাসময়ে দিল্লী-বাহিনীর আগমনবার্ত্তা গণেশ-নারায়ণের কর্ণগোচর হইল। তিনি সেনাপতি কাসেমখাঁকে অচিরে অগ্রসর হইয়া, দিল্লী-সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

কাসেমখাঁর দুর্দ্দম্য সেনা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইতে, দিল্লী-সেনা তাহাদের অধিকার-সীমান্তে কুৎ গাড়িয়া বসিল। মধ্যে মধ্যে খণ্ড-যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কাসেমখাঁ সংবাদ দিলেন, যেরূপ দেখিতেছি

তাহাতে যুদ্ধ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইবে। তবে ভাবনার কারণ নাই, পরাক্রমে আমাদের সেনা দিল্লী-সেনা অপেক্ষা বলীয়ান্। দিল্লীশ্বরকে গৌড়-সীমানা মাড়াইতে দিব না, ইহা নিশ্চয়। দেখি, কতদিন তিনি সেই সুদূর দিল্লী হইতে রসদ যোগাইতে পারেন, পারিলেও বর্ষা নামিলে সব বুদ্ধি ফুরাইবে। রাজা চিন্তিত হইলেন না, কাসেমখাঁকে উৎসাহ-সূচক পত্র দিলেন ও কুমারকে আপাততঃ সৈন্যাধ্যক্ষের আসনে নিয়োজিত করিয়া রাজ-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহারই কুশলতায় উক্ত যুদ্ধ-জনিত কোনও প্রকার চাঞ্চল্য প্রজা-পুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।

বলা বাহুল্য, আজিম সাহের সমাধি-মন্দিরে যদুনারায়ণের কণ্ঠে আশমানতারার মাল্যদান-ব্যাপার, রাজা কিছুই অবগত ছিলেন না। তবে এই মাত্র জানিতেন, আশমান যদুর প্রতি একটু অনুরক্ত, সে অনুরাগ কৃতজ্ঞতার নামান্তর-মাত্র, অন্য কিছুই নহে। তিনি কুমারকে পুনঃ পুনঃ বলিতেন ;—দেখো, বাদসা-পরিবার বড় ভীত হয়ে, অতি সঙ্কোচে অবস্থান কচ্ছে। তারা যেন ঠিকভাবে আমাদের উপর নির্ভর কত্তে পার্চ্ছেনা। অতি সাবধানে আমাদের বিশ্বাস সংগ্রহ কত্তে হবে। একটু ত্রুটীতে, একটু ঔদাস্যে, সামান্য অমায়িকতার অভাবে আমরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবো, এইটুকু যেন মনে থাকে। আজিম জীবিত থাকলে কোনও কথাই ছিল না। এখন আমাদের দায়িত্ব বড় কঠিন, খুব বুঝে চলতে হবে। কুমারও তাহা বুঝিতেন, পিতার উপদেশ অনুসরণ করিতে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। ফলে, বাদসাহ-পরিবার-মধ্যে তাঁহার পুত্রাধিক আদর ছিল। আর আশমানতারার নিকটে? সেই লাবণ্যময়ী আজিম-দুহিতার নিকট হইতে তিনি যাহা পাইতেন,

স্পৃহা যে কি প্রথমে তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। অথবা প্রথমে যাহা স্থির করিয়াছিলেন, এখন বুঝিয়াছেন, তাহা শুধু তাহা নয়, আরও কিছু। প্রথমে ভাবিতেন, পিতৃহীনা বালার আনুগত্য পিতৃশত্রু-নিধন-জনিত। সুতরাং, সে আনুগত্যে তাঁহারও চিত্ত-প্রসাদ যে কম জন্মিত, তাহা নহে। যখন সেই সেবারতা সুন্দরী বালিকা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া, ব্যজন করিতে করিতে প্রায়ই বাষ্পাকুল নেত্রে, তাহার পিতার হিন্দু-প্রীতি, তাহার প্রতি অত্যধিক স্নেহ-বৎসলতা, তাঁহার অভাপ্সিত রাজ্য-শাসন-প্রণালী ইত্যাদি বিষয় অকপটে বর্ণনা করিত, তখন কুমার নিষ্পলক নেত্রে তাহার সেই বিষাদ-কাহিনী বিভোর হইয়া শ্রবণ করিতেন। তাহার করুণ-মধুর, মার্জ্জিত মন্তব্য শুনিয়া বুঝিতেন, অদ্ভুত এ বালা! রূপ-সম্পদের সহিত গুণ-সম্পদের কি সুন্দর সমবায় এই যুবতী! ধন্য বিধাতা, বিচিত্র রচনা! এই পর্য্যন্ত ভাবিয়াই, এই অবধি বুঝিয়াই তিনি নিরস্ত হইতেন।

কিন্তু সেই দিনের সেই ব্যাপার হইতে তাঁহার সব গোল হইয়া গিয়াছে! যাহা অপ্রত্যাশিত, স্বপ্নেরও অগোচর, তাহাই হইল! এ প্রহেলিকা নয়ত কি? তিনি হিন্দু, বিবাহিত, পুত্রের পিতা। আজ একি বিসদৃশ ব্যাপার ঘটিতে চলিল! কিন্তু এ ত খেয়াল বা সাময়িক উত্তেজনা নয়, নাকি দৈব-নির্দ্দেশ! আশমানতারার ন্যায় নারীর প্রার্থনা পিতার সমাধি-মন্দিরে, সদ্য-ক্ষান্ত-অশ্রু-সিক্ত লোচনে! একি রহস্য! একি ভীষণ পরীক্ষা! যদুনারায়ণ আজ দিগ্‌ভ্রান্ত! এত বড় বীরের হৃদয় আজ চিন্তা-চঞ্চল! কি কর্ত্তব্য—কি প্রতিকার?

কুমার দিন-কতক বেগম-মহলে গেলেন না। অনিবার্য্য কর্ত্তব্যের খাতিরে শুধু যেখানে না গেলে নয় সেইখানে গিয়া, কার্য্যান্তে নিজ

কক্ষে বসিয়া নির্জনে আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও যুক্তি, কোনও পন্থাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই যেন তাহা অসীম অনন্ত হইয়া উঠিতে লাগিল! কাহার সহিত পরামর্শ করিবেন? কে তাঁহাকে সদ্‌যুক্তি দিবে? এ বিষয়ে নিরপেক্ষ মন্তব্য প্রকাশ করা হিন্দু মুসলমান কোনও বন্ধুরই সাধ্য নহে। কি ভীষণ সমস্যা! অন্যের সহায়তায় এ সমস্যা-জাল ছিন্ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তথাপি উহা ছিন্ন করিতেই হইবে। আজ এই সাম্য-প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালেই আকাশ ঘনাচ্ছন্ন, এমন কোন্ দক্ষিণা বাতাস বহাইতে হইবে, যাহাতে উক্ত মহদনুষ্ঠান পণ্ড না হয়?

তিনি বুঝিলেন, এ ভাব-বিপর্য্যয় অন্যের গোচর করিয়া বর্ত্তমানে লাভ কি? তাহা অরণ্যে রোদন বই ত নয়! অধিকন্তু, তৎসূত্রে নিত্যকর্ম্মে শৈথিল্য দেখিয়া অনেকে অনেক ভাব পোষণ করিতে পারে। তিনি আবার নিয়মিত রূপে বেগম-মহলে যাইতে আরম্ভ করিলেন। আশমানতারার সহিত সাক্ষাতেরও ত্রুটী করিলেন না। আশ্চর্য্য! আশমানতারাও তাঁহাকে পূর্ব্বের মতই আদর-যত্ন করিতে লাগিল! মাত্র অধিক দিন পরিচয়ে যেমন পরস্পরের সম্মান-সূচক শব্দগুলি সম-সম্বন্ধবাচক শব্দে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাই হইল; তাহা ততটা বিসদৃশ ঠেকিল না—কাহারও না।

আশমানতারার নিকট হইতে তিনি আর একটী জিনিষ উপভোগ করিবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সেটী আশমানের কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত সুধা! সেই যে জ্যোৎস্না-হসিত সৌধের সুরভিত-স্নিগ্ধা-লোকোজ্জ্বল সমাধি-পার্শ্বে বিয়োগ-বিধুরার করুণ-গীতি, এত বড় একটা ঝঞ্ঝা-বাতের মধ্যে পড়িয়াও তিনি তাহা স্মৃতি হইতে মুছিতে পারেন নাই। যদুনারায়ণ যখন আসিতেন—ইদানীং সৈন্যাধ্যক্ষ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে

যদিও তত বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিতেন না,—সেই অল্প অবসরেই তিনি আশমানতারার দুই একটী গান না শুনিয়া যাইতেন না। কিন্তু সে সঙ্গীতে লালসার উদ্দীপনা ছিল না; চিত্ত-বিকারের ইন্ধন সে সঙ্গীতে যোগাইত না। তাহাতে মধুর বিভু-প্রেম, উদার বিশ্ব-প্রীতি ও নিষ্কাম প্রেমের কত দুর্লভ ভাব-সম্পদ নিহিত থাকিত। আশমান সারঙ্গ বাজাইয়া ভাব-বিভোর কণ্ঠে গাহিত, আর যদুনারায়ণ বিভোর হইয়া শুনিতেন। তখন যেন সমাজের ভ্রূকুটী, চিন্তার দংশন কিছুই অন্তরে স্থান পাইত না। তাঁহার অন্তর্নিহিত অপ্রকাশ্য বহ্নি যেন সেই সঙ্গীত-মন্দাকিনীর পূত নিষেকে নির্ব্বাণ হইয়া যাইত। সেই সময় তিনি আশমানতারার পানে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন, আর তাহাকে বীণাধারিণী দেববালা পরিকল্পনা করিয়া, কি এক অনবদ্য মাধুর্য্যে বিমূঢ় হইয়া পড়িতেন! ইহাও এক আকর্ষণ বই কি?

কিন্তু যখনই অকৃতজ্ঞতার তিল চিহ্ন প্রকাশ পাইত, তখনই কি এক অব্যক্ত দুঃসহ যন্ত্রণায় কুমার ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন,—অমনি পিতার সম্মতি লইয়া সাতগড়া পানে ছুটিতেন এবং মাতা ত্রিপুরাদেবীর চরণ-বন্দনা করিয়া, প্রিয়তমা নবকিশোরীর প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া, নবকুমার অনুপনারায়ণকে বক্ষে ধরিয়া তাঁহার সেই বিধুরতার কথঞ্চিৎ উপশান্তি করিতেন। কিন্তু তবু যেন বোধ করিতেন,—সেই প্রীতি-ব্যবহারের মধ্যে কত কপটতা, কত ছলনা! তাঁহারা কিছুই জানিতেন না,—বুঝিতেও পারিতেন না,—তিনিই শুধু শিহরিয়া উঠিতেন! নবকিশোরীর পানে চাহিতেই যেন তাঁহার দৃষ্টি নত হইয়া পড়িত, যেন কত সঙ্কোচ আসিয়া, তাঁহার প্রতি কার্য্যে শুধু শঠতা ইহাই প্রচার করিয়া যাইত! তিনি নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে কিশোরীকে বুকে জড়াইয়া

ধরিতেন,—আনন্দ-দুলালটীর কোমল গণ্ডে অসংখ্য চুম্ব দান করিতেন। দেখিতে দেখিতে দিন ফুরাইত, সকলের অজ্ঞাতসারে আবার সেই চিন্তার বোঝাটী লইয়া গৌড়ে ফিরিতেন। এ এক প্রকার অপরাধীর জীবন, বড় ভয়ানক শাস্তি! কুমার স্থৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হৃদয়ে তুফান,—বাহিরে প্রশান্তি রক্ষা কতটা কঠিন!

এইভাবে বহুদিন গত হইল,—রাজা গণেশনারায়ণেরও কাল পূর্ণ হইল,—সেদিকে গৌড়-সীমান্তে কাসেম খাঁর যুদ্ধও শেষ হইল। দিল্লী-সেনা ব্যর্থ-কাম হইয়া ছাউনী উঠাইয়া চলিয়া গেল। সেনাপতি কাসেম খাঁ আর কোনও গোলমালের সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া রাজধানী অভিমুখে রওনার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু বিজয়ের শুভ সংবাদ রাজার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তিনি পাণ্ডুয়াতে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। গৌড়ে আনন্দের ভেরী-নিনাদ সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল।

কুমার পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ান্তে সাতগড়ায় আসিলেন ও যথাযোগ্য সমারোহে পরমারাধ্যের শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সমস্ত বাঙ্গালা নিমন্ত্রিত হইল। শুধু হিন্দু নয়, সমস্ত মুসলমান-সমাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই শ্রাদ্ধ-বাসরে সাতগড়ায় উপনীত হইলেন। প্রত্যেক জাতির যথা-রীতি আহার্য্য ও আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা হইল। শতমুখে প্রশংসা-বাদ, দীনদুঃখীর আশীর্ব্বাণী বাঙ্গালার আকাশ মুখর করিয়া তুলিল। মহারাজ গণেশনারায়ণ খাঁ মৃত;—গৌড়-নগরী এক পক্ষ ধরিয়া শোক-বাস পরিয়া রহিল। সকলেই ম্রিয়মাণ। মসজিদে মসজিদে মৃত মহাত্মার সদ্গতি-কামনায় নিয়মিত উপাসনা চলিল। কোনও হিন্দু নরপতির অবসানে, কোনও মুসলমান-সমাজ এভাবে আর কখনও শোক-প্রকাশ ও সম্মান-প্রদর্শন করে নাই।

৩

ক্রমে শোক-স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিল। শ্রাদ্ধান্তে যদুনারায়ণ সাতগড়া হইতে গৌড়ে আসিলেন।

মানবের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম, এক অবস্থায় সে চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না। যদুনারায়ণ রাজ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন,—কার্য্যও চলিতে লাগিল। কিন্তু একদিন পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পিতা যে ভাবে রাজ্য চালনা করিয়া গিয়াছেন, সে ভাবে তাঁহার দ্বারা রাজ-কার্য্য চালিত হইলে মুসলমান-সমাজ তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন। চিরদিন হিন্দুর কর্ত্তৃত্বাধীনে মুসলমান-সাম্রাজ্য পরিচালিত হইলে, মুসলমান-জাতির বৈশিষ্ট্যে আঘাত করে। অবশ্য, শীঘ্রই যে তাঁহারা আমূল পরিবর্ত্তন চাহিতেছেন, তাহা নহে, ক্রমশঃ মুসলমান প্রাধান্য যাহাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়, তাহার জন্য মুসলমান অগ্রণিগণ এখন হইতে সচেষ্ট হইতেছেন।

যদুনারায়ণ দেখিলেন,—মন্তব্য যুক্তিযুক্ত এবং যাহাতে সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়, সেজন্য তৎপর হওয়া আশু কর্ত্তব্য। নতুবা, এই মতবাদের অগ্নিকণা ফুৎকারে ফুৎকারে ইন্ধন-সহযোগে প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহাতে সাম্যের সৌধ ভস্মসাৎ ত হইবেই, অধিকন্তু, রাজা গণেশনারায়ণ যে শুধু আত্ম-প্রাধান্যের উদ্দেশ্যে, প্রতিনিধির মুখোস পরিয়া, সাম্যের ছলনায় মুসলমান-জাতিকে প্রবঞ্চিত করিতে চেষ্টিত ছিলেন, এই মিথ্যা কলঙ্ক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরতরে অঙ্কিত থাকিবে। কিন্তু উপায় কি? যদিও সাম্যের কার্য্য চলিয়াছে, কিন্তু তাহা ত এখনও প্রতি হিন্দু মুসলমানের চিত্তে পূর্ণভাবে আসন পাতিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও হিন্দু মুসলমান দেখিলে ঘৃণা করে, মুসলমান হিন্দুকে দেখিলে

বিদ্রূপ করে। কত প্রকার চেষ্টা চলিতেছে, উক্ত অভিযোগে অভি-
যুক্ত বহু অপরাধী শাস্তি পাইতেছে, তথাপি নিবৃত্তি নাই। তিনি
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন,—উচ্চবংশীয় মুসলমান-সম্প্রদায় যদিও
বাহ্যতঃ সাম্যের পরিপোষক,—তাহা হইলেও, তাঁহারা অন্তরে অন্তরে নিজ
জাতির প্রতি অন্ধভাবে পক্ষপাতী। কাসেম খাঁর ন্যায় বীর, রাজনীতিজ্ঞ
আজিও হিন্দু-মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখিতে পারিলেন না! এরূপ
অবস্থায় মুসলমান-হস্তে রাজ্য-শাসন ন্যস্ত হইলে, হিন্দুর দুর্গতির সীমা
থাকিবে না;—হয়ত, আবার সেই অন্তর্বিরোধ হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ
সমুপস্থিত করিবে,—সুপ্রতিষ্ঠিত গৌড়-সাম্রাজ্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে। শাসন-দণ্ড
হস্তান্তরের এখনও সময় আসে নাই।

তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন,—গৌড়ের ভাবী-সম্রাট্ আশমান-
তারার গর্ভে! কি ভয়ানক কথা! এতদিন একপ্রকারে চলিয়াছে,—
আর ত চলে না। আশমান পূর্ণযুবতী, বিবাহযোগ্যা; মুসলমান-সমাজ
আর প্রতীক্ষা করিবে কেন? কিন্তু কে সে? না, সে জিজ্ঞাসার উত্তর
ত অগ্রেই হইয়া গিয়াছে! কি স্থির প্রতিজ্ঞা, কি অগাধ বিশ্বাস! আশমান
বাস্তবিক অপূর্ব্ব নারী-সম্পদ! কিন্তু কিশোরী? আহা সে যে জাহ্নবী-বারি-
নিষিক্ত দেব-ভোগ্য-সুরভি ফুল্ল-শতদল! আর আশমান? সেও ত কম নয়,
সে যে অমরার পারিজাত! কেহই ত অবহেলার নয়! কিন্তু ঘোর
প্রতিবন্ধ, দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান! দুইটী এক হৃদয়ে!—না না সে কি হয়! হিন্দু
তাহা পারে না। দুই কুল রক্ষার কি কোনও উপায় নাই?

যদুনারায়ণ কিনারা খুঁজিয়া পাইলেন না। নিতান্ত বিকল চিত্তে
একদিন আশমানতারার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

প্রাবৃটের প্রারম্ভ। আকাশ ঘনজালাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সন্ধ্যার

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ঈষচ্চঞ্চল সমীরণ হতাশ প্রেমিকের নিঃশ্বাসের ন্যায় বহিয়া যাইতেছিল। যতুনারায়ণ আশমানতারার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রুদ্ধ-বাতায়ন প্রকোষ্ঠে স্বর্ণাধারে দীপবর্ত্তিকা জ্বলিতেছে। আশমান তৎপার্শ্বে বসিয়া একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিল। কি সুন্দর দৃশ্য! বাহিরে ভৌতিক লীলার বিভীষিকা,—আর কক্ষ-মধ্যে একি কম-সৌন্দর্য্যের ঘটা! হীরক-খচিত কনক-ভূষণে আলোক-সম্পাত, দ্যুতি-বিচ্ছুরিত। জ্যোতির্ম্ময়ী বালা; আরক্তিম গণ্ডে, স্বেদ-সিক্ত চূর্ণ-চিকুর-লাঞ্ছিত অপ্রসর ভালতটে, নীলপদ্মপলাশসন্নিভ ঈষন্নত-সংকীর্ণ নেত্রযুগলে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য! যতুনারায়ণ আবিষ্টচিত্তে সেই রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আশমান পাঠ-নিরতা—তদ্গতচিত্তা। যতুনারায়ণের দ্বারোদ্ঘাটনের মৃদু শব্দে সে যোগ ভাঙ্গে নাই।

যতুনারায়ণ ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া ডাকিলেন,—আশমান্!

আশমানতারা চমকিত হইল। পরে স্রস্ত-বসন সংযত করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া কুমারকে আসনদান করিল ও গ্রন্থখানি যথাস্থানে রাখিয়া, কুমারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

কুমার ক্ষণকাল নীরব। পরে শান্তস্বরে বলিলেন;—আশমান, জান আজ আমি কি জন্য এসেছি?

আশমান একবার কুমারের মুখপানে চাহিল ও পরে বলিল;—জানি।

কেন বল দেখি?

কর্ত্তব্য স্থির কত্তে।

হাঁ তাই।

কিন্তু কর্ত্তব্য ত আগেই স্থির হয়ে গেছে।

যদু বলিলেন ;—সে ত তোমার,—এখন আমার কর্ত্তব্য কি ?

আশমানতারা গম্ভীর ভাবে বলিল ;—তার উত্তর দেওয়ার সাধ্য কি আমার আছে ? হিন্দু-মুসলমানে সাম্যের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে ব্রতী তুমি, এত বড় দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে বহন কচ্ছ যে তুমি,—তোমাকে আমি কি বল্‌বো ? তোমার হৃদয়ই তোমার কর্ত্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলবে।

যদুনারায়ণ গাত্রোত্থান করিয়া কক্ষতলে পাদ-চারণা করিতে করিতে বলিলেন ;—গৌড়ের আকাশ মেঘ-সঙ্কুল,—ঝড় উঠতে পারে।

আশমান বলিল ;—কিন্তু আমার বিশ্বাস,—তুমি তার প্রতিবিধান কত্তে সম্পূর্ণ সমর্থ।

যদু চিন্তিতভাবে বলিলেন,—পার্ত্তাম—কিন্তু বড় বিঘ্ন।

আশমান প্রতিবাদ করিল ;—কি বিঘ্ন ? তোমার বিঘ্ন ! হতেই পারে না।

যদু চঞ্চল কণ্ঠে—আশমান, তুমি আমাকে—এই পর্য্যন্ত বলিতেই আশমান জবাব দিল ;—সে বিধি-নির্দ্দেশ, সে শুভ।

যদু বিপন্নভাবে বলিলেন ;—আমি হিন্দু এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন আশমান !—গৌড়ের ভাবী সম্রাট্ যে তোমার গর্ভজ সন্তান !

আশমান স্থির ভাবে উত্তর দিল ;—আমাদের উদ্দেশ্য হিন্দু-মুসলমানে মিলন। বিধাতার বা আমার পিতার উদ্দেশ্যও তাই।

ক্ষণকাল চুপ্ করিয়া থাকিয়া আশমান আবার বলিল ;—আমাদের মিলনেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে,— আমাদেরই সন্তান গৌড়ের ভাবী সম্রাট্ !

যদু ক্ষণকাল পরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন ;—হুঁ—কিন্তু সমাজ ?

আশমান অমনি উত্তর দিল ;—সমাজ ? সমাজ চিরকাল এক থাক্‌তে পারে না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে তার সংস্কার চাই। সাম্যের

উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই সমাজ স্থায়ী। আমরা সেই সমাজ প্রতিষ্ঠা কর্ব্বো।

যদু বলিলেন,—বল্‌ছ বটে, কিন্তু তা ততটা সহজ নয়,—এতে বিপ্লব হবে।

আশমান উত্তর দিল;—হতে পারে,—কিন্তু সে বিপ্লবে অন্ততঃ তোমার ন্যায় বীরের বিচলিত হওয়া কি ঠিক!

যদুনারায়ণ নীরব। কক্ষ স্তব্ধ। কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া যদু বলিলেন;—আশমান এখনো উপায় আছে। চিত্ত স্থির করো।

আশমান মুক্তকণ্ঠে বলিল;—অন্য উপায় কিছুই নেই।

যদুনারায়ণ আকুলভাবে তবু বলিলেন;—আশমান্ ফিরে যাও.—সে পথ বড় বিঘ্ন-বহুল, উভয়ে বড় বিপন্ন হয়ে পড়বো,—এখনো তুমি আমাকে ত্যাগ করো। স্রোতের প্রতিকূলে গিয়ে কায নেই।

আশমান আর পারিল না, সে অভিমান-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল;—কুমার! জান্‌লাম,—আমি বড় হতভাগিনী,—এই অবধি বলিতেই তাহার চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল, সে চুপ করিল। কক্ষ আবার স্তব্ধ।

যদুনারায়ণ সহসা মেঘ-গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন;—আশমান, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করো। সাম্যের প্রতিষ্ঠা বিধি-নির্দ্দেশ, সেটা না বুঝে শুধু আমি স্বার্থের উপর ঝুঁকে পড়ে বড়ই ভুল কাজ কচ্ছি। এ যে ধর্ম্ম-সংস্থাপন!—এতে ত্যাগ চাই,—আত্মোৎসর্গ চাই। এক দেশ-মাতৃকার সমস্ত সন্তানকে এক প্রেম-তন্ত্রীতে বাঁধতে হলে, লোকের মন্তব্য,—সমাজের মন্তব্য মান্‌তে গেলে চল্‌বে না। প্রতি জাতি, প্রতি সমাজের সমক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাতে হবে,—প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা হৃদয়ের জিনিস। হৃদয়ের মিলন চাই,—প্রাণের মিলন চাই।

জাতির বৈষম্য, সমাজের বিকার, লোকাচারের ভ্রূকুটী দূরে পড়ে থাকবে, নূতন জগৎ প্রতিষ্ঠিত হবে। আশমান্, আমি তোমাকে গ্রহণ কল্লাম,—তুমিই আমার এ মহাব্রতের যোগ্য সঙ্গিনী। আজ তুমি তোমার মাল্যের প্রতিদান গ্রহণ করো।

এই বলিয়া যদুনারায়ণ,—কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত যদুনারায়ণ, নিজ অঙ্গুলী হইতে হীরকাঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিয়া আশমানতারার বাম হাতের মধ্যমাঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন! আর—আর—আর আশমানকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া, তাহার সেই আরক্ত গণ্ডদেশ অসংখ্য চুম্বনে আরও রাঙাইয়া তুলিলেন!

প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত হইতেছে। গুরু গুরু মেঘ-গর্জ্জন, ব্যাত্যা-বিক্ষোভে প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান-বীথি পর্য্যুদস্ত হইতেছে। অদূরে মহানন্দার বীচি-বিহ্বল কল-নাদ। প্রকৃতির এই উদ্দাম নর্ত্তনের মুহূর্ত্তে উন্মত্ত যদুনারায়ণ আশমানতারার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ঠিক তাহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটী স্ত্রীলোক ঝটিতি দ্বার হইতে সরিয়া গেল। নসেরিং বেগমের পরিচারিকা নয়!

কুমার কিছুই লক্ষ্য করিলেন না!

—*—

৪

কালীকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেদিন সন্ধ্যাকালে পণ্ডিত-চতুষ্টয়ের কথোপকথন শুনিয়া আসিয়া, রাজা অবনীনাথের নিকট সমস্ত বলিলেন। ইঁহারা দুইজনই সেই সময় মুসলমানকে সাহায্য না করার জন্য পুনঃ পুনঃ পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করার কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু যে ভাবে উহা ফলিবে বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, সে ভাবে না ফলিয়া বরং আরও বীভৎসতাপূর্ণ বিপরীত ভাবে ফলিতে চলিল, এই ভাবিয়া তাঁহারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। প্রথমে স্থির করিলেন, এ বিষয় রাণী ত্রিপুরাদেবীকে অবগত করান কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি বর্ত্তমানে স্বামীশোকে একান্ত অধীরা। এই অপবাদ-কাহিনী সেই তেজস্বিনী রমণীকে হয়ত ভয়ঙ্করী করিয়া তুলিবে। শুধু জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া একটা অনর্থপাতের সৃষ্টি করা তাঁহারা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বুঝিলেন না। সুতরাং, উভয়েই নীরবে অপবাদের সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে যদুনারায়ণ সাতগড়ায় আসিলেন। তিনি গভীর চিন্তামগ্ন। দর্পণ-সদৃশ উজ্জ্বল ললাটে কুঞ্চন-রেখা; অক্ষিপ্রান্তে কালিমার বেষ্টনী; চাহনি প্রখর, কঠোরতার কটাক্ষে ভীষণ, স্ফুলিঙ্গবৎ। উভয়েই সে মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিলেন,—অবনীনাথ বিরক্তও হইলেন।

সেইদিনই যদুনারায়ণ বিক্রমপুর, পূর্ব্বস্থলী, নবদ্বীপ প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের পীঠস্থলে সংবাদ প্রেরণ করিলেন,—তত্রত্য স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যগণের সপ্তদুর্গায় উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়; কোনও এক জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁহদের আহ্বান। পণ্ডিতগণের পাথেয়াদির ব্যবস্থা

হইল। সন্দেহ ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। হঠাৎ পণ্ডিতমণ্ডলী কেন? যাহা হউক, রাজা অবনীনাথ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতগণের আহ্বান-কথা রাণী ত্রিপুরাদেবীরও কর্ণগোচর হইল; তিনি ৺ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে আহ্নিক-কৃত্য করিতে গিয়া শুনিয়া আসিলেন। তিনি নিজ কক্ষে প্রবেশ করিতেই যদুনারায়ণ আসিয়া তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলেন।

উঠিতেই পুত্রের মুখপানে চাহিয়া মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন;—তোর মুখখানা এত মলিন কেন বল্ ত? শরীর কি অসুস্থ হয়েছে? খুব রোগা হয়ে গেছিস্! বাবা, এ বছরটা খুব সাবধানে থাকৃতে হয়, মহাগুরু-নিপাতের বছর, কত বিঘ্ন আস্তে পারে। বলিয়া সস্নেহে পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার প্রশ্ন করিলেন,—হ্যাঁরে, কোনো অসুখ-বিসুখ করেনি ত? মাথাটা যেন একটু গরম বলে বোধ হচ্ছে!

মাতার চক্ষু অশ্রু-সিক্ত। পুত্রের মুখ নত। পুত্র সেই ভাবে থাকিয়া উত্তর দিলেন;—না মা, অসুখ-বিসুখ কিছু নয়।

মাতা আরও উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে? গৌড়ে কি কোনো গোলযোগ?

কুমার চিন্তিতভাবে বলিলেন;—গোলযোগ বৈকি।

সে ত হবেই! এতদিন যে হয়নি, এই আশ্চর্য্য। তারপর—ব্যাপার কি?

যদিও প্রকাশ্য দরবারে নয়, পরম্পরায় শুনছি, মুসলমান-সম্প্রদায় বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নন্। এতে তাঁদের জাতীয়ত্ব হীন হয়ে পড়ছে বলেই তাঁদের বিশ্বাস।

তা ত হবেই! তখন ত তোমরা শুন্‌লে না! নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিকে ফুৎকার দিয়ে জ্বালিয়ে তুলে, কাপড়-চাপা দিয়ে কতক্ষণ রাখা যায়? তখন

যদি তোমরা তা বুঝতে, তা হলে আর এতটা হতে পারত না। হিন্দুর গৌড় হিন্দুরই হত।

পুত্র নীরব। মাতা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন ;— হিন্দুর গৌড় এখনো হিন্দুর হাতে। যে ভাবেই হোক্, হিন্দুই এখন গৌড় শাসন কচ্ছে, তাই তাদের গাত্রদাহ! হয় হোক্, সাম্রাজ্য তাদের হাতে যেতে পারে না।

যদুনারায়ণ অন্যমনস্ক ছিলেন। শেষ কথা কয়টা তাঁহার কর্ণগোচর হইতে তিনি উত্তর দিলেন ;—হাঁ মা, সাম্রাজ্য এখন তাঁদের হাতে দেওয়া যেতে পারে না। এখনো তাঁরা হিন্দুকে প্রীতির চক্ষে দেখ্‌তে সম্পূর্ণ-রূপে অভ্যস্ত হন নি। এ অবস্থায় তাঁরা শাসনদণ্ড হাতে নিলে পূর্ব্বের মতই নিজ মূর্ত্তি ধারণ কর্ব্বেন,—আবার সেই কলহ-বিসংবাদের সূচনা হবে। তাতে আমাদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হবে।

মাতা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ;—সে উদ্দেশ্য সফল হওয়া অনেক দূরের কথা রে যদু, সে হবার নয়। তোমার পিতা চেষ্টা করে গেছেন, তুমি কচ্ছ, কিন্তু কতটা কৃতকার্য্য হয়েছ বলতে পার? আমার মতে বাপু, ঠিক ওভাবে হিন্দু-মুসলমানকে এক করা যেতে পারে না। হিন্দুর দেশ, হিন্দুর সাম্রাজ্য। তার উপর হিন্দুর প্রতিষ্ঠাকে পুনঃস্থাপিত করে, সেই প্রতিষ্ঠার ছায়াতলে মুসলমানকে বসিয়ে, আদর করো—যত্ন করো, তাকে বুঝিয়ে দেও, হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণা করে না। সমাজের রীতি-নীতি যাই থাকুক না কেন, কেউ কারো ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে পারবে না; যে যার ধর্ম্মে বা সমাজে থেকে নিরুপদ্রবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর্ব্বে। এই-ই ঠিক। তা না করে, তোমরা মুসলমানের প্রভুত্বকে মেনে নিয়ে, ভাবী সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে মুসলমানকে অসঙ্গত প্রশ্রয় দিচ্ছ!

তারা কেন চুপ করে থাকবে? আমি পূর্ব্বেও বলেছি, এখনো বলছি, গৌড়ের যথার্থ অধিকারী হিন্দু। যদু, এখনো বলছি, সে অধিকারটাকে অবহেলা করে, জাতির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিস্‌নে।

পুত্র বলিলেন,—মা, জাতির মর্য্যাদা বাড়ানোর জন্যই আমাদের এ প্রয়াস। আমাদের উদারতার মধুর স্পর্শেই আমরা মুসলমানকে বশীভূত কত্তে চাই। কিন্তু আজ যদি আমি প্রতিনিধিত্বের পরিবর্ত্তে সহসা সম্রাট্ হয়ে গৌড়-মসনদে বসি, সে যে একটা প্রকাণ্ড তঞ্চকতা হবে মা! আমাদের এতদিনের উদারতা ছলনায় পরিণত হবে, সে যে বড়ই দুঃখের কথা!

মাতা বলিলেন;—যদু, ভুল বুঝ্‌ছিস্ কেন? তোর প্রতিনিধিত্বের সার্থকতা কি? তোর পিতাকেই তারা প্রতিনিধি বলে স্বীকার করেছিল, কিন্তু তোকে কচ্ছে কি? তারা আর প্রতিনিধির প্রভুত্ব মান্‌তে চায় না। তারা নূতন ব্যবস্থা চায়, অর্থাৎ তারা চায়—মুসলমান নেতা, যার কাছে মাথা নত কল্লে তাদের মর্য্যাদার হানি হবে না। তোরা ত উদারতা-উদারতা করে ব্যাকুল হচ্ছিস্,—তারা তোদের উদারতা বুঝ্‌ছে কই? আশমানতারার বিয়ে হবে—তার ছেলে হবে—সেই ছেলে সাবালক হয়ে গৌড়-গদীতে বস্‌বে,—সে ঢের দিনের কথা। ততদিন তারা সবুর কর্ব্বে, তারা তত বোকা নয়,—তত নিরীহ তারা নয়। এতদিন যে ছিল, এ-ই যথেষ্ট।

রাণী অনর্গল বলিয়া যাইতেছিলেন, পুত্রের মুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। এই পর্য্যন্ত বলিতেই কুমার চঞ্চলভাবে বলিলেন;—মা, ও সব কথা এখন থাক্। শরীর বড় ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করা দরকার বোধ কচ্ছি।

মাতাও একটু অপ্রতিভ হইলেন ও ব্যস্তভাবে বলিলেন;—ঠিক ত! আমার দফা রফা হয়েছে! আমি যেন কি হয়ে গেছি! নে—নে আগে স্নান-আহ্নিক কর্, সুস্থ হ। তারপর অন্য কথা যা হয় হবে এখন।

এই বলিয়া রাণী স্বয়ং পুত্রের আহারাদির বন্দোবস্তে ছুটিলেন। মাতার তত্ত্বাবধানে পুত্রের স্নানাহার সম্পন্ন হইল।

আহারান্তে যদু মাতার কক্ষ ত্যাগ করিলেন। মাতা পুত্রের গতির পানে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিলেন;—বাছা আমার বড় রোগা হয়ে গেছে। তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইল। মাতা ভাবিলেন,—পুত্র এতদিন পর্ব্বতের অন্তরালে ছিল, আজ বড় বিপন্ন; সে গিরি নাই, ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিপর্য্যস্ত হইয়া তাহার চেহারা অমনতর হইয়াছে। যাহা হউক, এবার আর তাহাকে একাকী গৌড়ে যাইতে দেওয়া হইবে না। রাজা বা ভট্টাচার্য্য মহাশয় সঙ্গে যাইবেন। গৌড় রক্ষা করিতেই হইবে, এখন হইতেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

রাণী কথা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত-নিমন্ত্রণের হেতু কি জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলেন। জনরবও কিছু কিছু তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। ভাবিলেন, পুত্রের বিশ্রাম-লাভের পর তাহার কক্ষে গিয়া পণ্ডিত-আহ্বানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন।

৫

নবকিশোরীর কক্ষ,—অর্থাৎ যদুনারায়ণের শয়ন-কক্ষ। নবকিশোরীর কক্ষ বলিবার একটু হেতু আছে,—কক্ষটী নবকিশোরীর রুচি-অনুযায়ী সজ্জিত। তৎকালীন হিন্দুর স্থাপত্য-শিল্প-চাতুর্য্য কক্ষখানিকে গৌরবান্বিতই করিয়াছিল, তবে তাহা ভাদুড়ী-বংশীয় রাজন্যবর্গের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক মাত্র,—তাহাতে নবকিশোরীর রুচির পরিচয় কিছুই ছিল "না। তাহার পরিচয় ছিল, কক্ষ-প্রাচীরে লম্বমান্ চিত্রপট গুলিতে, আর কক্ষস্থ কতিপয় আসবাবে।

কক্ষ-দেউলের একদিকে দশখানি দশমহাবিদ্যার ছবি, আদ্যাশক্তির জীবন্ত প্রতিমা কয়খানি। প্রতি চিত্র-প্রতিমার নিম্নে সুবিন্যস্ত স্বর্ণ-স্থালীতে একটী করিয়া প্রফুল্ল রক্ত-কমল। দেউলের অন্য প্রান্তে ভগবানের দশাবতারের দশখানি চিত্র এবং প্রতি চিত্রের নিম্নে এক-একটী প্রস্ফুট শ্বেত শতদল। কক্ষের একপ্রান্তে রজতময় পালঙ্ক,—পালঙ্কের শিয়রের দিকে প্রাচীর-গাত্রে, ভাদুড়ী-চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মাতা ব্রহ্মময়ীর প্রকাণ্ড তৈলচিত্র লম্বমান্;—তন্নিম্নে ঐরূপ স্বর্ণপাত্রে ফুল্ল রক্ত-পদ্ম বিরাজ করিতেছে। এই ফুল-সজ্জা নবকিশোরী প্রত্যহ প্রাতে স্বহস্তে সম্পাদন করে। পদ্ম-গন্ধে কক্ষ আমোদিত। কক্ষের অপর প্রান্তে কয়েকটী স্তবক-যুক্ত চন্দনকাষ্ঠের পুস্তকাধার,—তদুপরি অনেকগুলি সংস্কৃত পুঁথি সযত্নে রক্ষিত। নিকটেই স্বর্ণাধারে স্বর্ণদীপ এবং দীপ-সান্নিধ্যে দুই তিন খানি মৃগ-চর্ম্ম আস্তৃত। সেই মৃগাজিনে বসিয়া কিশোরী রাত্রিতে অধ্যয়ন করিত।

দিবসের মধ্যভাগ সমাতীতপ্রায়। নবকিশোরী পুত্র অনুপকে লইয়া সেই অজিনের একখানিতে উপবিষ্ট, সে পুত্রকে কোলে বসাইয়া মুখে মুখে নীতি শিক্ষা দিতেছিল। বালক অনুপ আধ আধ বুলিতে সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখে আওড়াইতেছিল, আর মাতা হাসিতে হাসিতে কখন্ চুম্ব দিয়া, কখন্ বা শিরোঘ্রাণ লইয়া প্রশ্ন করিতেছিল; আবার কোনও শ্লোকের চরণ-চ্যুতি ঘটিলে, তাহা আবৃত্তি করিয়া পুত্রকে ধরাইয়া দিতেছিল।

অনুপ তাহার কোমল কণ্ঠে স্বর করিয়া বলিতেছিল;—

লিদ্দতি দগ্‌গ বিদেল তুলুতিদাতং
থদয় লিদয় দত্তিত পতুগাতং
কেতব দিলিত বুদ্দ থলীল দয় দগদীত হলে।

বলিয়াই মাতার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—মা, এইবাল্ বলো তিক্ হয়েতে?

কিশোরী হাসিতে হাসিতে ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—হাঁ বাবা, ঠিক হয়েছে। এখন এস, দুজনে এক সঙ্গে বলি। কিশোরী বলিতে লাগিল, আর অনুপ সেই সঙ্গে যোগ দিয়া চলিল;—

নিন্দসি যজ্ঞ-বিধেরহহ শ্রুতি-জাতম্
সদয়-হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্
কেশব ধৃত বুদ্ধ-শরীর জয় জগদীশ হরে।

জননীর কণ্ঠ-নিক্কণে শিশু-কণ্ঠের অর্দ্ধস্ফুট কাকলী মিলিত হইয়া এক অদ্ভুত সুধা-লহরীর সৃষ্টি করিল! প্রকোষ্ঠ যেন শতকর্ণ হইয়া সেই সুধা পান করিতে লাগিল! চিত্রপট গুলিও যেন স্পন্দিত হইল!

আবৃত্তি শেষ হইলে অনুপ মায়ের গলা জড়াইয়া বলিল;—মা, এইবাল্ বলো।

মাতা অনমমস্কা। জিজ্ঞাসা করিল ;—কি বল্‌বো বাবা ?

থেই কথা।

কি কথা বাবা!

থেই বুদ্দথলীল—বুদ্দল কথা।

মাতার মনে হইল,—তিনি বলিতে লাগিলেন,. আর কুমার একদৃষ্টে মাতার মুখ পানে চাহিয়া সেই পবিত্র কাহিনী শুনিতে লাগিল। নব-কিশোরী অতি সংক্ষেপে সরল কথায় সিদ্ধার্থের বাল্য-জীবন,—তৎকাল হইতেই তাঁহার জীবের প্রতি করুণা,—কৈশোরোন্মেষের সহিত তাঁহার সংসার-বৈরাগ্যের ভাব,—তাঁহার পিতামাতার তাঁহাকে সংসারে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা,—তাঁহার বিবাহ, পত্নী যশোধরার গুণবর্ণনা,—পুত্র রাহুলের জন্ম এবং ঘটনাক্রমে রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দর্শনে ব্যথিত-চিত্ত হইয়া তাহার সংসার-ত্যাগ ইত্যাদি বিষয় বলিয়া যাইতে-ছিল,—আর আজ-কালকার শিশু যেমন রাক্ষস-রাক্ষসীর গল্প, বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীর উপকথা অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত গলাধঃকরণ করে, পুত্র অনুপ সেইরূপ তন্ময় চিত্তে সেই পরমপুরুষের কীর্ত্তি-কথা শ্রবণ করিতেছিল। ইতিমধ্যে কখন্ যে যতুনারায়ণ সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার-দেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, পুত্র বা পুত্রের মাতা তাহা লক্ষ্য করে নাই, পুত্রের পিতাও আর কোনও দিন পুত্রসহ তত্ত্বকথা-তৎপরা গণেশ-জননী-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন নাই। তিনি ক্ষণকালের জন্য পূর্ব্ববর্ণিত চিত্ত-বৈকল্যের বিষয় বিস্মৃত হইয়া বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে সেই মধুর মূর্ত্তি ও মধুর সন্দর্ভ উপভোগ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সেই উপভোগ-চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র কশা তাঁহার চিত্তে পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া, তাঁহাকে সেই সুধা-কলস হইতে দূরে বিতাড়িত করিবার প্রয়াস পাইতে-

ছিল ;—তিনি সেই মাধুর্য্যের পানে যতই ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন, ততই কে যেন তাঁহার গ্রীবাদেশ ধরিয়া টানিয়া, তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিল!

সিদ্ধার্থের সংসার-ত্যাগের বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে কিশোরী একটী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, অনুপও যেন কেমন একটু বিচলিত হইয়া মাতাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে গেল! সেই অবসরে পুত্রের দৃষ্টি সহসা দ্বার-পথে পতিত হইল। অনুপ চিনিল,—অমনি তাড়াতাড়ি মায়ের কোল হইতে লাফাইয়া,—ঐ বাবা এয়েছে—বলিয়া পিতার পানে ছুটিল। কিশোরী দ্বার-পানে চাহিয়া হাস্য-প্রফুল্ল মুখে বসন সংযত করিতে করিতে উঠিয়া আসিয়া স্বামীর চরণে প্রণত হইল। ততক্ষণ অনুপ পিতার ক্রোড় অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

পুত্র-অঙ্কে যদুনারায়ণ ধীরে ধীরে আসিয়া পালঙ্ক-প্রান্তে উপবেশন করিলেন। একখানি মৃগ-চর্ম্ম টানিয়া স্বামীর পদ-প্রান্তে বসিয়া কিশোরী তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে মধ্যে মধ্যে ব্যথিতভাবে তাঁহার মুখের পানে চাহিতে লাগিল।

যদু বুঝিলেন, তবু বিষাদমাখা হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—কি দেখ্‌ছ?

কিশোরী সেইভাবে চাহিয়া শুধু বলিল ;—তোমাকে।

যদু সেইভাবেই প্রশ্ন করিলেন,—কেন, আমাকে কি আর কখনো দেখো নি!

কিশোরী বলিল ;—এমন চেহারায় তোমাকে আর কখনো দেখিনি।

যদুনারায়ণ গম্ভীর হইলেন। ক্ষণকাল চুপ করিয়া ডাকিলেন ;—কিশোরী—

কিশোরী উত্তর দিল।

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো ?

করো।

যদু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন ;—যশোধরার মত অবস্থা যদি তোমার আসে ত তুমি কি করো ?

কোন্ অবস্থা ?

যে সময় বুদ্ধদেব সংসার-ত্যাগ কল্লেন।

কিশোরী সন্দিগ্ধ নেত্রে স্বামীর মুখের পানে চাহিল, জিজ্ঞাসা করিল ;—ও কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন ?

যদু দেয়ালের দিকে নেত্র রাখিয়া বলিলেন ;—ধরো না, যদি সে অবস্থা হয়, তাহলে কি করো, তাই জান্তে চাইছি।

কিশোরীর চিত্তাকাশে যদিও সংশয়ের উদয় হইয়াছিল, তথাপি, তখনও সে বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র-কাহিনী ভুলিতে পারে নাই, তখনও তাহার চিত্তে সেই দিব্য গরিমার জ্যোতির্ব্বিকাশ ; তাহাই তাহার সে সংশয়কে রাঙাইয়া দিল, —সে সরলভাবে উত্তর দিল ;—

বুদ্ধদেব যাঁর আদর্শ, তাঁর পত্নীর আদর্শ যশোধরা ! আমার ইষ্টদেবতা যদি সেই মহাপুরুষের পথে চলেন, তাহলে আমাকেও সেই মহীয়সীর পথে চল্তে চেষ্টা কত্তে হবে বই কি !

যদু পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন ,—যদি সেটা ঠিক সে ভাবের সংসার-ত্যাগের পথ না হয় ?

কিশোরী স্বামীর সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নে এবার আরও একটু চঞ্চল হইল। সে বলিল ;—তুমি যে কি বল্তে চাইছ, কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না !-সংসার-ত্যাগ না হোক্,..ত্যাগ ত ! সে পথ উদার ত !

যত্ন দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন,—নিশ্চয়ই।

তবে আর কি?

যদি সমাজ বা ধর্ম্ম তাতে বাধা দেয়?

কিশোরী অত্যন্ত চঞ্চল হইল। সে এবার কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল;—আমাকে ছলনা কচ্ছ কেন? ধর্ম্ম, সমাজ যাতে বাধা দেয়, এমন উদার পথ কি?

যত্ন শুধ্‌রাইয়া লইলেন, বলিলেন;—অবশ্য বর্ত্তমান সমাজ বা ধর্ম্মের কথাই বল্‌ছি।

নবকিশোরী স্বামীর জানুদ্বয় বুকে চাপিয়া ধরিল ও তাঁহার পানে মিনতিপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া বলিল;—বলো—বলো—আর একটু স্পষ্ট করে বলো, সে উদার পথ কি?

যত্নারায়ণ তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—বুঝি বা ঝটিকা আসন্ন বুঝিয়া বল্লরীর আলম্বন দৃঢ় করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন; অথবা নৌকা বাঁচাইতে নাবিক যেমন তাহার সরণি শক্ত করিয়া ধরিয়া দাড়ায়, তিনি সেইরূপই দাঁড়াইয়াছেন। কিম্বা বোধ হয়, দুইটার কোনটাই নয়, চিন্তাবেগ হইতে নিজেকে সাম্‌লাইবার জন্যই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে অনুপ পিতার কোল হইতে নামিয়া, তাঁহার পাশে বসিয়া কখন উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, কখন বা পিতার পৈতাটী লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মেঘ-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া, পালঙ্ক হইতে নামিয়া মাতার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল।

যত্নারায়ণ বলিলেন;—তবে শোনো কিশোরি, গৌড়ের আকাশ মেঘ-সঙ্কুল, শীঘ্রই একটা অনর্থপাতের সম্ভাবনা। হিন্দু-মুসলমানের

মধ্যে অকৌশল আবার মাথা তুলবার চেষ্টা কচ্ছে। সেই সংঘষ-জনিত বজ্রাগ্নি নিবারণ কত্তে, সাম্যের আসনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত কত্তে আমাকেই ত্যাগ-স্বীকার কত্তে হবে। সে ত্যাগ কিশোরী আমার—সে ত্যাগ আর কিছুই নয়, আশমানতারাকে গ্রহণ—

আর বলিতে হইল না,—দুৰ্দ্দমনীয় ব্যাত্যা-বিক্ষোভে ব্রততী লুটাইয়া পড়িল! হায়! সাধ্বী নারি! ঐখানেই তোমার দুর্ব্বলতা!

নবকিশোরী তাহার আরাধ্যদেবতার পা দুখানি জড়াইয়া লুটাইতে লুটাইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল ;—স্বামী—সর্ব্বস্ব আমার, আমাকে রক্ষা করো—এই পর্য্যন্ত। আর কিছুই বলিতে পারিল না, সে সংজ্ঞা হারাইল।

কিশোরীর দুৰ্দ্দশা লক্ষ্য করিবার অবসরও হইল না, যদুনারায়ণ চকিতের মধ্যেই দেখিলেন ;—উচ্ছ্বাসাসন্ন গঙ্গোর্ম্মির ন্যায়, ঘৃত-পীত হোম-শিখার ন্যায় মাতা ত্রিপুরাদেবী সম্মুখে দাঁড়াইয়া। বীর যদু-নারায়ণের চিত্ত-ভূধর টলিয়া গেল, বুক দুরু দুরু স্পন্দিত হইল : তিনি সেই স্ফুলিঙ্গ-বিচ্ছুরিত নয়ন-ফলকের উপর নেত্র নিবদ্ধ করিতে পারিলেন না, নিতান্ত বিমূঢ় নিঃসহায় ভাবে ভূমিতলে পলক-রহিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন!

উচ্ছ্বাসে কল্লোল ছুটিল। মাতা সম্বোধন করিলেন ;—যদু!

যদুর চমক ভাঙ্গিল। তিনি কাতরস্বরে বলিলেন,—মা!

তবে রটনা মিথ্যা নয়?

যদু শুধু বলিলেন,—মা—

বেণু-নিনাদের ন্যায় মধুর, কিন্তু বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায়ই কঠোর কণ্ঠে উচ্চারিত হইল ;—যদুনারায়ণ!

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। অনুপ আতঙ্কে সংজ্ঞাশূন্য মাতার বক্ষে মুখ লুকাইল। যদু সে রোমাঞ্চকর আহ্বানে সাড়া দিতে সাহসী হইলেন না।

উচ্ছ্বাস্ দ্রুত ছুটিল;—যদুনারায়ণ! তোমার গলায় না যজ্ঞসূত্র! তোমার শিরায় না ব্রহ্ম-শোণিত! জানো তুমি কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ—কার স্তন্যে পুষ্ট হয়েছ? এত হীন তুমি! হিন্দুর শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম পরিগ্রহ করে, জাতীয় মর্য্যাদা বংশের গরিমা সমস্ত রসাতলে দিয়ে, আজ তুমি মুসলমানীর প্রতি অনুরক্ত! ঠিক জেনো, রাণী ত্রিপুরা তোমার গর্ভধারিণী হলেও এ অত্যাচার কখনো সহ্য কর্ব্বে না। খুব সাবধান, এখনো বল্‌ছি, খুব সাবধান—

যদু এবার বিপন্নভাবে উত্তর দিলেন;—মা! উপায় ত নাই!

কোনো কথা শুন্‌তে চাই না। যদি প্রতিকার কত্তে পার ভালই, নচেৎ আমার সম্মুখে আর—

থাক্ রাণি, এখন থাক্—বলিতে বলিতে রাজা অবনীনাথ ও কালীকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজা কন্যাকে তদবস্থ দেখিয়া অগ্রে তাহার চৈতন্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাণীকে বলিলেন,—অত উতলা কেন মা! যদু যে তোমার বুদ্ধিমান ছেলে! কত বড় দায়িত্ব তার স্কন্ধে, সে সহসা কোনো কাজ ত কর্ব্বে না। সে পণ্ডিত-মণ্ডলীকে আহ্বান করেছে,—একটা বিচার হবে, যা সঙ্গত সে তাই কর্ব্বে মা! এখন আগে অনুপকে কোলে নিয়ে, কিশোরীকে শান্ত করো। এসো যদু, আমার সঙ্গে এসো।

এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদুনারায়ণের হস্তধারণ করিলেন। যদুনারায়ণ যন্ত্র-চালিতের ন্যায় অগ্রগামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

৬

সেনাপতি কাসেম খাঁ গৌড়ে প্রত্যাগত হইয়াছেন। যদুনারায়ণ রাজধানীতে নাই, সুতরাং, অন্যান্য অমাত্যগণ রাজধানীর প্রান্তে গিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিয়াছেন। আজ গৌড়ময় আনন্দ-কোলাহল। দিল্লীশ্বরেরর সমরাভিযান ব্যর্থ করা এতটুকু কথা নয়। চারিদিকে বীর-কেশরী কাসেম খাঁর বীরত্ব-কাহিনী নানা ভাবে রঞ্জিত হইয়া উদ্বোধিত হইতেছে। ধন্য কাসেম খাঁ, ধন্য পাঠান-গৌরব!

পথিমধ্যেই কাসেম খাঁ রাজা গণেশনারায়ণের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, সুতরাং, তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহতও হইয়াছিলেন। একটী বিষয়ের জন্য তাঁহার চিত্ত অধিকতর ব্যথিত হইয়াছিল। তাঁহার আশা ছিল, যুদ্ধান্তে গৌড়ে ফিরিয়া আসিলে, রাজার ইচ্ছামতে আশমানতারার সহিত তাঁহার পরিণয়-ক্রিয়া মহাসমারোহে সমাহিত হইবে। আজ তিনি যে গৌরব-কিরীট মাথায় করিয়া ফিরিয়াছিলেন, তাহার ফলে, আশমান তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া নিশ্চয়ই গৌরব বোধ করিবে, তিনিও তাহাকে যোগ্য-অবসরে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু রাজার পরলোক-প্রাপ্তিতে তাঁহার সে আশা ফলবতী হইতে বুঝিবা বিলম্ব ঘটিল! যাহা হউক, সেজন্য কাসেম খাঁ ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। আশমানতারাই যে একদিন তাঁহার গৌরব-কিরীটের অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধিত করিবে, এ বিশ্বাস তাঁহার খুবই ছিল। এইরূপ ভাবনার আলো ও ছায়ার লীলা হৃদয়ে লইয়া, বিজয়ের দুন্দুভি বাজাইতে

বাজাইতে যখন তিনি গৌড়ে আসিয়া পৌছিলেন, তখন তাঁহার প্রাণে এক নূতনতর আশার অনুভূতি জাগিয়া উঠিল। গৌড়ে পদার্পণ করিতেই তিনি লক্ষ্য করিলেন, গণেশনারায়ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমস্ত মুসলমান-সমাজ হিন্দু-প্রাধান্যকে খর্ব্ব করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। হিন্দুগণও ঠিক পূর্ব্বের মত আর মুসলমান-গণের সহিত মিলা-মিশা করিতে চাহিতেছে না। তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবার দিন মুসলমান আমীর-ওমরাহগণ যেরূপ আন্তরিকতার সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, হিন্দু অমাত্য ও প্রধান ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে ঠিক সে ভাবে গ্রহণ করিলেন না। আরও দেখিলেন,—মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু অভ্যর্থকের সংখ্যাও খুব অল্প। মুসলমান অভ্যর্থকগণের সহিত কথাবার্ত্তায় তিনি বেশ বুঝিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে কোনও একটী বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব উপহার দিতে লালায়িত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে হিন্দু-প্রাধান্যকে ঝাড়িয়া ফেলিবার আকাঙ্ক্ষা যেন কিছুতেই আত্মগোপন করিতে পারিতেছে না। এইরূপ ভাব-বিপর্য্যয় স্বভাবতঃ স্বজাতি-বৎসল কাসেমখাঁর চিত্ত হইতে রাজার মৃত্যু-জনিত নৈরাশ্যের ক্ষীণ ছায়া অপসারিত করিয়া দিল এবং তাঁহার উদ্যম তাঁহার স্বজাতিগণের অনুকূল-ব্যবহার-জনিত বায়ু-সঞ্চারে মেঘ-ভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায় এত প্রখরতায় জাগিয়া উঠিল যে, শীঘ্রই উদ্বেগের সমস্ত অন্ধকার নিঃশেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, শুধু আশমান-প্রাপ্তি নয়, অন্য কোনও গৌরবকর প্রার্থিত বস্তু তাঁহার পক্ষে সহজ-প্রাপনীয় হইয়া আসিতেছে!

তবে আশমান-লাভই তাঁহার প্রথম কাম্য বস্তু এবং যেমন কর্ণাকর্ষণের সহিত মস্তকের আগমন স্বতঃপরতঃ সম্ভাবিত হয়, সেইরূপ

আশমানতারাকে লাভ করিতে পারিলে অন্য কাম্যবস্তুটীও তাঁহার করতলগত হইবে। সুতরাং, তিনি অবিলম্বে আশমানতারার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার ঈপ্সিত অভিনন্দন লাভ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। জনরব তখনও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই।

সেদিনও আকাশ পরিষ্কার ছিল না। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত জলদ-পুঞ্জ পূর্ব্ববায়ু-সন্তাড়িত হইয়া, কখন্ বা অশ্রুপাত করিতেছিল, কখন্ বা সন্ত্রস্ত ভাবে দূরে পলায়ন করিতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কাল, কিন্তু গোধূলির ম্লানিমা এত গাঢ়তর হইয়াছিল যে, তজ্জনিত সৌন্দর্য্যের কোনও আভাস ছিল না বলিলেও হয়। ধূসর-বসনা শ্যামাঙ্গীর সহিত কম মাধুর্য্যের যতটুকু সম্পর্ক, ঘন-জালাচ্ছন্ন প্রদোষের সহিত নিসর্গ-শোভার সম্বন্ধ ততটুকুই ছিল।

কিন্তু চিত্তে যাহার আনন্দ, প্রাণে যাহার প্রফুল্লতা, হৃদয়ে যাহার আশার নবারুণ সপ্তাশ্ব-যোজিত রথে দিগ্-বলয় কিরণ-মুখর করিয়া তুলিয়াছে, প্রকৃতির বিষাদ-কালিমা সহজে কি তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হয়?

কাসেম খাঁ চলিয়াছেন, তাঁহার সুচির-বাঞ্ছিতার কাছে, আত্ম-প্রকাশ করিতে, আত্ম-নিবেদন করিতে। দীর্ঘ কয়েক বৎসর অতীতের কোলে লীন হইয়াছে, শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায়, যোগ্য অবসরের প্রতীক্ষায়। প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় পিপাসা বাড়িয়াছে, সুধা-কুম্ভ ওষ্ঠ-লগ্ন হইবার অবকাশ আসিতে আসিতেই দূরে সরিয়া গিয়াছে। অথবা তাহা ওষ্ঠ-পুটে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা বুঝি তাঁহার আসে নাই, এই বুঝিয়াই তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন। আজ সেই সুযোগ সামর্থ্য-মণ্ডিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, তিনি আর কি স্থির থাকিতে পারেন?

কোন্ রাগিণীতে বন্দনা-গীতি বাজিয়া উঠিবে, কোন্ লয়ে সে সঙ্গীতের সঙ্গত হইবে? তিনি পথে যাইতে যাইতে ইন্দ্রিয়-গ্রামকে তাঁহার কল্পনার অঙ্গুলি-স্ফুরণে পরীক্ষা করিয়া লইতেছিলেন। প্রতি তন্ত্রীতে প্রতি পর্দ্দায় এক তিল কঠোরতা নাই, সব গুলি স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সুরে ঝঙ্কৃত হইল! ওঃ মরীচিকা! তুমি এতবড় একটা হৃদয়কে কি করিয়া বিমূঢ় কর!

কিন্তু আনন্দের মধ্যে বেদনা, আশার মধ্যে আশঙ্কা, প্রণয়ের মধ্যে সন্দেহ এবং অনুরাগের মধ্যে সঙ্কোচ এ যেন চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায়ই নিত্য-বিরাজ থাকে! তাই ত বক্ষঃ স্পন্দিত হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে, আবেগে কণ্ঠরোধ হয়, উচ্ছ্বাসে চক্ষু অশ্রু-সজল হয়, জিহ্বায় জড়তা আসে, প্রাণের অভিব্যক্তি বাক্যে পরিস্ফুট হয় না। আবার প্রেমে অন্ধ করে, বধির করে, কুৎসিৎকে সুন্দর করে। উক্ত সকল প্রকার ভাব-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া কাসেম খাঁ চলিয়াছেন। তাঁহার চিত্ত-মঞ্চে সুন্দর-অসুন্দর, মধুর-তিক্ত সর্ব্ববিধ দৃশ্য ও রসের অভিনয় চলিয়াছিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পট পরিবর্ত্তন, পলকে পলকে দৃশ্যান্তর।

স্বীয় কক্ষে আশমানতারা চিন্তা-নিরতা। সুন্দর করতলে সুন্দর কপোল ন্যস্ত। বিশাল নেত্র ক্ষণে বিভ্রান্ত, ক্ষণে সঙ্কুচিত। দীপোজ্জ্বল কক্ষ-তল,—কিন্তু তাহার মুখ-মণ্ডলে ম্লান ছায়া,—যেন কত উদ্বেগ, কত উৎকণ্ঠা! প্রকাণ্ড দ্বৈধের বিশাল বারিধির উপর মিলনের সেতু উত্থিত হইবে,—হইবে কি? বহুদূর অগ্রসর, আর নির্ম্মাণ-কার্য্য স্থগিত রাখিবার উপায় ত নাই! ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া ভাসিয়া যাইবে না ত! মঙ্গলময় খোদা, সব বাধা সরাইয়া দাও, সেতু-মূল দৃঢ় কর, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, সিদ্ধিতে সার্ব্বজনীন মাঙ্গল্যের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হউক।

পরিচারিকা সংবাদ দিল,—দ্বারে সেনাপতি কাসেম খাঁ,—দর্শনার্থী। আশমান পরিচারিকার মুখপানে ক্ষণকাল নিস্পলক দৃষ্টি রাখিয়া যেন প্রকৃতিস্থা হইল এবং নিজেই দ্বার-দেশে আসিয়া আহ্বান করিল ;— আসুন খাঁ সাহেব! আজ আপনার গৌরবময় পদক্ষেপে আমার কক্ষতল পবিত্র হোক্। আমিও আপনার প্রতীক্ষা কচ্ছিলাম।

কাসেম খাঁ কক্ষে প্রবেশ করিলেন ও যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিতে করিতে হাস্য-মধুর কণ্ঠে বলিলেন ;—সৌভাগ্য আমার।

আশমানতারাও ঈষৎ হাসিল,—বলিল,—খাঁ সাহেব, সৌভাগ্য আমারই বেশী বল্‌তে হবে।

কাসেম খাঁ শুধু হাসিতে লাগিলেন, কোনও প্রতিবাদ করিতে যেন তাহার ইচ্ছা হইল না। আশমানতারা বলিতে লাগিল ;—খাঁ সাহেব! আমার নিকট আপনার জীবনের মূল্য কত বেশী তা জানেন? শুধু তাই বলে নয়, আপনি মুসলমান-গৌরব, গৌড়-সাম্রাজ্যের স্তম্ভ আপনি। আপনারই অমিত শক্তি আজ দিল্লী-সেনাকে বিফল মনোরথ করে সাম্রাজ্য মধ্যে একটা নব অভ্যুত্থানের স্পন্দন তুলেছে। আপনারই বাহুবলে আজ সমগ্র ভারত বুঝ্‌তে পেরেছে,—গৌড় দুর্ব্বল হস্তে অসি-ধারণ করে না,—তারা যুদ্ধ কাকে বলে জানে। সুতরাং, সাম্রাজ্যের দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলেও, আপনার জীবনের মূল্য খুবই বেশী।

কাসেম খাঁ অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি বলিলেন ;—সাহজাদি, আপনি আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন,—সেই প্রীতির উৎসবের মধ্যে পড়ে আমার জীবনটার মূল্য একটু বেশী বেড়ে গেছে। আর সেই প্রীতির বলেই আমার যুদ্ধ-জয়। আমার জন্য আপনার মঙ্গল চিন্তাই আমাকে সার্থকতায় ভূষিত করেছে। সুতরাং, সৌভাগ্য আমারই বেশী

বলতে হবে যে, আজ আবার আমি অক্ষত শরীরে এসে আপনার সেই প্রীতি-দৃষ্টিতলে দাঁড়াতে পেরেছি। শুধু তাই নয়, আজ যেন বোধ হচ্ছে, সে প্রীতির ছায়া আমার জন্য বেশী দূর ব্যেপে পড়েছে এবং সে ছায়া-রাজ্যে আমার ন্যায্য অধিকার প্রতিপন্ন হয়ে গেছে!

আশমানতারা সরলভাবে উত্তর দিল;—হাঁ খাঁ সাহেব, আমি আপনাকে বড় ভালবাসি;—আজ বলে নয়, বরাবরই আপনাকে আমার আমার বড় ভাল লাগে। কিন্তু আজ যেন আবার আপনাকে নূতন উদ্যমে ভালবাসতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপনার উদারতা, আপনার সরলতা আপনার অমায়িকতা, আপনার বীরত্ব সমস্ত গুলিই যেন একযোগে আপনার পানে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে! আপনার গুণে মহত্ত্বে আমি মুগ্ধ, আপনার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ কত্তে পার্ব্বো না।

সহসা কাসেম খাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইল, তিনি একটু কাশিয়া শুধু বলিলেন;—সাহজাদি!—

আশমান অকপটে কাসেম খাঁর পানে চাহিল এবং তাঁহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিল;—বলুন্.—নিঃসঙ্কোচেই বলুন্—

কাসেম খাঁ ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—সাহজাদি, মনে পড়ে?

কি?

তানোরের সমর-প্রান্তরে—

হাঁ তার পর—

আপনার পিতার মৃতদেহের পার্শ্বে আপনি—

হাঁ খাঁ সাহেব, খুব মনে পড়ে,—সে যে আমার চির জীবনের স্মৃতি!

আপনি সে সময় আমাকে পুরস্কৃত কত্তে চেয়েছিলেন?

চেয়েছিলাম বই কি! বিপন্না আমাকে আপনি সহৃদয়তা দেখিয়ে রক্ষা করেছিলেন, আমার কামনা কষ্টসাধ্য জেনেও পূর্ণ কত্তে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তার প্রতিদান-স্বরূপে আমি আপনাকে আমার মুক্তামালা উপহার দিয়ে, পাগলিনী আমি,—আপনার ঔদার্য্যের পরিমাণ কত্তে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম। আরো বলেছিলাম, খোদা যদি দিন দেন ত—

এই পর্য্যন্ত বলিতেই কাসেম খাঁ বলিলেন,—হাঁ, তখন আমি আপনার পুরস্কার গ্রহণ করিনি। আমি আমার কর্ত্তব্য-পালন করেছি ভেবেই আমি সে সময় আপনার আদরের দান প্রত্যাখ্যান করে-ছিলাম। পরে ভেবেও দেখেছি, আমি তখন সে পুরস্কারের যোগ্য হইনি। আরো কথা, সে অবস্থায় আপনার কাছ থেকে সেভাবের পুরস্কার আমার পক্ষে গ্রহণীয় ছিল না। কিন্তু আজ—

কাসেম খাঁ কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইলেন, তিনি রুমালে মুখ মুছিলেন। আশমানতারাও একটু বিস্মিত হইল,—বিস্ময় অপেক্ষা কৌতূহল বৰ্দ্ধিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল ;—আর আজ কি—বলুন?

কাসেম খাঁ ঈষৎ আবেগযুক্ত কণ্ঠে বলিলেন ;—সাহজাদি, আজ আমি সেই পুরস্কারের প্রার্থী,—আর বোধ হয়, আজ আমাকে অযোগ্য বিবেচনা কর্ব্বেন না। আপনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করেছেন, আপনি আমাকে ভালবাসেন। আজ সেই ভালবাসার সার্থকতা সম্পাদন করুন্। আমিও আপনাকে ভালবাসি, আমিও সে ভালবাসার চরিতার্থতা লাভ করি। আজ আমাদের মধ্য থেকে সব ব্যবধান সরে যাক্, দুইটী হৃদয় যুক্ত হয়ে ভালবাসার এক সুরম্য ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ সৃষ্টি করুক্।

সহসা বহির্ভাগে বিদ্যুৎ চমকিল, পরমুহূর্ত্তে গুরু গুরু মেঘ-গর্জ্জন হইল। ইতিপূর্ব্বে কাসেম খাঁ গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মানা আশ-

মানতারার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কাসেম খাঁর উক্তির সঙ্গে-সঙ্গেই আশমানতারা কয়েক পদ পিছাইয়া আসিল। কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। কাসেম খাঁ আশমানতারার পানে চাহিলেন। ক্ষণপূর্ব্বে পরিচারিকা কক্ষে দীপ জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল, সেই দীপালোকে এইবার কাসেম খাঁ লক্ষ্য করিলেন, সে মুক্তামালা আশমানতারার কণ্ঠে নাই! আশমানের বিশাল চক্ষু জ্বলিতেছে! তিনি বিচলিত হইলেন না, সংযত কণ্ঠে বলিলেন ;—

সাহজাদি, ক্রটী গ্রহণ কর্ব্বেন না। আজ আমি আপনার অসম্মান কত্তে আসিনি, এসেছি ভিক্ষার্থীর বেশে। আর আপনিই ত আমার স্পর্দ্ধা বাড়িয়েছেন! মনে পড়ে সে কথা,—পীড়িতের শিয়রে বসে, মাধুর্য্যময়ী আপনি আপনার শুশ্রূষার কি অমোঘ ঔষধি দান কত্তেন! সেই থেকে আপনার সরলতায়, আপনার প্রবণতায়, আপনার মমতায় আমার প্রাণে একটা নূতন অনুভূতি জেগে উঠেছিল ; কালক্রমে সে অনুভূতির বীজ অঙ্কুরিত ও আজ পল্লবিত হতে চলেছে। সে প্রীতি-বল্লরী আলম্বন বেষ্টন কত্তেই আজ আপনার পানে ঝুঁকে পড়েছে। আপনার হৃদয়ই তার অবলম্ব্য। মুক্তকণ্ঠে বলছি,—সাহজাদি, আমি আপনার পাণি-প্রার্থী। মুক্তামালা তার উপলক্ষ্য মাত্র। আশা করি, আমাকে আমার সেই প্রথম প্রাপ্য পুরস্কার থেকে বঞ্চিত কর্ব্বেন না। কিন্তু কই, রোগ-শয্যায় যাকে প্রত্যহ লোলুপ-নেত্রে প্রত্যক্ষ করেছি, সে মুক্তাহার আজ আপনার কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত কচ্ছে না কেন?

আশমান অতি কাতরভাবে উত্তর দিল ;—খাঁ সাহেব—

আর বলিতে পারিল না। সে মস্তক নত করিল। ক্ষণকাল

প্রতীক্ষা করিয়া কাসেম খাঁ বলিলেন ;—বলুন, সঙ্কোচ কচ্ছেন কেন ?

আশমানতারা নিরুত্তর।

কাসেম খাঁ চঞ্চল হইলেন, বলিলেন,—সাহজাদি ! তবে কি কাসেম খাঁ এখনো আপনার অযোগ্য !

আশমানতারা ধীরে ধীরে বলিল ;—খাঁ সাহেব ! সেদিন যে নিমিত্ত আপনাকে মুক্তামালা উপহার দিতে উদ্যত হয়েছিলাম, সেজন্য যে যোগ্যতা, সে আপনার তখনো ছিল, এখনো আছে। কিন্তু সেদিন আপনি আপনার ঔদার্য্যকে আরো উজ্জ্বল কত্তে কৃতজ্ঞতার উপহার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আর আজ আপনি যেভাবে তাকে গ্রহণ কত্তে চান, সে যোগ্যতার সহিত এ গ্রহণের কোনো সম্বন্ধ নেই। যদি সেই যোগ্যতার হিসাবেও আজ আপনি আমার কাছে সেই মুক্তামালা গ্রহণ কত্তে ইচ্ছুক হন, তাহলে সে ইচ্ছা পূরণ কর্ব্বার সাধ্যও আমার আর নেই।

কাসেম খাঁ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—কেন ?

আশমানতারা বলিল ;—সে আপনি শুনবেন না। তবে যদি সে মুক্তামালার বিনিময়ে—

কাসেম খাঁ ব্যস্তভাবেই বলিলেন ;—আচ্ছা বেশ, তার বিনিময়েই বা কেন ? আমার প্রার্থনা ত সে যোগ্যতার জন্যও নয়। তুচ্ছ সে মুক্তামালা। সাহজাদি ! কাসেম তত হীন নয়। সে মুক্তার প্রার্থী নয়, সে আশমান—তারার প্রার্থী !

আশমানের নেত্র বিস্ফারিত হইল, সে ঈষৎ উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল ;—খাঁ সাহেব !

কাসেমখাঁ নির্ব্বাক্‌ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী বালার পানে চাহিয়া রহিলেন।

আশমান পুনরায় বলিল ;—আপনি না বুদ্ধিমান—আপনি না চতুর নীতিজ্ঞ! বুঝতে এত বিলম্ব কচ্ছেন কেন!

কাসেমখাঁ ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, বলিলেন ;—সাহ-জাদি, কাসেমখাঁ তত অপদার্থ নয়। কিন্তু শুনতে পাই কি—সে মুক্তা-মালার বর্ত্তমান অধিকারী কে? নিশ্চয়ই সে আপনার প্রণয়-পাত্র?

আশমানতারা শুধু বলিল,—পূর্ব্বেই তার উত্তর দিয়েছি।

কাসেমখাঁ বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিলেন ;—ওঃ! বুঝতে পেরেছি,—তা হলে সাহজাদা-কুমারীর প্রেম এত হীন পাত্রে ন্যস্ত যে, তার নামো-ল্লেখ পর্য্যন্ত সেনাপতি কাসেমখাঁর নিকট নিরাপদ নয়!

আশমানের খুবই বাজিল, তথাপি সে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে ভুলিল না। সে উত্তর দিল ;—সেনাপতি কাসেমখাঁ, আজমসাহের কন্যা আপনার নিকট উপকৃত,—তাই এখনো আপনার ধৃষ্টতাকে ক্ষমা কচ্ছে। তবে শুনুন, পিতার অন্তিম আদেশে, পিতৃশত্রুহন্তা, হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী, বর্ত্তমান গৌড়-সাম্রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতা কুমার যদুনারায়ণ আমার স্বামী এবং বরমাল্য স্বরূপ সেই মুক্তামালা আমিই নিজ হস্তে তার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছি। আশা করি, আমার নিকট আপনার জিজ্ঞাস্য আর কিছুই নেই। এখন বিদায় দিন, আমার পিতার সমাধি-মন্দিরে যাওয়ার সময় হয়েছে।

কাসেমখাঁ—স্তম্ভিত কাসেমখাঁ—প্রত্যাখ্যাত কাসেমখাঁ অতি অন্য-মনস্কভাবে বিস্ফারিত নেত্রে কক্ষের ইতস্ততঃ কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে শুধু এই মাত্র বলিলেন,—আচ্ছা বেশ, আর আমি আপ-নাকে বিরক্ত কর্ব্বো না। তবে এইটুকু জানবেন,—আপনার এই বিসদৃশ আচরণ মুসলমান-সমাজ নীরবে সহ্য কর্ব্বে না। হিন্দুকে পতিত্বে বরণ পাঠান-রাজনন্দিনীর পক্ষে দস্তুরমত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচার, অমার্জ্জনীয়

অপরাধ। মুসলমান-সমাজ একটা গৌরবান্বিত বংশকে এ ভাবে কালিমালিপ্ত হতে দেবে না। এজন্য আপনাকে শেষে অনুতপ্ত হতে হবে, জেনে রাখবেন।

এই বলিয়া যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া সেনাপতি কাসেম খাঁ আশমানতারার কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তখন চাঁদ উঠিয়াছে। মেঘ-মুক্ত চন্দ্র-কিরণে সদ্য-বর্ষণ-সিক্তা প্রকৃতি হীরক-খচিত-পট্টবাসা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। চতুর্দ্দিক স্নিগ্ধ, শান্ত, মধুর। কিন্তু কাসেম খাঁর চিত্ত তাহার কিছুই উপভোগ করিতে পারিল না! আজ প্রকৃতি কি কাসেম খাঁর সহিত বিবাদ করিয়াছে—নচেৎ এত বিরূপ কেন?

পথে কাসেম খাঁর সহিত উজির সাহেব ও কতিপয় বিশিষ্ট মুসলমান ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন—কে? খাঁ সাহেব নাকি?

কাসেম খাঁ অত্যন্ত অন্যমনাঃ হইয়া চলিয়াছেন। দ্বিতীয়বার ডাকিতে উত্তর দিলেন,—আজ্ঞা হাঁ, আপনারা—এখন?

আপনার কাছেই—

বিশেষ প্রয়োজন?

বিশেষ বই কি!

আজ না হলে হয় না?

তা—চল্‌তে পারে,—তবে কাল রাত্রিতেই—

ব্যাপার কি?

গুরুতর।

তবে কাল প্রাতে।

একটু নির্জ্জনে।

আচ্ছা, রাত্রিতেই ভাল।

৭

যথাসময়ে পূর্ব্বস্থলী, নবদ্বীপ প্রভৃতি তৎকালীন পণ্ডিত-বহুল স্থান হইতে স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যগণ সপ্ত-দুর্গায় আসিয়া উপনীত হইলেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, প্রায়শ্চিত্ত করিলে মুসলমান হিন্দু হইতে পারে, কিন্তু হীন শূদ্র হয়, ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। সুতরাং, মুসলমান-কন্যা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিনী হইলে শূদ্রাণী হইতে পারে, ব্রাহ্মণী হইবার অধিকার তাহার পক্ষে কোনও প্রকারে সম্ভবপর নহে।

তবে কি যদুনারায়ণ আশমানতারাকে হিন্দুমতে গ্রহণ করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন? ব্যর্থ হইলেও সে চেষ্টা নিতান্ত নিন্দনীয় ছিল না। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি তখন যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে আশমানতারাকে ত্যাগ করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। অথচ এদিকে তাঁহার রাণী ত্রিপুরার ন্যায় মাতা, নবকিশোরীর ন্যায় পত্নী, কুলপতি রাজা অবনীনাথের ন্যায় শ্বশুর। তিনি পুত্রের পিতা, ভাদুড়ীচক্রের পরাক্রান্ত নরপতি,—তাঁহার হস্তে গৌড়-সাম্রাজ্য। যদি তিনি হিন্দুমতে আশমানতারাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হিন্দু-গৌরব খর্ব্ব হইত না, অধিকন্তু, রাজনীতির দিক্ দিয়া হিন্দুর প্রতিষ্ঠা সার্থকতা লাভ করিত। অবশ্য, মুসলমান-সমাজ দিনকতকের জন্য বিচলিত হইতেন; কিন্তু তিনি যে ভাবে—যে নিরপেক্ষতার সহিত রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন, তাহাতে কালক্রমে হয়ত সে ক্ষণিক উত্তেজনা দূর হইয়া যাইত। সুতরাং, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি

স্বল্প আয়াসে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি-স্থাপন করিতে পারিতেন, তাঁহার পারিবারিক জীবনও কথঞ্চিৎ সুখের হইত। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্ম—হিন্দু-সমাজ সে গৌরব,—সে প্রতিষ্ঠা সামান্য শৈথিল্যের বিনিময়েও অর্জ্জন করিতে প্রস্তুত ছিল না !

সুতরাং, আশার যে ক্ষীণ রশ্মি লইয়া যদুনারায়ণ সাতগড়ায় আসিয়াছিলেন, তাহা একেবারেই নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কি ভীষণ ভবিতব্যের ভ্রূকুটী ! নিষ্ঠাবতী রাজ্ঞী ত্রিপুরা দেবীর স্তন্যে যাঁহার দেহের পরিপুষ্টি, তাঁহার যে প্রতি শিরায় হিন্দুত্বের পূত-শোণিত ! একটী দিনের জন্যও ত তিনি হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা-প্রদর্শন করেন নাই, আদর্শ হিন্দু-সন্তানের ভাগ্যে আজ এ কি ঘটিতে চলিল ! কিন্তু তিনি সঙ্কল্প-চ্যুত হইতে পারিলেন না। যে সাম্য-মন্ত্রে তিনি আপনাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সেই মহামন্ত্র-সাধনের উদ্দেশে এত বড় অন্তরায়কে উপেক্ষা করিয়া, আপনার গন্তব্যপথে একপ্রকার নিঃসঙ্গ নিঃসম্বল অবস্থাতেই ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

যদুনারায়ণ সাতগড়া ত্যাগ করিয়া চলিলেন, অথবা সাতগড়াই তাঁহাকে চিরতরে বিদায় দান করিল, অথবা প্রাক্তনই কর্ত্তব্যের নিষ্ঠুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া, তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়ভূমি সপ্ত-দুর্গা হইতে ছিনাইয়া লইয়া চলিল ! যদুনারায়ণ চলিয়াছেন, নিতান্ত অপরাধীর মত, যেন নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত পলাতকের মতই তিনি চলিয়াছেন ! অথচ তিনি নির্দ্দোষ ! এমন মাতৃভক্ত সন্তান মাতার নিকট হইতে,—স্নেহময়ীর অঞ্চলভাগ হইতে বিতাড়িত হইয়া চলিয়াছেন, এমন পত্নীগত-প্রাণ স্বামী আজ পতিব্রতা সাধ্বীর সহিত শেষ সাক্ষাতের অবসরটুকুও হইতে বঞ্চিত হইয়া চলিয়াছেন ! যাদ্রা

গণেশনারায়ণের একমাত্র বংশধর, ভাতুড়া রাজবংশের মুকুটমণি, গৌড়-সাম্রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা আজ অতি দীনভাবে লোকলোচন হইতে আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া গৌড়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন! সে যে কি মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা, ইচ্ছার অবাধ্যতায় বিবেকের সে যে কি নিদারুণ কশাঘাত, তাহা যদুনারায়ণই বুঝিলেন,—সে গভীর নিশীথে আর কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। অথবা বুঝিল,—সে পত্রের মর্ম্মর আর ঝিল্লি-পেচকের আকুল আর্ত্তনাদ! বুঝি নিবিড় অন্ধকার তাঁহাকে সহানুভূতি-সূচক গাঢ় আলিঙ্গন করিল, বুঝি করুণাময়ী প্রকৃতি তাঁহার দুর্গতি-দর্শনে শিশিরাশ্রু বর্ষণ করিলেন!

পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি একবার—শেষবার তাঁহার শয়ন-কক্ষ পানে দৃষ্টিপাত করিলেন। সূচীভেদ্য অন্ধকারে বিশাল প্রাসাদ ভীমকায় হিমাদ্রির ছায়ার ন্যায় বোধ হইল, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তিনি একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে অস্পষ্ট উচ্চারণ করিলেন;—কিশোরি, চল্লাম,—তুমি ঘুমোও।

সহসা যেন সেই অন্ধকারময় কক্ষের মুক্ত বাতায়ন হইতে একটী করুণ আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিয়া নিশীথ ঝঙ্কারে মিলিয়া গেল। যদুনারায়ণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। তিনি আর কালবিলম্ব করিলেন না, উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে তিমির-সমুদ্রে লীন হইয়া গেলেন।

আর নবকিশোরী? সে যে এই খানিকক্ষণ কক্ষতলে অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিয়াছে! চিরারাধ্যের আগমন-প্রতীক্ষায়, কখন্ বা অনর্গল দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া, কখন্ বা বাতায়নপথে উঁকি দিয়া, কখন্ বা নিজ কম্পিত পদশব্দে চমকিত হইয়া নিতান্ত অশান্ত চিত্তে এই মাত্র অঞ্চল-শয্যায় শুইয়াছে! ইতিমধ্যে গবাক্ষাগত বায়ু-স্পর্শে দীপ

নিবিয়া গিয়াছে, ক্লান্তি-জনিত তন্দ্রায় সে তাহা জানিতে পারে নাই। আহা, বায়ু বুঝি বুঝিয়াই দীপ নির্ব্বাণ করিয়াছে!

নবকিশোরী স্বপ্ন দেখিতেছিল;—যদুনারায়ণ চলিয়াছেন,—অতি দ্রুত সে পদক্ষেপ। কিশোরী অনুপকে কোলে লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার নাগাল ধরিতে পারিতেছে না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদ-সিক্ত, পদতল কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত। তবু ভ্রূক্ষেপ নাই;—আশা—অবলম্বন তাহার সম্মুখে, আর একটু ছুটিয়া গেলেই সে তাহাকে ধরিতে পারিবে, সব জ্বালা, সব ক্লান্তি দূর হইবে। কিন্তু পা ত আর চলে না! অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতেছে, চক্ষু মুদিয়া আসিতেছে, সংজ্ঞাও বুঝি লুপ্ত হইয়া আসিতেছে! সে জড়িত কণ্ঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিল;—স্বামী, একমাত্র আশ্রয় আমার, একটু দাঁড়াও; অনুপকে কোলে নিয়ে আমি আর ত ছুটতে পারি না! তোমার দু-হাত বাড়িয়ে একবার দাঁড়াও প্রভু! তোমার কিশোরীকে বাহু-বেষ্টনীতে আক্‌ড়িয়ে ধরে, অনুপকে কোলে তুলে নাও দেব! স্বামী উদাসীন, তিনি যেন আরও ছুটিতে লাগিলেন। কিশোরী আর পারিল না, তাহার পদ-স্খলন হইল। নিষ্ঠুর! তবে দাসীর মরণ দেখে যাও,—বলিয়া সে যেন ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিল। ঠিক যেন সেই মুহূর্ত্তে সে শুনিতে পাইল, তাহার আরাধ্য-দেবতা বলিতেছেন;—কিশোরি! ঘরে ফিরে যাও। আমি যেখানে চলেছি, সে স্থান তোমার নয়, তুমি সেখানে যেতে পার্ব্বে না। আমার অনেক কাজ, তাই তোমাদের বাঁধন ছিন্ন করে এসেছি। সাধ্বী তুমি, ভাবী রাজমাতা তুমি, সীতার আদর্শ তোমার বুকে, সিদ্ধার্থ-পত্নী যশোধরার দৃষ্টান্ত তোমার সম্মুখে, অতীতের স্মৃতি নিয়ে ঘরে ফিরে যাও কিশোরি! কিশোরী তবু যেন অতি কষ্টে

উচ্চারণ করিল ;—তবে শুধু একবার শেষ পায়ের ধূলো দিয়ে যাও প্রভু! অমনি দূর-দূরান্তর হইতে উত্তর আসিল :—দৈহিক সম্বন্ধ আমাদের আর নেই, জীবনের পরপারে যেখানে সমাজের ব্যবধান নেই, সেখানে অশরীরী আত্মার চির মিলন হবে,—এ জন্মে আর নয়। সহসা তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। নবকিশোরী অত্যধিক আতঙ্কে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এ সেই চীৎকার—যাহা যদুনারায়ণের কর্ণে পৌঁছিয়াছিল।

মাতার আর্ত্তনাদে পালঙ্কোপরি শায়িত কুমার অনুপ—মাগো—বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পুত্রের ক্রন্দনে মাতার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। কিশোরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

এমন সময় রাণী ত্রিপুরা দেবী সেই অন্ধকারময় কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন :—বউমা, যদু এখনো আসেনি ?

কিশোরী নিরুত্তর,—সে তখন হাঁপাইতেছে।

সশব্দে দ্বার বন্ধ হইল। সহসা প্রাসাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কক্ষান্তরের বহির্দ্দেশে ক্রোধ-কঠোর নারী-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল ;—রাজা, রাজা, শীঘ্র উঠুন, যদু পুরী-ত্যাগ করেছে। এখনি এক সহস্র সৈনিক জলপথে প্রেরণ করুন্। আমি তাকে বন্দী দেখ্‌তে চাই।

অল্পক্ষণের মধ্যে দামামা-ধ্বনিতে সমস্ত সপ্তদুর্গা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

যদুনারায়ণ পূর্ব্ব হইতেই সাবধান ছিলেন। অদূরে চলনের বক্ষে কয়েকখানি বজরা ও ক্ষিপ্রগামী ছিপ্ সসৈন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রাজা অবনীনাথের সেনাদল সজ্জিত হইতে হইতে তিনি সেই নৌকাযোগে দ্রুতবেগে গৌড়াভিমুখে ধাবিত হইলেন। দূর হইতে সরণি-পতন-শব্দের ব্যবধানে দামামার অস্পষ্ট ধ্বনি শ্রুত হইতেছি হায়! কাহার জন্ত কাহার দামামা ধ্বনি!!

যদুনারায়ণের হৃদয়ে মাতা ত্রিপুরাদেবীর ভ্রূকুটী-ভীষণা রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তির বিদ্যুৎ ঝলকিয়া গেল! তিনি শিহরিয়া, আঁখি মুদিয়া উদ্দেশে মস্তক নত করিলেন।

—*—

৮

যদুনারায়ণ নির্ব্বিঘ্নে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পথ-শ্রান্তি ও মানসিক উদ্বেগের জন্য তিনি সে দিন আর রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না।

পর দিবসে যথারীতি দরবার-সভা আহূত হইল। গৌড়-সম্রাটের আসন শূন্য। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রতিনিধির আসন, ঐ আসনে বসিয়া রাজা গণেশনারায়ণ সাম্রাজ্য-চালনা করিতেন। যদুনারায়ণ আসিয়া সেই আসনে উপবেশন করিলেন। হিন্দু ও মুসলমান অমাত্যবর্গ ও আমীর-ওমরাহ্-প্রমুখ গৌড়ের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। দরবার-গৃহ লোকে লোকারণ্য। শান্ত্রী-সৈনিকগণ অতি সাবধানে দরবারের শান্তি-রক্ষা করিতেছে।

যথাসময়ে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমেই সেনাপতি কাসেম খাঁর আহ্বান। কাসেম খাঁ নিকটবর্ত্তী হইতেই যদুনারায়ণ স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহাকে বিশেষ অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক আসনে তাঁহাকে উপবেশনের অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

সেনাপতি কাসেম খাঁ! ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি স্বর্গত পরমারাধ্য পিতৃদেবের অনুজ্ঞাক্রমে দিল্লী-বাহিনীর গৌড়াক্রমণ ব্যর্থ কর্ত্তে সাম্রাজ্য-সীমান্তে যে দিন আপনি সসৈন্য যাত্রা করেছিলেন, সে দিন আপনাকে বীরোচিত সম্মানে ভূষিত করে সেই গৌরবের অভিযানে বিদায় দান

করেছিলেন, আমার পিতা স্বয়ং। কিন্তু আজ আর তিনি ইহজগতে নাই। আপনার বিজয়-বার্ত্তা তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, তার অবর্ত্তমানে আমি তার পুত্র এবং গৌড়-সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান প্রতিনিধি আপনাকে আপনার যুদ্ধ-জয়-জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কচ্ছি. আপনি এই দুর্দ্ধর্ষ সমরে যে রণ-পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন, তা গৌড়-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এই বিজয়-লাভের পুরস্কার-স্বরূপ রাজকোষ থেকে আপনাকে এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা এবং স্বর্ণ-খচিত অসি-চর্ম্ম উপহার প্রদত্ত হল। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আপনার স্বাস্থ্য ও বীর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকুক্ এবং আপনার দক্ষতায় গৌড়ের সমর-শক্তি উত্তরোত্তর অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করুক্। পরিশেষে আমার বক্তব্য, বিশেষ কার্য্যানুরোধে আমাকে সপ্তদুর্গায় যেতে হয়েছিল, সে জন্য আপনার রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের দিনই আপনাকে অভিনন্দিত কত্তে পারিনি, সে জন্য আমি দুঃখিত। আশা করি, আপনার উদার অন্তঃকরণ ইতঃপূর্ব্বেই আমার সে অনিবার্য্য অসমর্থতা মার্জ্জনা করেছে।

কিন্তু যদুনারায়ণের শিষ্টাচারপূর্ণ আপ্যায়নে কাসেম খাঁর হৃদয় বিশেষ কোনও প্রতিধ্বনি তুলিল না। তিনি সংক্ষেপে তাহাকে ধন্যবাদ ও প্রত্যভিবাদন জানাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তখন দরবার-কক্ষ মুখর করিয়া,—জয় সেনাপতি কাসেম খাঁর জয়—শব্দ উত্থিত হইল।

জয়-ধ্বনি স্তব্ধ হইতেই আমীর-ওমরাহগণের মধ্যে যেন একটা চাঞ্চল্যের সাড়া উঠিল। একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। যদুনারায়ণ তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং সভাসদ্-মণ্ডলীর পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ;—

ভাইসাহেবগণ ! আপনাদের মুখ-ভাব দেখে বোধ হচ্ছে, যেন এই দরবারেই আরো কোন্ বিশেষ বিষয়ের মীমাংসা কত্তে আপনারা ব্যগ্র হয়েছেন। বলুন,—আপনাদের বক্তব্য নিঃসঙ্কোচে বলুন। আজকার মীমাংসার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। গৌড়,—হিন্দু-মুসলমানের গৌড় আজ নিরুপদ্রুত, সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠ। জয়-জনিত পুলক-স্পর্শে আজ সকলের চিত্তে একই ভাবের অভিব্যক্তি। দ্বৈধ-দ্বেষ অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও সকলের হৃদয় থেকে নির্ব্বাসিত। পাঠান-বীর কাসেম খাঁ আজ সম্মানিত, সেটাও হিন্দু-মুসলমান উভয়জাতির পক্ষে তুল্য গৌরবের ও আনন্দের বিষয় বলতে হবে। সুতরাং, আজ এই আনন্দ-বাসরে আমাদের মধ্যে যে কোনো জটিল বিষয়ের মীমাংসা উদারতা ক্ষমা ও নিঃস্বার্থতার সাহায্যে অতি সহজেই সম্পন্ন হবে। বলুন, আপনাদের দ্বিধা কর্ব্বার কোনো প্রয়োজন নেই।

তখন উজিরসাহেব গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন ;—খোদাবন্দ্ ! বিষয় জটিলই বটে এবং আপনার পক্ষে—

যদুনারায়ণ অতি শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—বলুন, আমার পক্ষে সে বিষয় কি বিশেষ প্রীতিকর হবে না ?

আজ্ঞে হাঁ।

যদুনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ;—উজির সাহেব ! আপনি সে জন্য কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ? শুধু আমার প্রীতির খাতিরে সাম্রাজ্য চলতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান সমগ্র জাতির সম্প্রীতিই আমাদের প্রধান কাম্য। যদি সে জন্য আমার প্রীতি বিনষ্টই হয়, হোক্, আমি অপ্রীতিকর বিষয় অবিকৃত চিত্তে শুনতে রাজি আছি। আপনি বলুন।

উজির সাহেব বলিলেন ;—আবেদন দুটা,—দুটাই মুসলমান পক্ষ থেকে।

বেশ, প্রথম আবেদন কি ?

প্রথম আবেদন,—আপনার পিতা মহারাজ গণেশনারায়ণের মৃত্যুর পর থেকে গৌড়ীয় মুসলমান-সমাজ এই অভিমত প্রকাশ কচ্ছেন,—ভাবী সম্রাটের প্রতিনিধি প্রতি বার হিন্দু হবেন কেন ? মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত সম্রাজ্য, গৌড়ের ভাবী সম্রাট—তিনিও মুসলমান-সন্তান হবেন—এই যখন স্থির, তখন হিন্দুর প্রাধান্য চিরদিন মুসলমানই বা মাথা পেতে নেবে কেন ? মুসলমান-সমাজে রাজ্য-চালন-সামর্থ্যের অসদ্ভাব নেই। এজন্য তাদের একান্ত অভিলাষ, কোনও মুসলমান যোগ্য ব্যক্তি এখন থেকে শাসনভার গ্রহণ করেন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া উজির সাহেব ক্ষণকাল নীরব হইলেন। যদুনারায়ণ গম্ভীরভাবে সমুদয় শুনিতেছিলেন। প্রতিভা-মণ্ডিত মুখ-মণ্ডল ম্লান, কিন্তু কোনও প্রকার অস্থৈর্য্যের চিহ্ন তাহাতে নাই। তিনি ধীরভাবে বলিলেন ;—

এখন বলুন, আপনাদের দ্বিতীয় আবেদন কি ? অনুমান হয়, প্রথমটীর সহিত দ্বিতীয় আবেদনের কোনো সংস্রব থাকতে পারে, তাই এক সঙ্গে দুটী আবেদনই শুনতে ইচ্ছা কচ্ছি।

উজির সাহেব তাঁহার পক্ব শ্মশ্রু কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন ;—আজ্ঞে—দ্বিতীয় আবেদনটী ঠিক আবেদন নয়, এটা একটা অভিযোগ। বিষয়টী মুখে ব্যক্ত করা ততটা সঙ্গত বলে বোধ হয় নি—সেজন্য সেটাকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বর্ণিত ব্যাপার প্রথমে জনশ্রুতি থেকে সংগৃহীত ও পরে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা সত্য বলে সমর্থিত ও হয়েছে। অবশ্য, তিনিও এই সভাস্থলে উপস্থিত আছেন।

এই বলিয়া উজিরসাহেব অভিযোগ-পত্র খানি যদুনারায়ণের হস্তে অর্পণ করিলেন। যদুনারায়ণ মনোযোগ-পূর্ব্বক তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। দরবার-গৃহ নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে উদ্বেগ, কাহারও মুখে কৌতুহল, কাহারও মুখে ভীতির চিহ্ন প্রকটিত। কাহারও বদন অবনত, আবার কেহবা অপলক দৃষ্টিতে যদুনারায়ণের পানে চাহিয়া সেই স্থির শান্ত সৌম্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং বিচারক! একদিকে সমগ্র মুসলমান, অন্যদিকে ভাবী-সম্রাটের ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধির আসনে উপবিষ্ট তৎপুত্র যদুনারায়ণ—যাঁহার প্রতিনিধিত্ব মুসলমান-কর্ত্তৃক অস্বীকৃত। উত্তরই বা কি, মীমাংসাই বা কি, আর পরিণামই বা কি, জানিবার ঔৎসুক্য অতি স্বাভাবিক। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অভিযুক্ত অপেক্ষা দর্শক ও অভিযোক্তার চাঞ্চল্যই অধিক!

অভিযোগ-পত্র পাঠান্তে যদুনারায়ণ আসন ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন;—সহৃদয় বন্ধুগণ! আজ আমার প্রতি আপনাদের অকপট ব্যবহারে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য হিন্দু-মুসলমানে সাম্য। দ্বৈধ তার অন্তরায়। সেই দ্বৈধ আবার অন্তর্নিহিত থাকলে আরো ভয়ঙ্কর। সরলতার ফুৎকারে সে অন্তর্নিহিত বহ্নি উদ্দীপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাতে পরস্পরের হৃদয় বেশী দগ্ধ হবার অবসর পায় না, আগুন ফুটে-উঠ্‌তে উঠ্‌তেই তাকে নির্ব্বাণ করা সহজ হয়। আমি আবার বলি, আমাদের সকলের উদ্দেশ্য হিন্দু-মুসলমানে সাম্য। সুতরাং, যাতে হিন্দুর সুবিধা হয়, আর মুসলমানের ক্ষতি হয়, সেরূপ কোনো কার্য্যের অনুষ্ঠান আমাদের পক্ষে কোনো মতে শোভন হতে পারে না। আমি আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এইটুকু

বুঝতে পেরেছি, ত্যাগই সাম্য-প্রতিষ্ঠার সহজ সরল সুগম পথ। সেজন্য সেই ত্যাগটাকেই আমাদের সর্ব্বকার্য্যে মূলমন্ত্র কত্তে হবে। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর থেকে আপনাদের মধ্যে যে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে, সেটা যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাও বল্‌তে পারিনা। কি উপায়ে এই ভাবান্তর দূর করা যেতে পারে, সে চিন্তাও আমি বহুদিন থেকে করে আস্‌ছি। নানা ঝঞ্ঝাটে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকায়, বিশেষতঃ, আমাদের খাঁসাহেব সমর-ব্যাপারে লিপ্ত থাকায়, আমি এত দিন আপনাদের সকলের সমবেত যুক্তির অবকাশ পাইনি। আজ সে সুযোগ এসেছে এবং পূর্ব্বেই আপনারা আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। আপনাদের একান্ত ইচ্ছা, কোনো মুসলমান যোগ্য ব্যক্তি গৌড়ের শাসনভার গ্রহণ করেন। খুব ভাল কথা। আরো সুখের বিষয়, সে যোগ্য ব্যক্তিও আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। মুসলমান ভ্রাতৃগণ! খুব বিশ্বাস, আজ আমি যাঁকে সেই যোগ্য ব্যক্তি বলে মনোনীত কর্ব্বো আপনারা তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন কর্ব্বেন।

হিন্দু-মুসলমান সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সন্ধান করিতে লাগিলেন। কৌতূহল ও ঔৎসুক্যে সকলের হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন পার্শ্বস্থ ব্যক্তি পর্য্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন। যদুনারায়ণের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন;—

বন্ধুগণ, আমার মনোনীত ব্যক্তি আর কেউই নন, তিনি মুসলমান বীরাগ্রগণ্য কাসেমখাঁ। কি শৌর্য্যে, কি বুদ্ধিমত্তায়, কি শাসন-পটুতায় আমাদের ভাইসাহেবের সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভা। শুধু

আমিই যে তাঁর প্রশংসাবাদ কচ্ছি, তা নয়, আমার পিতাও তাঁর কৃতিত্বের প্রশংসা করে গেছেন। ভাইসাহেবের পরামর্শ-ব্যতীত তিনি যে কোনো গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ কত্তেন না, তা ত আপনাদের অবিদিত নেই। এইবার তাঁর প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ হবার সময় এসেছে। বন্ধুগণ! আপনারা আপনাদের স্বজাতি-গৌরব কাসেমখাঁকে প্রতিনিধির আসনে বসিয়ে তার গৌরব-বৃদ্ধি করুন।

তখন চতুর্দ্দিক হইতে ধ্বনি উঠিল,—জয় প্রতিনিধি কাসেমখাঁর জয়, নির্ব্বাচন অতি সুন্দর হয়েছে। কিন্তু কাসেমখাঁ অতি সঙ্কুচিত-ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাহার মুখ-মণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। হিন্দুগণ নির্ব্বাক্—মুখে বিরক্তি।

যদুনারায়ণ দাঁড়াইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন;—ভ্রাতৃগণ! নির্ব্বাচন-বিষয়ে যে আমরা একমত হতে পেরেছি, এ একটা সৌভাগ্যের কথা বল্‌তে হবে। কিন্তু এই সঙ্গে আরো একটী বিষয়ের মীমাংসা দরকার। স্বজাতি-প্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে এখনো আপনারা এই দীন ব্যক্তির বিষয় ভাব্‌বার অবসর পান নি, আর সেটা ত খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এটাও কি এই ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয় যে, যার পিতা এই সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য তাঁর শেষ জীবন পর্য্যন্ত সমস্ত উদ্যম ব্যয় করে গেছেন, যে নিজে এতদিন সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য তার সমস্ত চেষ্টা সাধ্যমত নিয়োগ করে আস্‌ছে, যে নিজে এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় কর্ব্বার জন্য প্রতিনিধির আসন বিনা আপত্তিতে পরিত্যাগ কত্তে প্রস্তুত, সে কি এই সাম্রাজ্যের সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে শুধু রিক্ত-হস্তেই চলে যাবে? এই সাম্রাজ্যের জন্য তার প্রাণ কি একটুও কাঁদে না! তার পিতার আরব্ধ সাম্য-প্রতিষ্ঠা কি এই খানেই স্তব্ধ হয়ে যাবে!

তা নয়। আর আপনারাও কখনই ততটা হৃদয়হীন হতে পারেন না। ভ্রাতৃগণ, আমি প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ কত্তে খুবই রাজি আছি, কিন্তু সাম্রাজ্যের সংশ্রব ত্যাগ কত্তে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। আশা করি, আমার এ অক্ষমতা আপনারা বরণ করে নেবেন এবং আমার ও ভাইসাহেবের পদ-বিনিময়ে সম্মতি প্রকাশ কত্তে ইতস্ততঃ কর্বেন না।

কিন্তু এবার কোনও দিক্ হইতে সম্মতি-সূচক কোনও ধ্বনি উত্থিত হইল না। দরবার কক্ষ স্তব্ধ। যদুনারায়ণ ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ;—

মৌন-ভাব সর্ব্বত্র সম্মতির চিহ্ন নয়, হতেও পারে না। আর আপনারা কেন যে এ প্রস্তাব সমর্থন কত্তে পাচ্ছেন না, তাও বুঝতে পেরেছি। এখানেই আপনাদের দ্বিতীয় আবেদন বা অভিযোগের সম্বন্ধ। সুতরাং, পূর্ব্বেই সেটার একটা নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। বংশের গরিমা বা জাতীয় মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে ভেবে, আপনাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে আপনারা আমার হস্তে দিয়েছেন। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, সাহজাদা আজিমসাহের কন্যার সহিত আমার যে ঘনিষ্ঠতা, তার মধ্যে ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক নেই, সে আত্মীয়তায় অবৈধ প্রণয় নেই, তার মধ্যে সৌন্দর্য্য-লিপ্সা বা সম্রাজ্য-লিপ্সা নেই। যে বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ সংক্রান্ত জনশ্রুতির মূল সত্য নির্ণয় বা সংগ্রহ করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই জানেন, যুবক-যুবতীর একত্র-বাস-জনিত প্রেমোন্মেষের উত্তেজনায় এই ঘনিষ্ঠতা সূচিত হয় নি। এই ব্যাপারের সূত্রপাত মহাত্মা আজিমসাহের সমাধি-মন্দিরে, শোক-সন্তপ্তা কন্যার পিতৃ-নির্দেশে। এ ঘনিষ্ঠতার উদ্দেশ্য মহান্, হিন্দু-মুসলমানে সাম্যই এ মিলনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর্ব্বে।

সমস্ত জন-মণ্ডলী যেন অত্যধিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। তথাপি যদুনারায়ণ ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন ;— ভদ্রগণ! বড়ই সমস্যার কথা—এই বিসদৃশ মিলন। কিন্তু আপনারা একটু প্রণিধান করুন, জগতে যত মহৎ কার্য্য সংসাধিত হয়েছে, বৈসাদৃশ্যই তার প্রথমে। হজরত মহম্মদের ধর্ম্ম-প্রচার বৈসাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে, যীশুখৃষ্টের জীবন-পাত ধর্ম্মপ্রচার ঐ বৈসাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে, আর হিন্দু-ধর্ম্মের ত কথাই নেই। ধর্ম্ম, সমাজ বা জাতিকে পুনর্গঠিত কত্তে হলেই বৈসাদৃশ্য চাই-ই। ভাঁটার পর যখন জোয়ার আসে, তখন একটা উচ্ছ্বাস্ উঠ্‌বেই উঠ্‌বে। সুতরাং, সে বৈসাদৃশ্য অস্বাভাবিক ত নয়,—সে বিধি-নির্দ্দেশ। আজিমকন্যা আশমানতারাকে আমার গ্রহণ কত্তেই হবে—সেই বৈসাদৃশ্যকে নিমন্ত্রণ করে। অন্য কোনো উপায় নেই।

যদুনারায়ণের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল। তিনি বলিতে লাগিলেন ;— হিন্দুসমাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—যদি কোন যুক্তি থাকে, যাতে এই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ মিলনকে মেনে নেওয়া যায়। রক্ষণশীল সমাজ এ ব্যভিচার বলে উপেক্ষা কল্লেন! মুসলমানী শূদ্রাণী হতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণী হতে পারে না। দুর্ভাগ্য আমার, শাস্ত্রে কোনো বিধান নেই! যুগ-যুগান্ত প্রচলিত যে শাস্ত্র তার সংস্কার কর্ব্বারও সাধ্য কারো নেই! সুতরাং—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি ক্ষণকাল কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। হৃদয়াবেগ যেন কতকটা সংযত করিয়া লইলেন। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া, সেই সুতরাং এর পরবর্ত্তী বাক্য শ্রবণ করিতে স্তব্ধভাবে অবস্থান করিয়া রহিলেন। তখন অতি মর্ম্মস্পর্শী করুণকণ্ঠে উচ্চারিত হইল ;—

সুতরাং, এক্ষেত্রে যে পথ অপেক্ষাকৃত উদার, যে ধর্ম্ম এই মিলনের পরিপন্থী নয়, আমার সেই পথ—সেই ধর্ম্ম গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নেই। মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! গৌরবান্বিত হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করে, আজ আমি সাম্য-প্রতিষ্ঠার সহায়করূপে আপনাদের আশ্রয় ভিক্ষা কচ্ছি। সমাজ-ত্যক্ত এই দীন ব্যক্তিকে আপনারাও কি প্রত্যাখ্যান কর্ব্বেন?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যদুনারায়ণ অতি ম্রিয়মাণভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। কক্ষতল একেবারেই নির্ব্বাক্। সকলে নিস্পন্দভাবে যদুনারায়ণের পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন;—এ কি প্রস্তাব!

কিন্তু কাসেম খাঁ বেশীক্ষণ সে অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না। যদুনারায়ণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ, যুক্তিবহুল উক্তি, অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অকপট একনিষ্ঠতা ইত্যাদি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার উদার চিত্ত যেন কোন্ মহত্তর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—গাত্রোত্থান করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন;—

ইস্‌লামধর্ম্মী সুহৃদ্‌গুলি, এখনো আপনারা নির্ব্বাক্! পরম কারুণিক খোদাতালার আশীর্ব্বাদে, আপনাদেরই সনাতন ধর্ম্মের উদারতায়, আজ যে এক অতি-বাঞ্ছিত অতিথি আপনাদের হৃদয়-কবাটে আঘাত কচ্ছে, তার জন্য অর্গল মুক্ত কত্তে এখনো আপনারা হতবুদ্ধি হচ্ছেন! কুমার! আমাদের সব অভিযোগ আবেদনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। কাসেম খাঁই সে জনশ্রুতির সত্যতা নিরূপণ করেছিল। সে প্রথমে বুঝতে পারে নি, আপনি কত বড়,—আজ তার সংশয় দূর হয়ে গেছে, সে বুঝেছে, তার আসন আপনার অনেক নীচে। আজ তাকে আপনি সর্ব্বপ্রথমে যে সম্মানে সম্মানিত করেছেন, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট সম্মান।

সে চিরদিন আপনার মহত্ত্বের ছায়াতলে থাকতে চায়, তাকে আপনার অধীনস্থ সেনাপতি থাকতে অনুমতি দিন্। আর সমবেত মুস্‌লিম্ সম্প্রদায়, সমস্ত ভদ্রমণ্ডলি, আমার আর এক প্রস্তাব, কুমার যখন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তেই প্রস্তুত এবং সাহজাদী আশমানতারাকে মুসলমান ধর্ম্মমতে বিবাহ কর্ত্তে স্বীকৃত, তখন আর সম্রাটের আসন শূন্য থাকবে কেন? অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম-সম্পাদনের উৎসব-বাদ্য অবিলম্বেই বেজে উঠুক।

অমনি সমগ্র মুসলমানমণ্ডলীর মধ্য হইতে একবাক্যে স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভাবী সম্রাটের জয়ধ্বনি দরবারগৃহ চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু হিন্দু সভাসদবর্গ নিতান্ত বিমর্ষ চিত্তে সভাস্থল ত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন। যদুনারায়ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

হিন্দু ভ্রাতৃগণ! আমি বেশ জানি, এ সংবাদ আপনাদের মর্ম্মে বড়ই আঘাত কর্ব্বে। কিন্তু একবার এই দীন ব্যক্তির পানে দৃষ্টিপাত করুন। পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে যার জন্ম, রাণী ত্রিপুরা দেবী যার মাতা, কুলপতি রাজা অবনীনাথের দুহিতা যার পত্নী, সে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে কেন? রাজা গণেশনারায়ণের ঐশ্বর্য্য গৌড়-সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা বিশেষ ন্যূন নয়, ভাদুড়ীচক্রের একমাত্র বংশধরের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রতিহত করে, এমন শক্তিও গৌড়-সাম্রাজ্যে কারো নেই ; তবে কেন এমন হয়? হলেও, যার ধমনীতে ব্রহ্ম-শোণিত, যার গলদেশে যজ্ঞসূত্র, যে এখনো হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসবান্ এবং আজীবন সেই বিশ্বাসকে বহন কর্ব্বে, মুসলমানধর্ম্ম আশ্রয় কল্লেই তাকে হিন্দুদ্বেষী হতে হবে কেন? হিন্দু আমার পিতা, হিন্দু আমার মাতা, হিন্দু আমার পত্নী পুত্র, হিন্দু আমার খেলার সাথী প্রতিবেশী, বাঙ্গালী হিন্দুর বঙ্গমাতা আমার ধরিত্রী, হিন্দুত্ব আমার

অস্থি মজ্জায়, মর্ম্মে-মর্ম্মে, জ্ঞানে, কর্ম্মে,—প্রতিবিষয়ে, হিন্দুদ্বেষী হবার সাধ্য কি আমার! এখনো যে সেই মূর্ত্তিমতী তেজস্বিতা মা আমার, আমার আরাধ্যা দেবী, এখনো যে সেই প্রেমমাধুর্য্যময়ী সাধ্বী আমার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ পুণ্যোজ্জ্বল করে বিরাজ কচ্ছে, এখনো আমার স্নেহের অনুপের কুসুম-পেলব-স্পর্শ আমার বক্ষের অস্থিরতায় সান্ত্বনা দান কচ্ছে! সে কি ভুলতে পার্ব্বো! আমি যে নন্দন-কানন ত্যাগ করে এসেছি, সে কি ভুলতে পার্ব্বো!

বলিতে বলিতে যদুনারায়ণের কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল, তিনি অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

আমি কঠোর, কিন্তু হৃদয়হীন নই ; আমি স্বসমাজত্যাগী হয়েছি, কিন্তু স্বজাতি বা স্বধর্ম্মদ্রোহী হতে পার্ব্বো না। সমাজ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম এক ; অনুষ্ঠান বিভিন্ন, কিন্তু কর্ত্তব্যের উদ্দেশ্য এক। বিচলিত হয়ো না ভাই! যদুনারায়ণ অকৃতজ্ঞ নয়, কুসন্তান নয়। কর্ত্তব্যের প্রেরণায় সে যূথভ্রষ্ট হয়েছে বলে, সে তার আজন্ম-সঞ্জাত প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হারাবে না হারাবে না হারাবে না। সাম্য যার কাম্য, একদেশ-দর্শিতার পূজা সে করে না। স্থির জেনো—হিন্দু আমার ভাই, আর মুসলমান আমার বন্ধু ; হিন্দু স্ত্রী আমার পত্নী, আর মুসলমান ভাবী-স্ত্রী আমার ভবিষ্যতের জীবন-সঙ্গিনী। কেউ কম নয়, কেউ উপেক্ষার নয়। এস ভাই সব, বন্ধু সব, আমার সহায় হও,—হিন্দু-মুসলমানের হৃদয়-ক্ষেত্রস্থ আলি-বন্ধন ভেঙ্গে দিয়ে, তার উপর প্রেমের বীজ ছড়িয়ে, সমগ্র গৌড়-বাসীকে একটা নব জাতিতে পরিণত করি। একযোগে মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা-কাঁসর বেজে উঠুক, মসজিদে মসজিদে আজান-ধ্বনি উদ্গীত হয়ে গৌড়ের আকাশ প্রান্তর মুখর করে তুলুক।

বলিতে বলিতে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবোন্মেষে বিভোর হইয়া, যদুনারায়ণ নিষ্পলক নেত্রে শূন্যপানে চাহিয়া রহিলেন, আর তাঁহার গণ্ড বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল!

সভাস্থ হিন্দু-মুসলমান সকলেই একান্ত বিমূঢ়ভাবে বক্ষ-সম্বদ্ধ-যুগ্মবাহু অভিনব প্রেমিকের ভাবাভিনয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন!

ধর্ম্ম-ত্যাগ না ধর্ম্ম-বন্ধন!

৯

জগতে ভাবিয়া করা অপেক্ষা করিয়া ভাবাটাই বেশী। কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক সময় এমন ব্যাপার উপস্থিত হয়, যাহার পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়া, মীমাংসা করিবার অবসর পাওয়া যায় না; প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের বলে বা সহজাত-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা হয় একটা নিষ্পত্তি ভিন্ন তখন আর উপায়ান্তর থাকে না। সেরূপ অবস্থায় কৃত কার্য্যের সমালোচনা, এমন কি, ফলশ্রুতির পরেও ঘটিয়া যায়। তখন, "আহা এইটী যদি করিতাম, তাহা হইলে, এরূপটী হইত না,—কিন্তু এইটী যে করিয়াছি, খুব ঠিকই করিয়াছি,"—ইত্যাদি নানা তর্ক-বিতর্কের পর, "যাক্, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আর উপায় কি?" বা "বেশ হইয়াছে" এই প্রকার মন্তব্যের দ্বারা চিন্তার উপসংহার হয়।

কাসেম খাঁ এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবেন নাই, সেদিনকার দরবারে ঐরূপ অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইবে। যদুনারায়ণ মুসলমান হইবেন, এ যেন একটা স্বপ্নাতীত ঘটনা। স্বধর্ম্মে অন্ধ-বিশ্বাসী কাসেম খাঁ এখনও অবধি ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই, কি করিয়া যদুনারায়ণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। যাহা হউক, যখন সেই অচিন্তিত ব্যাপারই ঘটিতে চলিল, কাসেম খাঁ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে স্বজাতি-প্রীতির ও উদারতার স্বভাব-সঞ্জাত বৃত্তি জাগিয়া উঠিল, তিনি যেন তাহারই প্রেরণায় এমন একটী কার্য্য করিয়া ফেলিলেন, যাহা তাঁহার করণীয় ছিল কিনা, দেশ-কাল-পাত্রোচিত কিনা,

আত্ম-প্রতিষ্ঠার দ্যোতক কিনা, কিছুই ভাবিবার অবসরটুকুও পাইলেন না। কাসেম খাঁ যদুনারায়ণকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এটা ঠিক। এমন কি, এক সময় তিনি তাঁহাকে ভ্রাতৃত্বের কোমল নিগড়ে আবদ্ধ করিবার স্পৃহাও পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে স্পৃহা ফলবতী হইবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। জাতীয়ত্বের দুর্ভেদ্য গণ্ডী ডিঙ্গাইবার দুঃসাহস একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়, ইহা তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতেন। যে দুর্গ-কবাটে গিয়া তিনি কতবার করাঘাত দিয়াছেন এবং এ দ্বার খুলিবার নহে ভাবিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আজ সহসা তাহার অর্গল উদ্‌ঘাটিত হইল, এ ত সামান্য প্রসন্নতার বিষয় নহে! রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া যে স্রোত প্রতিহত হইতেছিল, আজ তাহা পূর্ণোচ্ছ্বাসে নৃত্য করিয়া উঠিল, ভদ্রা-পূর্ণিমার পূর্ণ-জোয়ারে তাঁহার হৃদয় প্লাবন-বিস্তীর্ণ হইয়া গেল। উক্ত অসম্ভাব্য ভ্রাতৃত্বের বিনিময়েই তিনি একদিন তাঁহাকে সম্রাটত্ব অবধি দিতে চাহিয়াছিলেন, আজ যেন সেই সুযোগ অতি অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি সহসাই তাঁহার সে আকাশ-কুসুমের প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু তিনি ত শুধু উদার ছিলেন না, তিনি যে রাজনীতিজ্ঞ। সুতরাং, ঔদার্য্যের বশে তিনি যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন রাজনীতির তুলাদণ্ডে তাহার পরিমাণ করিতে বসিলেন। করতলগত প্রতিনিধিত্ব তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন, উচিত হইল কি? আশমানতারা-লাভ না হয় না-ই হইত, কিন্তু এত বড় একটা লাভ, যাহার সহিত বিশাল গৌড়-সাম্রাজ্য জড়াইয়া তাঁহার মুষ্টির মধ্যে আসিত, এত বড় একটা প্রতিষ্ঠা, যাহা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাকে ঐ সম্রাটের পদেই অধিষ্ঠিত করিত, সবই বিসর্জ্জন দিতে হইল—ভাল হইল কি? ভাল হয় নাই বা কেন?

পদ-বিনিময়,—তিনি প্রতিনিধি আর যদুনারায়ণ সেনানায়ক ! সে কি হয় ? সাম্রাজ্যের শক্তি সৈন্য। তাহা কি পরহস্তে দেওয়া যায় ? যদুনারায়ণের ন্যায় কৌশলী বীরের নায়কত্বে সাম্রাজ্য-শক্তি অর্পিত হইলে, সেই ত সম্রাট্, তিনি প্রতিনিধি—পুত্তলিকা মাত্র ! সুতরাং, প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ কাসেম খাঁর বাঞ্ছনীয় নহে। বরং, আজ এই স্বেচ্ছাকৃত হীনতা, প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া অর্জ্জিত হইলেও, একদিন প্রয়োজন হইলে, এতদূর শক্তি-সঞ্চারী হইয়া উঠিতে পারে যে, যদুনারায়ণ ত যদুনারায়ণ, ভারতের সমস্ত শক্তিকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে। সুতরাং, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ না করিয়া তিনি শুধু চিত্তৌদার্য্যের পরিচয় দেন নাই, নীতিজ্ঞতারও পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু এই ভাবেই কি দিন কাটিবে ? এত দিনের কল্পনা-কল্পনা সমস্তই ত ব্যর্থ হইতে চলিল ! কিসের জন্য এত উদ্যম, প্রতিষ্ঠা লাভের এত প্রচেষ্টাই বা কেন ? বীর্য্যে, আভিজাত্যে, রূপৈশ্বর্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সৌভাগ্যবান্ হইয়াও ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রার্থিত বস্তুর যোগ্য হইয়াও আজ এ কি পরিহাস ! এ ত শূন্যে সৌধ নয়, এ যে পর্ব্বত-ভিত্তির উপর স্থাপিত অট্টালিকা ! তাহাই টলিয়া উল্টাইয়া গেল, এ কি কম পরিতাপ ! শুধু কাসেম খাঁ বলিয়া, এখনও তাহা সহ্য করিতে পারিতেছেন, অন্যে হইলে হয়ত পারিত না। কিন্তু সহিষ্ণুতা থাকিলেই কি দাহিকাশক্তি নষ্ট হয় ? তা ত হয় না। যদিও তিনি তাঁহার প্রতি অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর উপহাস হাসিয়াই উড়াইবার চেষ্টা করিলেন, তবু অন্তরস্থ ব্যর্থতার স্মৃতি টাকার আগুনের মতই তাঁহার মর্ম্মস্থল খাইয়া খাইয়া চলিতে লাগিল।

নিতান্ত চিন্তাকুলচিত্তে কাসেম খাঁ দুর্গাভ্যন্তরস্থ প্রাসাদের ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। অন্ধকারময়ী রজনী প্রায় সমগ্র নগরীকে ঘুম

পাড়াইয়াছে, কাসেম খাঁকে পারে নাই। চতুর্দ্দিক এক প্রকার নিস্তব্ধ, কর্ম্ম-কোলাহল নাই, শুধু নিশীথের ছম্-ছম্ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে,—কাসেম খাঁর সেদিকে লক্ষ্য নাই। আকাশ ঠিক মেঘাচ্ছন্ন নহে,—দুই একটী ক্ষীণরশ্মি তারকা ক্ষণিক দৃষ্ট, ক্ষণিক অদৃশ্য হইতেছিল। কাসেম খাঁ বোধ হয়, সেদিকেও লক্ষ্য করেন নাই,—চিত্ত এতই বিক্ষিপ্ত!

বড় ক্ষোভে কাসেম খাঁর চক্ষে জল আসিল। হায়! বুঝিল না সে, কতটা আশা লইয়া, কতটা ভালবাসা লইয়া গিয়াছিলেন তিনি, তাহার হৃদয়ের দ্বারে উপঢৌকন দিতে! অগাধ প্রেমের কি এই প্রতিদান! অযাচিত ভালবাসার কি এই মূল্য-নির্দ্ধারণ! ওঃ কি নিষ্ঠুর! অমন কুসুম-কান্ত কোমলতার মধ্যে এত কঠোরতা,—এ যে স্বপ্নের অগোচর! সে কি রূপ, কি মুখচ্ছবি! সে কি মিষ্টকথা,—সে কি সুধাবর্ষী সরল সম্ভাষণ,—সে কি মর্ম্মস্পর্শী অকপট আত্মপ্রকাশ! সমস্তই প্রহেলিকা, সমস্তটাই ছলনা,—আগা-গোড়াই তাহার প্রপঞ্চের মত রহস্যময়! সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে কি তাহার হৃদয়ের কোনও সন্ধান নাই! সুন্দরীর ঔদার্য্যে কি শুধুই শঠতা—কপটতা!—অসম্ভব। রূপ খোদার দান, গুণও খোদার দান; যেখানে সেই রূপ ও গুণের সমাবেশ তাহার মধ্যে,—না—না তা ত হয় না,—সে যে মহাদান খোদার! তাই ত, গোলাপেই কণ্টক! স্ত্রী-চরিত্র সমস্যা নয় ত কি? .. ...

অথবা সে-ই বুঝিল না,—প্রেম কি! আজ তাহার সমস্ত দেহখানির উপর দিয়া যে মহোৎসবের শোভাযাত্রা চলিয়াছে, অল্পবুদ্ধি নারী জানিল না,—জানিতেও চাহিল না, সে উৎসব কেন,—কিসের জন্য,—তাহার সার্থকতা কি! শুধু একটা প্রেরণায়, একটা খেয়ালে,—একটা বিকৃত সংস্কারে সে তাহার জীবনের এতবড় অবসর হেলায় হারাইল! যদুনারায়ণ

বীর,—চতুর,—রূপবান্,—সর্ব্বগুণসম্পন্ন,—প্রেমিকও। কিন্তু কেমন সে প্রেম? সে প্রেমের মূল্য কি? বিবাহিত, সন্তানের পিতা যদুনারায়ণ,—তাহার ভাণ্ডারের কতটা এবং কি ভাবের প্রণয় লইয়া, আজ আশমান-তারাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত? এত সহজ কথা,—বুঝিল না সে,—স্বেচ্ছায় জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিল! ....

একদিন কিন্তু এ মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিবে। একদিন বুঝিবে, আশ-মান জীবনের বিষয়ে কত বড় একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে। একদিন বুঝিবে, কাসেম খাঁই তাহার যোগ্য অতিথি ছিল,—তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সে ভাল কাজ করে নাই। তিনি তাহাকে তাঁহার হৃদয়ের এক-চ্ছত্রাধীশ্বরী করিতে চাহিয়াছিলেন, যদুনারায়ণের হৃদয়ে তাহার জন্য সে আসন কোথায়? যে দিন সে তাহা বুঝিবে,—যে দিন সে ঐ মিলনকে নৈরাশ্যের নিগড় বলিয়া জানিবে,—ওঃ! সে কি ভীষণ দিন তাহার,—সে কি অনুশোচনা!—কিছুতেই সে জ্বালা জুড়াইবে না। সেদিনও বড় বেশী দূরে নয়। যদুনারায়ণের আশমানতারার পাণিগ্রহণ,—মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রহণ,—রাজনৈতিক ছল। হিন্দু-মুসলমানে সাম্য, কত তাহার অন্তরায়,—অসম্ভব ব্যাপার। তাহার প্রতিষ্ঠা,—সন্দেহ হয়, যেন তাহার মধ্যে যদুনারায়ণের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। যাহার শিরায় হিন্দু-শোণিত, সে কেমন করিয়া মুসলমান হয় ধারণা হয় না। এতদিন গৌড়ে আসিয়াছেন,—এতদিন হিন্দুর সহিত মিশা-মিশি করিতেছেন, তথাপি, আজও কাসেম খাঁর বুঝিতে বাকি আছে,—হিন্দু কি জাতি! বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, কৌশলে, রণ-পাণ্ডিত্যে, সাম্রাজ্য-পরিচালনে সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের প্রতিভা। তবে তাহারা চুপ করিয়া থাকিবে কেন? ছলে—বলে—কৌশলে তাহারা তাহাদের হৃত-অধিকার

পুনরুদ্ধার করিবে না কেন? তাহারা মুসলমানকে ভালবাসিবে কেন? যাহারা তাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে,—তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া কেন তাহারা সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইবে? হইতেই পারে না। সুতরাং, যদুনারায়ণের মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ, মুসলমান জাতিকে মোহান্ধ করিয়া, হিন্দুর কবলগত করার জন্য, মুসলমানকে নির্ব্বীর্য্য করার জন্য। কিন্তু কতদিন ছদ্মবেশ আত্মগোপন করিবে? ......

কিন্তু তবু যেন ভরসা হয় না,—যদুনারায়ণ কপটাচারী, ইহা যেন বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না! সেই ঔদার্য্য-মণ্ডিত মুখ-মণ্ডলে কই ছলনার ত কোনও আভাসই ছিল না! অকপট চিত্তেই ত সেদিনকার তাহার আত্ম-নিবেদন! হিন্দু কি আপনাকে এতটা সাম্‌লাইবে? হইতেই পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি এত সহজে নিজ সমাজ, নিজ ধর্ম্ম, নিজ পরমাত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কি আছে? শুধু সাম্রাজ্যের জন্য,—শুধু আশমানতারার জন্য, ভয়ানক সমস্যা! কিন্তু একটী কথা, যদুনারায়ণের এই বিসদৃশ ব্যবহার হিন্দুগণ কি নীরবেই সহ্য করিবে? কখনই নয়;—যদি তাহাদের মধ্যে জাতীয়ত্বের এতটুকু স্পন্দন এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, কখনই তাহারা যদুনারায়ণকে ক্ষমা করিতে পারে না। এতবড় একটা ধর্ম্মান্ধ জাতি, যাহাদের পুনরুত্থানের ক্ষীণ আশা এই বিপ্লবের দিনে বিজলী-বিকাশের ন্যায় ক্ষণিক আশ্বাস দান করিয়াছিল, আজ তাহাই তাহাদিগকে ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে,—যে তরণী-সাহায্যে তাহারা তীরে উত্তীর্ণ হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিল,—আজ সেই অবলম্বনই ভঙ্গ হইল, এই নিদারুণ সংবাদ যখন তাহাদের মর্ম্মদ্বার পুনঃ পুনঃ আঘাতে বিদীর্ণ—চূর্ণ করিয়া ফেলিবে, তখন সে কি ব্যর্থ-শিকারের চাঞ্চল্য লইয়া একটী-

বারও আস্ফালন করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে। যদি না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হিন্দুজাতি সত্যসত্যই মৃত। যাহারা এত বড় একটা প্রতাপশালী ব্যক্তির বিষয়ে তাহাদের শাস্ত্রানুগত বিধানের ব্যতি-ক্রম ঘটাইতে নারাজ, তাহারা যদি শুধু রাজনীতির খাতিরে বদ্ধমূল সংস্কারকে এড়াইয়া, এই প্রকাণ্ড স্বেচ্ছাচারকে মানিয়া লইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে,—গৌড়ে আর হিন্দু নাই। সেদিন দরবারেই ত হিন্দু-মণ্ডলীর অস্বস্থতার সাড়া পাওয়া গিয়াছে। যদিও সে অস্থৈর্য্য যদুনারায়ণের সান্ত্বনাবাণীতে কিয়ৎক্ষণের জন্য, অন্ততঃ তখনকার মত সম্যক্ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই,—তাহা হইলেও, যতটা অনুমান করা যায়, ঐ সামান্য সান্ত্বনার প্রলেপে সে দুষ্ট ব্রণের উপশম হইতে পারে না। কাসেম খাঁ, চঞ্চল হইও না,—একটু অপেক্ষা কর, শীঘ্রই সমস্ত সন্দেহ ঘুচিয়া যাইবে। তোমার লোকসান কতটুকু? হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে মুসলমানের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাতে হিন্দুশক্তি চিরতরে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। মুসলমান অপ্রতিহত প্রতাপে রাজ্য-শাসন করিবে, এ যে তোমার অতি প্রিয় কামনা! আর যদি অবিমৃশ্যকারী যদুনারায়ণ হিন্দুর পক্ষ সমর্থন করিয়া কিম্বা কোনও প্রকার ঔদাসীন্য দেখাইয়া হিন্দুর স্পর্দ্ধায় ইন্ধন-সংযোগ করে, তাহা হইলে, কাসেম খাঁ,—সেনাপতি কাসেম খাঁ, তোমার সমস্ত শক্তির বিনিময়ে, তোমার বৈরিতা-সাধনের চরিতার্থতা লাভ করিও। আর সেই দিন তুমিও দেখিও আশমান, যে কাসেম খাঁকে তুমি তোমার দ্বারপথ হইতে রিক্ততার নিষ্ঠুর তিরস্কারে ফিরাইয়া দিয়াছ, সেই ভিক্ষার্থীকে ব্যর্থমনোরথ করিয়া ভাল কর নাই। সেইদিন আরও বুঝিবে আজিমকন্যা, যেমন একদিন মৃত পিতার পার্শ্বে বসিয়া সেনাপতি কাসেম খাঁর আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়া-

ছিলে, সেদিনও একমাত্র সেই কাসেম খাঁর সাহায্য ব্যতীত তোমার উপায়ান্তর নাই। দয়াময় খোদা, মেহেরবানি করিও, যেন সেই সুযোগ কাসেম খাঁর আসে,—যাহাতে সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত দিকটাই আশমান-তারাকে দেখাইয়া দিতে পারে। কাসেম খাঁ বীর,—হৃদয়বান্‌,—প্রেমিক,—ক্ষমাশীল। সে আশমানতারাকে চাহিয়াছিল,—পায় নাই বলিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হয় নাই,—সে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণাকে নিত্যসহচর করে নাই;—সে যাহাকে ভালবাসিয়াছে, শতক্রটী, শত তাচ্ছিল্য, শত অবহেলা পাইয়াও সে তাহাকে ভালই বাসে। সে তাহাকে পায় নাই,—কিন্তু তাহার মধুময়ী স্মৃতিটুকু যে তাহার নিজস্ব সম্পত্তি!—তাহা তাহার হৃদয়-ভাণ্ডারে অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণেই লুকাইয়া রাখিয়াছে। ব্যর্থতার তপ্তশ্বাস সে স্মৃতিকে স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু মলিন করিতে পারে না, বরং উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে। ……

এস অবসর, যদি প্রয়োজন হয়, তোমার সেই ভ্রূকুটী-ভয়াল রৌদ্র-মূর্ত্তিতেই আবির্ভূত হও। গৌড়ে পাঠান-আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া যাক্‌,—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কাসেম খাঁ এমন একটা সাফল্য লাভ করুক্‌,—যাহা হিংসা নয়, অথচ প্রতিশোধ,—যাহা মহান্‌—মধুর—মঙ্গলময়।

এই পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া সেনাপতি কাসেম খাঁ ডাকিলেন;—কিয়ামৎ!

দ্বার-প্রান্ত হইতে উত্তর আসিল,—হুজুর,—খোদাবন্দ্‌!

কাসেম খাঁ কি ভাবিলেন,—বলিলেন;—না—থাক্‌।

ক্ষণকাল পরে আবার কি ভাবিলেন,—আবার ডাকিলেন,—কিয়ামৎ!

কিয়ামৎ খাঁ আসিয়া কুর্ণিশ করিল।

কাসেম গম্ভীরভাবে বলিলেন;—সেনাপতি মুনীম খাঁ।

যো হুকুম।

কিয়ামৎ চলিয়া গেল।

অবিলম্বে সেনাপতি মুনীম খাঁ আসিয়া সেলাম দিলেন। দুইজনে বহুক্ষণ কথা-বার্ত্তা চলিল। কাসেম খাঁ তাঁহাকে বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন এবং বিশেষ ব্যস্ততা না দেখাইয়া, অতি সাবধানতার সহিত হিন্দু-সৈন্য-সম্প্রদায়ের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে উপদেশ দিলেন। অস্ত্রাগার মুসলমান বিশ্বস্ত শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত রাখিবারও ব্যবস্থা হইল। তাঁহাদের এই সতর্কতা যাহাতে হিন্দু সৈনিকগণের লক্ষ্যের বিষয় না হয়,—তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার যুক্তিও স্থির হইল।

এত সাবধানতার হেতু কি? তবে কি সেনাপতি কাসেম খাঁ বিদ্রোহী হইবার সুযোগ খুঁজিতেছেন?

১০

আজ রাণী-দরবার। রাণী ত্রিপুরাদেবী সভা আহ্বান করিয়াছেন। রাণীঃ স্বয়ং সেই সভায় উপস্থিত থাকিবেন। দেশ ছাইয়া গিয়াছে,—কুমার যদু-নারায়ণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৌড়ের সম্রাট্ হইয়াছেন। হিন্দুর গৌরব আজ আবার হীনপ্রভ,—হিন্দুর আশাভরসা আজ আবার নির্ম্মূল-প্রায়। এখনই তাহার প্রতীকার চাই,—উদাসীন থাকিলে চলিবে না,—সত্বর ব্যবস্থা করিতে হইবে,—কিসে হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা হয়।

আবাল-বৃদ্ধ সকলেই ছুটিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সমস্ত প্রজামণ্ডলী আজ রাজ-প্রাসাদপানে চলিয়াছে। রাণী ত্রিপুরাদেবী দরবারে বসিবেন। হিন্দু-মুসলমানে যাঁহার পুত্রবৎ স্নেহ, হিন্দু-মুসলমানে যাঁহার নিরপেক্ষ করুণা, আজ এই বিপর্য্যয়ে না জানি সেই তেজস্বিনী রমণী কি অভিমত প্রকাশ করিবেন! পুত্র মুসলমান হইয়াছেন, আদর্শ হিন্দু-ললনার গর্ভজ সন্তান মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, মাতার এই অসহ্য ধিক্কার না জানি কি ভাবের অভিব্যক্তি তুলিবে,—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই অতি ব্যস্ত ও বিষণ্ণভাবে প্রাসাদপানে ছুটিয়াছে।

বিশাল দরবার-গৃহ লোকে লোকারণ্য। কিন্তু আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্ব-বর্ত্তী নিস্তব্ধতার ন্যায় নির্ব্বাক্ উৎকণ্ঠা সমস্ত গৃহ ব্যাপিয়া অবস্থান করি-তেছে। সেই গৃহ,—সেই চন্দ্রাতপ,—সেই মর্ম্মর-খচিত গৃহতলে মহামূল্য আস্তরণ;—সেইরূপই পৃথক্ পৃথক্ আসনে আসীন হিন্দু-মুসলমান অমাত্য-গণ। সকলই বর্ত্তমান,—কেবল সেই রৌপ্য-মণ্ডিত সিংহাসন দুইখানি শূন্য-

বক্ষে নীরবে হাহাকার করিতেছে! সিংহাসন দুইখানিকে দুই পার্শ্বে সরাইয়া দিয়া, তিনখানি চন্দনকাষ্ঠের ঈষদুচ্চ আসন স্থাপিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন আর কোনও প্রকার নূতন ব্যবস্থা হয় নাই। রাজা গণেশনারায়ণ খাঁর দরবার কক্ষ, নাই কেবল সেই মহিমান্বিত রাজা আর তাঁহার একমাত্র বংশধর কুমার!

যথাসময়ে ভিন্ন দ্বার-পথ দিয়া রাণী ত্রিপুরাদেবী, বৈবাহিক রাজা অবনীনাথ ও কালীকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয় দরবার-গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাণীর ক্ষৌমবাস, শিরে অর্দ্ধাবগুণ্ঠন। শীর্ণ মুখমণ্ডল, কিন্তু এমনই তেজোমণ্ডিত যে, নয়নে নয়ন নিপতিত হইলে মস্তক নত হইয়া পড়ে। গাত্র বেড়িয়া দশমহাবিদ্যার নামাবলী।

তাঁহারা আগমন করিয়া উপবেশন করিতে করিতেই দরবারস্থ সকলে একযোগে গাত্রোত্থান করিয়া যথাযোগ্য অভিবাদন ও প্রণতি জানাইয়া নিজ নিজ আসন পরিগ্রহ করিলেন। ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধতার আংশিক বিচ্যুতি হইল, ক্ষণকালের মধ্যেই দরবারগৃহ নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল।

প্রথামত সভার অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সম্পন্ন হইলে, প্রথমেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়া সমবেত ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

আজ রাণী-মা সভায় এসেছেন। বোধ হয়, প্রত্যেকেই বেশ বুঝ্‌তে পার্চ্ছেন, কিজন্য আজ তিনি সর্ব্বজনসমক্ষে উপস্থিত। ব্রতচারিণী হিন্দুপুরনারী,—বিধবা বঙ্গ-কুলবধূ, আজ কি অনিবার্য্য কর্ত্তব্যের নিদেশে, অবশ্যকরণীয় নিত্যকর্ম্মের মধ্যে অবসর করে নিয়ে, রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ কত্তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তা বোধ হয় সকলেই জানেন। আর এটাও আপনাদের মধ্যে অনেকেরই অবিদিত নেই, মহারাজ গণেশনারায়ণের সহধর্ম্মিণী

মহারাজের বহুবিধ রাজকার্য্যে পরামর্শদাত্রী ছিলেন। অনেক জটিল বিষয়ে রাণী-মার মন্তব্য এত যুক্তিপূর্ণ ছিল যে, মহারাজের তা মেনে নেওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর থাকৃত না। তাহলেও, আজ তাঁকে এ বেশে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কত্তে হত না, আজ যদি তাঁর মহারথীর ন্যায় পুত্র ভাতুড়ীচক্রের চিরবরেণ্য রাজকুলে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা লেপন করে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ না কত্তেন। যদুনারায়ণ ধর্ম্মত্যাগী,—কুমার,—একমাত্র কুমার ধর্ম্মত্যাগী,—সপ্তদুর্গার ভাবী-অধীশ্বর ধর্ম্মত্যাগী,—এর প্রতীকার কি? শুধু তাই নয়,—যদুনারায়ণ,—মুসলমান যদুনারায়ণ—

সহসা রাজা অবনীনাথ আবেগ-জড়িত উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন;—বলুন—বলুন—ভট্টাচার্য্য মহাশয়,—ও নাম আর কেন? বলুন—গৌড়ের বাদসা জালালুদ্দিন,—রাজা অবনীনাথের—কুলপতি সাঁতোড়-রাজের কুল-গর্ব্ব-বিধ্বংসী—জালালুদ্দিন—

সভাগৃহ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাণী স্থির,—অচঞ্চল, কিন্তু নয়নে বিভীষিকা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজা অবনীনাথের মস্তক স্পর্শ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন;—

আজ গৌড়সিংহাসনে মুসলমান সম্রাট্। সে মুসলমান সাধারণ মুসলমান নয়,—হিন্দু সমাজ থেকে বিতাড়িত হিন্দুবংশোদ্ভব মুসলমান-সম্রাট্। এখানেই ত হিন্দুর প্রাধান্য চূর্ণ। বহুদিনের পর হিন্দুজাতি একটা প্রকাণ্ড সুযোগ পেয়েছিল,—বহুদিন পরে হিন্দুর পুনরুত্থানের আভাস পাওয়া গিয়েছিল;—মুসলমান-বাদ্সা-পরিবারে অন্তর্ব্বিরোধ, রাজা গণেশনারায়ণকে গৌড়-শাসনের সুযোগ দিয়ে, হিন্দুজাতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করে তুল্‌ছিল,—আজ সব আশা অতলে ডুবে যেতে বসেছে,—হিন্দু, মুসলমানের যে পদানত জাতি, সেই পদানত হতেই চলেছে। কিন্তু তাই বলে শুধু নিশ্চেষ্ট বসে

থাকলে ত চলবে না। এমন কোনো উপায় নির্দ্ধারণ আমাদের অবশ্য ও আশু কর্ত্তব্য, যাতে আমাদের পতনোন্মুখ সৌধকে ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে। রাণী-মা তাই আজ আপনাদের সাম্‌নে এসে উপস্থিত। কিন্তু তিনি পুত্রশোকের আতুরতা নিয়ে আপনাদের সম্মুখে আসেন নি,—তিনি এসেছেন,—হিন্দুব হিন্দুত্ব-রক্ষার,—হিন্দুর জাতীয়ত্ব-রক্ষার ব্যাকুলতা নিয়ে। বলুন, অমাত্যগণ, এখন আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করুন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভট্টাচায্য মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কোনও হিন্দু অমাত্য মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই মুসলমান সেনাপতি এনায়েৎ খাঁ গাত্রোত্থান করিয়া গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন ;—

আজ দরবারে আপনারা যে বিষয়েব অবতারণা করেছেন, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্যপ্রকাশ কোনো মুসলমানের পক্ষে সমীচীন বলে বোধ হয় না। হিন্দু ও মুসলমান জাতি প্রত্যেকের স্বার্থ যেখানে আলাদা করে দেখ্‌তে হয়, সে ক্ষেত্রে একের প্রসঙ্গে অন্যের যোগদান বা কোনও মতামত প্রকাশ অনেক সময় উপেক্ষিত হয়,—এমন কি, মনোমালিন্যও বৃদ্ধি করে। সুতরাং, আমাদের নীরব থাকাই অনেকটা নিরাপদ বলে বোধ করি।

সহসা কামিনী-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল ;—এনায়েৎ! তোমার সরল উক্তিতে খুব খুসী হয়েছি। মুসলমান শক্তি প্রতিরোধ কর্ব্বার জন্য হিন্দুর প্রচেষ্টায় কোনো মুসলমান যোগদান কর্ত্তে পারে না। তাকে হয় প্রতিদ্বন্দ্বীর বেশে দাঁড়াতে হয়, না হয় নিতান্ত পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাই সঙ্গত। কিন্তু এনায়েৎ! এটা তোমার বোঝা খুবই উচিৎ,—এ সভায় হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকে তুল্য-আগ্রহে, সম-সমাদরে আহ্বান করা হয়েছে। ভাদুড়ীচক্রের রাজ-ছত্রতলে শুধু হিন্দু বাস করে না,—মুসলমানও ভাদুড়ী-চক্রের প্রজা।

এ বিপর্য্যয় পরোক্ষভাবে হিন্দু-জাতির হলেও প্রত্যক্ষভাবে ভাদুড়ীচক্রের ; এই বিপর্য্যয় আজ ভাদুড়ীচক্রের রাজ-পরিবারকে বিপন্ন, কালিমালিপ্ত করেছে, ভবিষ্যতে সমস্ত হিন্দুকে বিপন্ন, কালিমালিপ্ত কত্তে পারে। হিন্দুর জন্য তোমার ভাবতে হবে না বটে, কিন্তু ভাদুড়ীচক্রের জন্য, তার বংশ-গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য তোমার ভাবতে হবে বৈকি ? সুতরাং, চিত্ত স্থির করো, আমি ততক্ষণ অন্যান্য অমাত্যের মন্তব্য শুনতে চাই। ন্যায়বাগীশ মহাশয়,—

সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বৃদ্ধ ন্যায়বাগীশ মহাশয় বলিতে লাগিলেন ;— বড় ব্যথা মা বড় ব্যথা, বড়ই ক্ষোভের বিষয়। এমন মায়ের এমন ছেলে যে এমন হবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর ! নিয়তিচক্র কি ভীষণ ! সে চক্রের প্রভাব থেকে হিন্দুকে কিছুতেই টেনে তোলা যাচ্ছে না ! হিন্দুর মধ্যে যে একটু প্রতিভা, একটু বিজয়িনী শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ কচ্ছে, ঘটনার কি একটা আকর্ষণ তাকে এমনি আকৃষ্ট, অভিভূত করে ফেল্‌ছে যে, সে যেন আর সে নয় ! যদুকে পেয়ে অনেকটা আশা করেছিলাম,— হয়ত, এই অধঃপতিত জাতি তার শক্তিকে ভর করে পুনরায় উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু কি হতে কি হল ! হায় ! আজ তারই প্রতিভার অগ্নি হিন্দুর মুখ উজ্জ্বল না করে, বরং দগ্ধ কর্‌তে উদ্যত হল ! উঃ ! কি অভিসম্পাত এই জাতিটার উপর পড়েছে ! কি ভীষণ দেবরোষে এই জাতি উঠ্‌তে উঠ্‌তে এমন আছাড় খাচ্ছে যে, যেন তার পুনরুত্থানের আশা সুদূরপরাহত হয়ে দাঁড়াচ্ছে ! কি করবি মা ! বড় দুর্ভাগ্য এ জাতির,—তোমার আমার চেষ্টায় সে দুনির্বার্য্য অধঃপতনকে নিবারিত করা এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং, সহ্য কত্তে হবে,—হিন্দুকে এখনো অনেক সহ্য কত্তে হবে। যতদিন না বহু যুগ, বহু জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল

নিঃশেষে ভোগ হয়, ততদিন এ জাতির নিস্তার নেই। যাক্,—যে গেছে, সে যাক্ মা যাক্। আর ত তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌বি না মা! অনর্থক বিরোধ বাধিয়ে লাভ কি? কাল যখন এখনো সেই মুসলমানেরই জয়গান গাইছে, তখন আমরা ত তাকে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌বো না। বরং, বাধা দিতে গিয়ে আমরাই চূর্ণ হয়ে যাবো। তার চেয়ে এখন শুধু এই চেষ্টা কর্ মা,—যাতে ভাদুড়ীচক্র বজায় থাকে। সাঁতোড় আর ভাদুড়ীচক্র এক হয়ে, এখন শুধু হিন্দুর লুপ্তপ্রায় অস্তিত্বটুকু আঁক্‌ড়ে বসে থাকা যাক্,—যেন আর কোনো ভীষণতর বিপ্লব এসে তাকে ছিনিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

এই অবধি বলিয়া বৃদ্ধ হিন্দু-সচিব নিরস্ত হইলেন। রাণী অন্য বৃদ্ধ মুসলমান মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—আলি সাহেব, আপনার বক্তব্য কি?

তখন বৃদ্ধ ওয়াজেদ আলি বলিলেন;—ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের যুক্তিই সমীচীন বলে বোধ হয়। এখন আমাদের চঞ্চল হলে চলবে না। বাদসা-দরবারে ভাদুড়ী রাজ বংশের যে সম্ভ্রম এখনো আছে বলতে হবে,—সেটা যাতে নষ্ট না হয়, ভাদুড়ী-চক্রের হিন্দু-মুসলমানের প্রাণপণ চেষ্টা এখন সেদিকে নিয়োগ করা দরকার। তবে এক কথা, কুমার মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করে সম্রাট্ হয়েছেন। তা বলে তিনি যে ভাদুড়ী-চক্রের মর্য্যাদা খর্ব্ব করবেন, সে বিশ্বাস আমার হয় না। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, দেখুন, তিনি কোন্‌দিকে ঝুঁকে পড়েন। জাতি-নির্ব্বিশেষে যদি তিনি সাম্রাজ্য-চালনা করেন ভালই,—কুমারের পুত্রকে ভাদুড়ী-চক্রের সিংহাসনে বসিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হবো। আর যদি তাঁর পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায়, যদি তিনি মুসল-মানের অন্ধ সমর্থকই হন্ এবং তাতে হিন্দুর যদি বাস্তবিকই ক্ষতি হয়,

তাহলে তখন আপনারা তার প্রতীকার চেষ্টা কর্বেন,—কিন্তু এখন নয়, —তাতে হিতে বিপরীত হবে।

হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে রাজা অবনীনাথ বলিয়া উঠিলেন ;—হিতে আর কি বিপরীত হবে, আলি সাহেব! বিপরীত যা হবার খুবই হয়েছে। এখনো বল্‌ছ, চঞ্চল হলে চল্‌বে না! তা তোমরা বল্‌তে পারো,—তোমাদের সুদিন এসেছে, তোমরা তা বল্‌বে বৈকি! হিন্দুর সর্ব্বনাশ হচ্ছে,—তাতে তোমাদেরই মঙ্গল ত! সাঁতোড় ভাদুড়ী-চক্রের রইল কি,—যে তাই নিয়ে সাঁতোড় আর ভাদুড়ী-চক্র বেঁচে থাক্‌বে? জাতীয়ত্ব, আভিজাত্য, কৌলীন্য সমস্ত মুসলমান মসনদের তলে বিসর্জ্জন দিয়ে, সাঁতোড় আর ভাদুড়ী-চক্র বিজয়োদ্ধত মুসলমান জাতির বিদ্রূপ-কটাক্ষে জর্জ্জরিত হবে,—এ বড় সুন্দর ব্যবস্থা। তারপর আরো সুন্দর ব্যবস্থা হবে ;—হিন্দুর মন্দিরগুলো হুড়্-মুড়্ করে ভেঙ্গে পড়্‌বে, মন্দিরের ইট-পাথরে মসজিদ তৈরী হবে,—আর তার দেবতা মুসলমানের ক্রীড়নকে পরিণত হবে! কথায় কথায় জাতি-গ্রহণ, হিন্দু-রমণীর ধর্ম্মনাশ, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব-লুণ্ঠন,—বাহা—বাহা—চমৎকার,—অতি চমৎকার বন্দোবস্ত! বলো, —বলো এনায়েৎ, তুমি আর চুপ করে থাক্‌বে কেন? তোমার বক্তব্যটা বলে ফেলো,—বেয়ান্ ঠাকুরাণীকে তোমার যুক্তিটা শুনিয়ে দাও,—

সভাস্থল চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাণী এনায়েৎ খাঁর পানে নেত্রপাত করিলেন। অগত্যা এনায়েৎ খাঁ গাত্রোত্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

মা! এই জন্যই আমি নির্ব্বাক্ থাকা যুক্তি-যুক্ত বলে বুঝেছিলাম। ভাদুড়ী-চক্রের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনের ঐক্য অন্যান্য বিষয়ে যতই থাকুক না কেন, এ অবস্থায় দুই জাতি কখনো একমত হতে পারে না,—এখন যে উভয় জাতির ভাব-স্রোত পরস্পরের বিপরীত মুখে ধাবিত হচ্ছে!

কিন্তু তাই বলে ভাব্‌বেন না মা,—কুমার মুসলমান হয়েছেন বলে এনায়েৎ খুসী। যে এনায়েৎ কুমারের বাল্যবন্ধু, ভাদুড়ীচক্র রাজ-পরিবারের নিকট যে এনায়েৎ খাঁর পিতৃ-পিতামহ পর্য্যন্ত অচ্ছেদ্য ঋণ-পাশে আবদ্ধ, সে এতটা অকৃতজ্ঞ হবে, তা ভাব্‌বেন না মা! যে মুসলমান ভাদুড়ী-চক্রের যথার্থ প্রজা, সে আজ কুমারের এভাবে সংসার-ত্যাগে ব্যথিত না হয়ে থাকৃতে পারে না। যার যে জাতি, সেই জাতি অবলম্বন করে থাকাই তার পক্ষে শ্রেয়ঃ। সে জাতি ত্যাগ করে সে জাতির ধর্ম্ম সমাজ ত্যাগ করে, সে ধর্ম্ম-সমাজগত বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে, ভিন্ন সমাজে প্রবেশ, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বিসদৃশ বলেই বোধ হয়। কিন্তু মনে পড়ে, সে কৈশোরের কথা। কুমারের সঙ্গে ধর্ম্ম নিয়ে জাতি নিয়ে কি তুমুল বিতণ্ডাই চল্‌ত! সে কি দৃঢ় বিশ্বাস—সে কি ভীষণ প্রতিবাদ,—কি অগাধ পাণ্ডিত্য! আমি স্তম্ভিত হয়ে যেতাম,—অবাক্ হয়ে সেই প্রতিভা-স্ফুরিত মুখের পানে চেয়ে থাকৃতাম। ভয় হত,—ভাবনা হত,—কালে যখন ঐ প্রতিভার দ্যুতি সমস্ত গৌড়-দেশ সমুদ্ভাসিত করে তুল্‌বে, তখন হয়ত মুসলমান-গৌরব একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে,—তখন হয়ত মুসলমান-প্রতিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু হায়, বাস্তবিকই যেন এ কি হতে কি হল! হলেও, এ বিশ্বাস আমার খুবই—কুমার ধর্ম্মত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মদ্বেষী হবেন না,—তিনি মুসলমান হয়েছেন বলে হিন্দু-নির্য্যাতক হবেন না। সাম্য তাঁর উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি মুসলমান। সে উদ্দেশ্য সফল হোক্ বা না হোক্, তিনি তার পরিপন্থী হবেন না,—হতে পারেন না।

এই বলিয়া এনায়েৎ খাঁ নিস্তব্ধ হইতেই কালীকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া উঠিলেন ;—

না—এনায়েৎ, তোমার শেষ উক্তির সহিত আমরা একমত হতে পারি না। যে ধর্ম্মত্যাগী,—সে ধর্ম্মদ্বেষী হতে কতক্ষণ? যে সমাজ-ত্যাগী,—সে সমাজদ্বেষী হতে কতক্ষণ? আবার সে যে শুধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমাজ ছেড়ে চলে গেছে, তাত নয়,—সমাজও তাকে তার ব্যভিচারের জন্য বিতাড়িত করেছে। সে তার খেয়ালকে চরিতার্থ করবার জন্য হিন্দু-সমাজের কাছে অসঙ্গত শাস্ত্রবিগর্হিত আব্দার করেছিল,—তাই সে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, ক্ষোভে, অভিমানে মর্ম্মাহত হয়ে চলে গেছে। সে বিক্ষোভে, সে নিদারুণ অভিমানের ফলে, ধর্ম্ম বা সমাজের উপর অশ্রদ্ধা আসতে কতক্ষণ? একেবারে ধর্ম্মত্যাগ! বৌদ্ধ ধর্ম্ম নয়,—জৈন ধর্ম্ম নয়,—একেবারে ভারত-ছাড়া ধর্ম্মগ্রহণ! একেবারে মুসলমান! কি বলো এনায়েৎ! যে হিন্দু জগতের আদিযুগে পূত প্রণব-ধ্বনি তুলে ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিল,—যে হিন্দু অভিনব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করে সমগ্র ভারত জাতিকে সমাজ-শৃঙ্খলায় বেঁধেছিল,—যে হিন্দু বীর্য্যে, চরিত্রের আদর্শে ও জ্ঞানৈশ্বর্য্যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল—এমন জাতির যে ধর্ম্ম,—যে ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করে, যে ধর্ম্মের আংশিক গ্রহণ করে কত শত নব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়েছে,—এমন যে সনাতন ধর্ম্ম, যা জগতের প্রতি বস্তুতে ভগবানের সত্ত্বার উপলব্ধি দান করে,—শয়নে, উপবেশনে, আহারে, বিহারে, প্রতি নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে যে ধর্ম্মের শাস্ত্রানুশাসন অবশ্য পালনীয়, যে ধর্ম্ম—যে জাতি—যে সমাজ সংরক্ষণের জন্য স্বয়ং ভূভারহারী যুগে যুগে অবতীর্ণ হন,—যে ধর্ম্ম—যে জাতি—যে সমাজের মধ্যে যত লোকশিক্ষক, যত মহামানবের অবির্ভাব হয়েছে, এমন আর কোনো ধর্ম্ম, জাতি বা সমাজে হয়নি,—সেই ধর্ম্ম—সেই জাতি—সেই সমাজকে পরিত্যাগ করে যে হিন্দু-সন্তান,—যে সেই বৈদিকধর্ম্মের,—ব্রহ্মণ্য-

ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ সন্তান অনায়াসে চলে যেতে পারে ;—যে অকৃতজ্ঞ অবাধ্য সন্তান রাণী ত্রিপুরাদেবীর ন্যায় মহীয়সী মাতার বুকে শেল বিদ্ধ করে অনায়াসে চলে যেতে পারে,—যে হৃদয়-হীন স্বামী কুসুম-কিঞ্জল্কের ন্যায় মধুময়ী সতী-প্রতিমা পত্নীকে চিরদুঃখিনী করে অনায়াসে চলে যেতে পারে,—যে প্রথম সন্তানের পিতা বংশললাম প্রিয়তম পুত্রের মমতা-পাশ বিচ্ছিন্ন করে অনায়াসে চলে যেতে পারে,—এত গুলো অসম্ভব যার পক্ষে সম্ভব,—তার পক্ষে অসম্ভব কি আছে এনায়েৎ!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আরক্ত-মুখমণ্ডল ব্রাহ্মণ রাণীর পানে চাহিয়া অতি উদাস কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন ;—মা! এইবার বুঝি বাঙ্‌লা থেকে হিন্দুর হিন্দুত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে! ওঃ! কি কাল মুসলমান সংস্পর্শ এসেছিল,—হিন্দুর আর কিছুই রইল না! ঋষি-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সমাজ জাতি রসাতলে যায়! কিন্তু এই বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখ যে, ভাদুড়ীবংশের সন্তান, নিষ্ঠাবতী হিন্দু-ললনার স্তন্যপুষ্ট সন্তান সেই ধর্ম্মের হন্তারক!

আর বলিতে হইল না। সহসা সভাস্থ সমস্ত চাঞ্চল্যকে স্তম্ভিত করিয়া বিহগ-কাকলীর ন্যায় কোমল, কিন্তু গোমুখী-নিষ্ক্রান্তা জাহ্নবী-ধারার ন্যায় কলনাদিনী বাণী উত্থিত হইল ;—ব্রাহ্মণ! সেই বাণী শুনিয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সকলে নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া দেখিল ;—যোগক্ষামা, গৈরিকবাস-পরিহিতা তাপসীমূর্ত্তি! বিশাল নেত্রযুগে তেজঃস্ফুলিঙ্গ,—অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রত্যেক দর্শকের অক্ষি-পুট নত হইয়া পড়িল,—বক্ষঃ স্পন্দিত হইল,—শরীর শিহরিয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণ! নিরস্ত হোন্,—নিশ্চিন্ত হোন্। ত্রিপুরাদেবী নীরবে সহ্য কর্ব্বে না। দেব-দ্বিজের অবমাননা,—হিন্দু-রমণীর লাঞ্ছনা, ত্রিপুরাদেবী বেঁচে থাকতে হবে না—হবে না। রাজা, হতাশ কেন?—বিমর্ষ কেন?

সে গেছে,—যাক,—দূর হয়ে যাক,—তাকে চাই না,—সে মৃত, এই আমাদের সান্ত্বনা। সে নাই,—কিন্তু তার প্রেতাত্মা আছে,—গৌড়-মসনদে তার প্রেতমূর্ত্তি বসেছে,—তাকে নিষ্কাশিত কত্তে হবে,—সে প্রেতত্ব থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে,—তাকে মর্ত্তালোক থেকে অপসারিত কত্তে হবে। কি! আমার স্তন্যপুষ্ট সন্তান এত নীচ হবে! ত্রিপুরার পুত্র হিন্দুর শত্রু! অত্যন্ত অসহ্য। যাও হিন্দু সজ্জিত হও,—রাজা, সৈন্য সমাবেশ করো,—ব্রাহ্মণ, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করুন,—অভিযান কর্ব্বো। হোক্ মুসলমান প্রবল, হোক্ মুসলমান সমর-নিপুণ, কিছুতেই এ গতি প্রতিরোধ কত্তে পার্ব্বে না। এক মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা নয়,—অবসর হারিয়ে যাবে। এখনো সে গৌড়-মসনদে ঠিক্ হয়ে বসতে পারে নি। এখনো সে সব মুসলমানের চিত্ত অধিকার করে বসতে পারে নি। মুসলমান এখনো তাকে সন্দেহ করে, এখনো মুসলমান মধ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। এই বেলা তাকে ধ্বংস কত্তে হবে, চূর্ণ কত্তে হবে,—তাকে জগৎ থেকে মুছে দিতে হবে। যাও হিন্দু, ধর্ম্মের নামে,—সমাজের নামে,—জাতির নামে,—দেশের নামে এক-যোগে জেগে ওঠো,—হৃত-কীর্ত্তি পুনরুদ্ধার করে জগতের সমক্ষে দেখাও,—হিন্দুধর্ম্ম—সনাতন,—হিন্দুজাতি শাশ্বত, হিন্দু-সমাজ স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেয় না।

সহসা রাণীর কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল, তিনি মুসলমানমণ্ডলীর পানে চাহিয়া বলিলেন ;—আর মুসলমান, আমার প্রিয় মুসলমান প্রজা-মণ্ডলি,—ভীত হয়ো না,—ক্ষুব্ধ হয়ো না। এ হিন্দুত্ব-রক্ষার জন্য, হিন্দুর অভিযান,—এ হিন্দু-কুলাঙ্গারের বিরুদ্ধে হিন্দুর যুদ্ধোদ্যোগ। এতে তোমাদের সাহচর্য্যের কোনো প্রয়োজন নেই। থাকো,—যেমন আছ, তেম্নি থাকো। রাণী ত্রিপুরার স্নেহরাণী ত্রিপুরার আনুকূল্য হতে তিলার্দ্ধ বঞ্চিত

হবে না। বরং, আরো বেশী পরিমাণে তোমাদের উপর করুণাধারা বর্ষিত হবে। আজ আমি একমাত্র পুত্র-হীনা। শুধু তাই নয়,—আজ আমি আমার সমস্ত মমতা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি,—তাই তোমাদের মাঝে সমভাবে বণ্টন করে দেবো। তোমরা তার ছায়ায় নিশ্চিন্ত হয়ে সংসার পাতিয়ে বাস কোরো। এনায়েৎ! সমস্ত মুসলমান-মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করো,—তারা ভাদুড়ী-চক্রের পক্ষে অসি ালনা কত্তে প্রস্তুত কিনা।

এনায়েৎ খাঁ শুধু বলিলেন ;—মা—

রাণী ঈষৎ হাসিয়া পুনরায় বলিলেন ;—জানি এনায়েৎ,—ভাদুড়ী-চক্রের মুসলমান কৃতঘ্ন নয়,—তারা ভাদুড়ীচক্রের বিরুদ্ধাচরণ কত্তে পারে না। তাহলেও, আমি আজ তাদের কাছ থেকে একটা স্বীকারোক্তি চাই যে, তারা ভাদুড়ী-চক্রের জন্য লড়্বে।

তখন এনায়েৎ খাঁ সমবেত মুসলমান প্রত্যেকের নিকট রাণীর মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিলেন ;—হিন্দুই হোক্,—আর মুসলমানই হোক্, ভাদুড়ীচক্রের প্রতি শত্রুতাচরণ কল্লে, ভাদুড়ী-চক্রের সমস্ত মুসলমান তার প্রতিদ্বন্দ্বী ; তারা তাদের জন্মভূমি ভাদুড়ী-চক্রের জন্য দেহের শেষ শোণিত পর্য্যন্ত লড়্তে প্রস্তুত।

রাণী ডাকিলেন,—এনায়েৎ!

এনায়েৎ নিকটবর্ত্তী হইলেন। রাণী বলিলেন ;—আমরা যুদ্ধে যাবো, হিন্দু-সৈন্য খুব সামান্যই ভাদুড়ীচক্রে থাক্‌বে। পুরী-রক্ষার ভার তোমার উপর,—কেমন—পার্ব্বে ?

সোৎসাহে এনায়েৎ খাঁ বলিলেন ;—মা! আশীর্ব্বাদ করুন, নিশ্চয়ই পার্ব্বো। সৌভাগ্য আমার,—ভাদুড়ীচক্রের ঋণ এইবার বুঝি কথঞ্চিৎ শোধ কত্তে পার্ব্বো।

রাণী বলিলেন ;—নিশ্চিন্ত হলাম। আমি দেখাতে চাই,—মুসলমানের চিত্ত স্নেহ ও করুণার বিনিময়ে অধিকার কতটা স্থায়ী; সে ভাবে অধিকৃত হলেও হিন্দু মুসলমানকে কত ভালবাসতে পারে,—বিশ্বাস করে,—আর মুসলমানও হিন্দুকে কতটা শ্রদ্ধা করে,—ভালবাসে। এখন যাও,—সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনের জন্য তৈরি হও। চলুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, চল রাজা, মা ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে আরতির সময় হল। আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এখনো অনেক কাজ বাকি।

সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। হিন্দু মুসলমান প্রজামণ্ডলী সকলে একস্বরে রাণী ত্রিপুরাদেবীর জয়-গাথা উচ্চারণ করিল।

———

১১

গোধূলির মৌন ম্লানিমায় সারা সপ্তদুর্গা আচ্ছন্ন। এইমাত্র দরবার ভাঙ্গিয়াছে, রাজপথে জনস্রোত এখনও কমে নাই। কিন্তু কোলাহল নাই, সকলেই যেন নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়াছে। কাল প্রাতেই যুদ্ধ-যাত্রা করিতে হইবে,—রাত্রিটুকু অবসর। ইতিমধ্যে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যুদ্ধ-ঘোষ পাইক প্রেরিত হইয়াছে। রাণী ত্রিপুরাদেবীর আদেশ অমান্য করিবার সাধ্য নাই,—প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তির অভিযানে যোগদান করিতে হইবে। সকলে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, নীরবে,—সংযতচিত্তে। মুসলমানগণও স্থির, সংযতচিত্তে দায়িত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে প্রদোষের ম্লান ছায়া অমানিশার সূচী-ভেদ্য অন্ধকারে বিলীন হইল। প্রথামত শঙ্খ-ধ্বনি হইল,—দীপ জ্বলিল,—কিন্তু তাহাতে যেন কোনও আনন্দভাব সূচিত হইল না;—শঙ্খ শুধুই বাজিল,—দীপ শুধুই জ্বলিল। বিধুরতার মধ্যে নিত্য কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান এইরূপেই সমাহিত হয় নাকি?

নবকিশোরীর প্রকোষ্ঠেও দীপ জ্বলিয়াছে। হৈম দীপাধার,—কিন্তু তাহাতে স্নেহ-পদার্থ নিঃশেষপ্রায়। বর্ত্তিকা অতি ম্রিয়মাণভাবে ক্ষীণ রশ্মি দান করিতেছে। সে ক্ষীণতা সমস্ত গৃহেই পরিব্যাপ্ত। সেই দশ-মহাবিদ্যা, দশাবতারের ছবি, সেই মাতা ব্রহ্মময়ীর চিত্র-প্রতিমা। সবই ছায়াময়, অস্পষ্ট, ম্লান। কই প্রতি চিত্র-পটের নিম্নে শ্বেত

বা রক্ত শতদল কোথায় ? আছে বৈকি ? কিন্তু বিশীর্ণ কেন ? ঐ ত রজত-পালঙ্ক,—কিন্তু শয্যা মলিন কেন—বিশৃঙ্খল কেন ? কিশোরী ?—ঐ ত !

কিশোরী এখন ঘুমাইতেছে ! এই অবেলায়, ধূলিময় প্রকোষ্ঠতলে শুইয়া এখন ঘুমাইতেছে ! অনুপ কোথায় ? তাহার মাকে ডাকিলে পারিত ? সেও ত গৃহে নাই !

আহা,—ঘুমাইতেছে,—ঘুমাইতে দাও। তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—একটু শান্তিলাভ করুক্। কিন্তু ঘুমাইলে কি দীর্ণ হৃদয় জুড়িয়া যায় ? তবে পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে বেদনার অভিব্যক্তি কেন ? কালিমা-বেষ্টিত মুদ্রিত নেত্রপুটে অশ্রুবিন্দু কেন ? পাংশুবর্ণ ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কম্পিত কেন ? ওঃ ! পতিগত-প্রাণা সাধ্বীর একি কর্ম্মফল ! একি মর্ম্মন্তুদ বিরহ,—একি দুঃসহ বঞ্চনা ! সমস্তই বর্ত্তমান, অথচ কিছুই নাই,—থাকিয়াও নাই ! কঠোর দুর্নিবার্য্য ব্যবধান দুইজনের মধ্যে আসিয়া, এ জনমের মত তাহাকে হতভাগিনী করিয়াছে ! ঘুমাইলে কি এ ক্ষোভের প্রশান্তি সম্ভব !

কিন্তু নবকিশোরী ঘুমায় নাই। সে আর ঘুমায় না। তাহার বক্ষঃ-পিঞ্জর চূর্ণ করিয়া, যেদিন তাহার প্রিয়তম বিহঙ্গ উড়িয়া গিয়াছে, তাহার হৃদয়-মন্দিরে পদাঘাত করিয়া, যেদিন তাহার আরাধ্য-দেবতা অন্তর্হিত হইয়াছেন,—সেইদিন, সেই রাত্রিতে সে একটু ঘুমাইয়াছিল, তাহাও প্রগাঢ় নয়,—তন্দ্রা-জড়িত স্বপ্নময় নিদ্রা। তাহার পর হইতে আজ এই সুদীর্ঘ দুঃখময় কয়টী দিন সে আর ঘুমায় না,—ঘুম আসে না,—বোধ হয়,—তাহার ঘুম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে !

নবকিশোরী উঠিয়া বসিল। কক্ষতলে শীর্ণ করতল রাখিয়া, মস্তক নত করিয়া কতক্ষণ রহিল। নিতম্বস্পর্শী রুক্ষ কেশভার

কতক কপোল বাহিয়া, কতক বা পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিল।

হায় লাবণ্য! তুমি কি প্রতারক! এইত সেদিন অবধি তুমি তাহার সমস্ত দেহ জুড়িয়া বাসন্তী-মেলা পূর্ণোদ্যমে চালাইয়াছ, তাহার প্রতি অঙ্গে তোমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জয়ডঙ্কা ঘোষণা করিয়াছ, আর আজ তুমি সহসাই কোথায় পলায়ন করিলে! এ তোমার প্রতারণা নয়ত কি? আজ সে যে নিতান্ত নিরুপায়,—সে যে নিতান্ত নিঃসম্বল,—সে যে তাহার সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছে! ধনীর পতনে সুখের পারাবতগুলির অন্তর্দ্ধানের ন্যায় তুমিও অদৃশ্য হইলে! অথবা, তোমাকে তাহার আর প্রয়োজন নাই,—তাই তুমি চলিয়া গিয়াছ। যাহার চিত্ত-বিনোদনের জন্য তোমার সে উৎসবের প্রয়োজন ছিল, সে সাধের খেলা ফুরাইয়াছে,—তোমারও আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়াছে। শুধু হাটের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে,—অতীতের স্মৃতি জাগাইতে! সেইটুকু বা কেন রাখিয়া গেলে? যখন সে সকল রকমে নিঃস্ব হইয়াছে, তখন ঐ স্মৃতিটুকুও লইয়া সরিয়া পড়িলে পারিতে! তা ত তুমি পার না,—তুমি যে সুখের সহযাত্রী! স্মৃতি সুখের অনুগামী নয়,—সুতরাং, স্মৃতিকে তোমার ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে। কিন্তু তুমি কোথায় গিয়াছ? কোন্ অদৃশ্যলোকে তোমার সমস্ত সম্পদ লইয়া লুকাইয়াছ? নিশ্চয়ই সেখানে হাহাকার নাই,—দীর্ঘশ্বাস নাই,—বিরহ নাই,—হতাশ্বাস নাই,—অশ্রুজল নাই? নিশ্চয়ই নাই,—নতুবা তুমি সেখানে গিয়া তিষ্ঠিতে পারিবে কেন? কিন্তু অকৃতজ্ঞ রূপ! এতদিন যাহার দেহে বাসা বাঁধিয়া বাস করিলে,—এতদিন ধরিয়া যাহার আশ্রয়ে হাসিয়া খেলিয়া হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইলে,—তাহার সর্ব্বনাশ

হইতে হইতেই, তাহাকে সঙ্গে লইয়া তোমার সেই শূন্যময় শান্তি-রাজ্যে চলিয়া গেলে তোমার পক্ষে শোভন হইত নাকি? শুনিয়াছি, সে অনির্দ্দেশ্য প্রদেশ সীমাহীন,—সুতরাং, কে আর এই ক্ষুদ্র প্রাণীটীর জন্য তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইত? এতটুকু উপকার করিতে পারিলে না! যাহাকে অবলম্বন করিয়া তুমি ধন্য হইয়াছিলে, তাহার অসময়ে তোমার প্রাণ কি একটুও কাঁদিল না! ছি! তুমি এত অসার!

কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার স্থির থাকিবার অবসর নাই! স্থৈর্য্য তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া পলায়ন করিয়াছে! এই কি সেই কিশোরী! সে নামের সার্থকতা কোথায়? শিশির-নিষিক্ত ব্রততীর ন্যায় লীলাময়ী, সদ্য-মন্থিত নবনীতের ন্যায় কোমলতাময়ী, প্রোদ্ভিন্ন রক্তোৎপলের ন্যায় মাধুর্য্যময়ী এই কি সেই কিশোরী,—না—তাহার ছায়া! যজ্ঞনারায়ণ! এস—একবার এস,—দেখ দেখি তুমিই চিনিতে পার কি না? সেই একদিন এই কিশোরীকে শঙ্খ-হুলুধ্বনি-মুখরিত অঙ্গন-তলে লাজ-নম্রা নববধূ-বেশে শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি-উপলক্ষে দেখিয়াছিলে —সে দৃষ্টি পলকের হইলেও, সে-ই ত তোমার চিত্ত-ফলকে মনোরমা উমা-মূর্ত্তিতে বিম্বিত হইয়াছিল। তখন সে মাত্র নবম বর্ষীয়া বালিকা। সেই বালিকা অবস্থা হইতে তুমি তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া আসিয়াছ। সেই কোরকের অর্দ্ধস্ফুট জীবন তোমারই দৃষ্টির অনুরাগ-স্নিগ্ধ ছায়াতলে অতিবাহিত হইয়াছে,—তোমারই প্রেম-শীকরে অভিষিক্ত হইয়া তাহার পল্লবদাম পূর্ণ-সুষমায় চৌদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তুমি—একমাত্র তুমিই জান,—সে ফুল্ল প্রসূনের মাধুরী,—কেননা, তুমিই তাহার গর্ভ-কেশরে কত মধু সঞ্চিত আছে, তাহার সন্ধান জানিতে। তুমি শুধু তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিভোর হও নাই,—তাহার হৃদয়ের পরতে-পরতে

অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সে প্রসূনের অন্তর্বাহ্য সমস্ত ঐশ্বর্য্যে বিভোর হইয়াছ। সুতরাং, তুমিই একবার এস,—দেখ দেখি, সেই কিশোরী কিনা?

এ আকাশের চন্দ্র অন্য আকাশে চলিয়া গিয়াছেন, সমুদ্রোচ্ছ্বাস স্তব্ধ হইয়াছে; এ জগতের সূর্য্যদেব অন্যজগতে গিয়া উষার কলতান ভুলিয়াছেন, তমিস্রার আবরণে এ জগৎ সমাবৃত হইয়াছে! হায়! চন্দ্র আর উঠিবে না,— উচ্ছ্বাসও আর বীচি-বিভঙ্গে নৃত্য করিবে না, উদয়াচলে মরীচিমালীর সন্ধানও আর মিলিবে না,—নিশি কেমন করিয়া প্রভাত হইবে!

কিন্তু দায়ী কে? এত বড় একটা সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইল,—এত সুন্দর একটা হৃদয় যে শ্মশান হইল,—কে তাহার জন্য দায়ী? সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা! বলিতে পার কে দায়ী? নবকিশোরীর এ দশা দেখিয়া সকলেরই বুক ফাটিয়া যাইতেছে,—এই সার্ব্বজনীন সমবেদনার হেতুভূত দুর্দ্দশার জন্য প্রকৃত দোষী কে? কেহ বলিবেন,—দোষী যদুনারায়ণ,— সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন উচিত হয় নাই। কিন্তু সমাজ মানুষের,—মনুষ্যকৃত কোনও নিয়ম শাশ্বত, সর্ব্ববাদিসম্মত বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। না হইলেও, যে নিয়ম এতদিন সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম কোনও ক্রমে শোভন ও শুভদ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, সমাজ-রীতি চিরকাল এক থাকিতে পারে না,—দেশকাল-পাত্র-ভেদে তাহার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। সেই পরিবর্ত্তনের নিষ্পেষণে দুই একটা কেন,—বহু প্রাণী দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবেই। সুতরাং, দায়ী রক্ষণশীল সমাজ। মনুষ্যকৃত সমাজের সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা, এক এক করিয়া এই ভাবে বহু সংসার চূর্ণ হইয়া যায়।

থাক্,—সে অনধিকার চর্চ্চায় আমাদের প্রয়োজন নাই। প্রাক্তন বা ভবিতব্যই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। প্রাক্তনই যদুনারায়ণকে

মুসলমান করিয়াছে,—ভবিতব্যই পতিব্রতা কিশোরীকে পতি-বর্ত্তমানে বিধবা সাজাইয়াছে,—সমাজ তাহার উপলক্ষ্য মাত্র।

কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে মুক্ত গবাক্ষ-পার্শ্বে আসিয়া, কিয়ৎকাল অন্যমনস্ক ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। কাহার প্রতীক্ষায়? হায়, সে কি আর আসিবে? সমাজ যাহাকে বিতাড়িত করিয়াছে,—কর্ত্তব্য যাহাকে টানিয়া লইয়াছে,—সে কি আর আসিবে? আর আসিয়াই বা ফল কি? সে যদুনারায়ণ ত আর নাই! যদুনারায়ণের সে অধিকার ত আর নাই!—তবু যদি একবার দেখা হয়,—ঐ দূর—সুদূর ব্যবধানের প্রান্তভাগ হইতে চোকের দেখা যদি একটীবারের তরেও হয়,—তাহা হইলে, বুঝি কতকটা সান্ত্বনা আসিলেও আসিতে পারে। ঐ নিবিড় তিমিরের অন্তরাল হইতে যদি তাহার ছায়ামূর্ত্তিও অন্ততঃ চকিতের মত দেখা দিয়া সরিয়া যায়,—তাহা হইলেও, হয়ত কতকটা জ্বালা জুড়াইলেও জুড়াইতে পারে। তাই এ প্রতীক্ষা,—প্রতিদিন ব্যর্থতার উপহাস সহ্য করিয়াও কিশোরী এখনও প্রতীক্ষা করিতেছে। যদি একটীবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও দূরে দূরেই দেখা হয়,—সে শুধু দেখিয়া লইবে,—আর কিছু নয়। বিদায়ের দিনে দেখা হয় নাই,—তাই ত দেখিবার এত আকাঙ্ক্ষা,—এত আকুল আগ্রহ,—সে একবার—শেষবার শুধু দেখিতে চায়।

কিন্তু হায়,—তাহাও ত ভাগ্যে নাই! এতদিন প্রতীক্ষা করিয়াও কই একদিন ত তাহার সে চির-বাঞ্ছিতের দর্শন মিলিল না! পত্রের মর্ম্মর, সমীরণের নিঃস্বন, বিহগের পক্ষ-তাড়না, পথবাহীর পদশব্দ ও কণ্ঠস্বর শুধু ঔৎসুক্যই বাড়াইয়া দেয়। অবোধ মন দুর্লভকে অসম্ভবকে সুলভ ও সম্ভব বুঝিয়া মিছামিছি প্রলুব্ধ হয়।

কিশোরী অনেক ক্ষণ প্রাসাদ-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তরপানে চাহিয়া চাহিয়া, আজও আবার একটী ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গবাক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিল এবং হতাশভাবে পালঙ্কোপরি ঢলিয়া পড়িল। তারপর, প্রাণের বেদনা আপাততঃ কতকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া, অতি করুণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল ;—

জানিনা, তোমায় কি বলে ভর্ৎসনা কর্ব্বো। তোমাকে তিরস্কার কর্ব্বার স্পর্দ্ধা ত আমার নেই। তুমি প্রভু, আমি দাসী, তোমার উপর আমার কোনো কথাই ত চল্‌বে না। তুমি আমাকে বঞ্চনা করে চলে গিয়েছ, সে তুমি যা ভাল বুঝেছ করেছ, আমি সামান্যা নারী তার প্রতিবাদ কর্ব্বো কেন ? তুমি মহৎ—তুমি আমার স্বামী, তুমি যা কর্ব্বে, নির্ম্মম হলেও সেটাকে আমার সহ্য কত্তে হবে। যে পথে তুমি চলেছ, আমার পক্ষে তা নিরঙ্কুশ না হলেও আমাকে নির্ব্বাক্ থাক্‌তে হবে। বুঝি সব, কিন্তু নাথ, সহ্য কত্তে পারি না যে ! তোমার বিরহ যে আমাকে একেবারে অধীর করে ফেল্‌ছে ! অবলম্বন না থাক্‌লে লতিকা কতক্ষণ সইতে পারে ? ক্ষোভে, অভিমানে এ বুক ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তবু সেই ভাঙ্গা বুক জোড়া দিতে কত চেষ্টা কচ্ছি, আবার একটা আঘাত লাগ্‌ছে, আর সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ! জানি, হিন্দু রমণীর পতি একজন্মের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ তোমার সহিত বিজড়িত, জানি, তোমার সে আরাধ্য মূর্ত্তি হৃদয়-আসনে চির-প্রতিষ্ঠ। বাইরে তুমি হারিয়ে গেলেও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তোমার সেই দেব-দুর্লভ কান্তি নিত্য বিরাজ রয়েছে। কিন্তু দেব ! মোহের মেঘ এসে আমার সমস্তটা যে একেবারে ঢেকে ফেলেছে ! হৃদয়ের গুহ্যতম প্রদেশে আমার দৃষ্টি যে আর যায় না ! তাই ত এত আকিঞ্চন ! একবার দেখা দেও প্রভু ! একবার 'দাসীর

সম্মুখে এসে দাঁড়াও; নবকিশোরীর প্রাণবল্লভের বেশে একবার দেখা দিয়ে মেঘ সরিয়ে দিয়ে যাও অভীষ্টদেব!......

মুসলমান হয়েছ, আশমানতারাকে পত্নিত্বে বরণ করেছ। সেজন্য আমার প্রথমে একটু অভিমান হয়েছিল। কিন্তু সে অভিমান নিষ্ফল, তাই সে অভিমান আমি আর করি না। বুঝেছি,—আমি তোমার সুখে বাদী হতে যাব কেন? তোমার সুখই আমার সুখ। তুমি যাতে সুখী হতে চেষ্টা কচ্ছ, আমার তাতে দুঃখ এলেও আমার সেই দুঃখেই সুখ। আমার এ নারী-জন্ম ব্যর্থ হয়েছে, তোমার সেবা-অধিকার হতে আমি এ জন্মের মত বঞ্চিত হয়েছি। তা হোক, তাতে যদি তোমার সার্থকতা আসে তা হলেও আমার শান্তি।......

কিন্তু হায়, চুরি করে গেলে কেন? অভাগিনীর সমক্ষে ত সব কথা অকপটে বলেছিলে। আশমানতারাকে গ্রহণব্যতীত তোমার আর অন্য উপায় নেই—এ কথা যখন তুমি স্পষ্টই বলেছিলে, তবে আর লুকিয়ে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? সে নিদারুণ সংবাদে আমি বিকলা হয়ে পড়েছিলাম, তাই কি বিদায়-ক্ষণে দেখা করনি? এমন ভুল কেন কল্লে প্রভু! যে হতভাগিনী আমরণ বিরহের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য কত্তে জগতে এসেছে, যে দুঃখিনী জীবনের মধ্যখান হতে চির-প্রার্থিতের বিচ্ছেদ-জ্বালা ভোগ-কত্তে জন্মগ্রহণ করেছে, আকস্মিক বিপৎপাতে সে ক্ষণেকের তরে একটু বিচলিত হয়েছিল বলে, তার শেষ সৌভাগ্যটুকুও কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেলে! একটীবার শেষ পদধূলি নিতে দিলে না, একটীবার শেষ বিদায়-চুম্বন দিয়ে গেলে না, একটীবার শেষ আলিঙ্গন করে, কিশোরী আমার, আমি আমার কর্ত্তব্যের উদ্দেশে চলেছি, তুমি অধীরা হয়ো না, আমি আসি,—শুধু এইটুকু বলে কেন চলে গেলে না! বীর তুমি,

এ সংকোচ তোমার কেন প্রভু!—দোষ তোমার নয়,—আমার ভাগ্যের!……

কিশোরী বঞ্চিত হয়েছে বলে সে তোমার প্রেমকে অবিশ্বাস করে না; কিশোরীর বুক ভেঙ্গে গিয়েছে বলে সে তোমাকে হৃদয়হীন এক দণ্ডের জন্যও ভাবে না। তোমার মত পতির যে অকলক্ষী হয়েছিল, সে তা ভাব্‌তে পারে না। জানি আমি, রূপের কুহকে, প্রেমের লালসায় তুমি চলে যাওনি। জানি আমি, কিশোরীকে তুমি এখনো ভুল্‌তে পারনি। জানি আমি, স্নেহের অনুপ এখনো তোমার স্নেহরাজ্য জুড়ে বসে রয়েছে। কিন্তু তবু যেন অভাব, তবু যেন অশান্তি, তবু যেন অস্থিরতা আমাকে পাগল করে তুলছে, আমি কিছুতেই তাদের ঝেড়ে ফেল্‌তে পাচ্ছি না! বুক ফেটে আর্ত্তনাদ আপনিই ছুটে বেরুচ্ছে, চোক ফেটে অশ্রু আপনিই গড়িয়ে পড়ছে, হাহাকারকে কিছুতেই নিবৃত্ত কত্তে পাচ্ছি না যে! ……

একবার এসো, তাই বলি, এক মুহূর্ত্তের জন্য গোপনে এসে দেখা দেও। সমাজের ভ্রূকুটী, লোক-মন্তব্যের কশাঘাত, ধর্ম্মের বাধা ঢের আছে, তা জানি, তবু তুমি সমস্ত অন্তরায়ের ব্যবধান খুঁজে নিয়ে একবার অভাগিনী কিশোরীর সম্মুখে এসে দাঁড়াও। তোমার কিশোরী বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, তাকে সইবার সাহস দিয়ে যাও—শক্তি দিয়ে যাও দেব! এসো প্রভু, আমি তোমাকে সে চোক দিয়ে দেখবো না, সমাজ তোমাকে যে চোক দিয়ে দেখ্‌ছে। তুমি যে বেশে আছ, সেই বেশেই এসো, আমি তোমাকে আমার আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তিতেই দেখ্‌বো। এসো, একবার এসো, কিশোরীর প্রাণেশ্বর—

কিশোরীর কণ্ঠরোধ হইল, সে আর বলিতে পারিল না। আর বলিতেও হইল না, সহসা কক্ষদ্বারে ঝঙ্কার উঠিল;—বউমা, ও বউমা,

কিশোরি, একি তুমি কাঁদ্‌ছ! বেশ! বেশ! বড় সুলক্ষণ! চারিদিকে সন্ধ্যার শাঁক বেজে মঙ্গল-আরতি কচ্ছে, তুমি সেই অবসরে ক্রন্দন-রোল তুলে ভাদুড়ীচক্রের খুব কল্যাণ কামনা কচ্ছ! ছি! ছি! এত শোক কিসের? এত শোক কার জন্য? যে স্বামী কুলে কলঙ্ক লেপন করে চলে যায়, যে স্বামী জাতি-ধ্বংসের কারণ হয়, যে স্বামী ধর্ম্মকে অবহেলা করে, সমাজকে অপদস্থ করে, যে স্বামী পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, যে হিন্দু স্বামী মুসলমান হয়ে মুসলমানীর কণ্ঠলগ্ন হয়, তার জন্য শোক! ধিক! এখনো বেঁচে আছ কেন? মর্ত্তে পারনি? যে দিন সে কুলাঙ্গার দূর হয়ে গেছে, সেই দিনই তোমার মরা উচিত ছিল। তা হলে জানতাম্, সে মরেছে, তুমিও তাকে অনুসরণ করেছ।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় রাণী ত্রিপুরাদেবী ছুটিয়া গিয়া, নবকিশোরীর অঙ্গ হইতে এক একখানি অলঙ্কার ছিনাইয়া লইতে লইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

এখনো অলঙ্কার গায়ে দিয়ে রেখেছিস্! এখনো বিলাস! মর্ত্তে পারিস্ নি, আকাঙ্ক্ষার এখনো নিবৃত্তি হয় নি! আমার ছেলে নেই, এখনো তুই তা বুঝ্‌তে পারিস নি, হতভাগিনি—

রাণীর চীৎকার শুনিতে পাইয়া, রাজা অবনীনাথ দ্রুত সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি রাণীর পা-দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন ;—রাণি, রক্ষা করো, আমার স্বর্ণ-প্রতিমাকে অলঙ্কারহীন কোরো না। বিপত্নীক বৃদ্ধের একমাত্র সান্ত্বনা নয়ন-পুতলীকে পদদলিত করো না। দেবি, দয়া করো, বৃদ্ধকে ক্ষমা করো, আমার এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করো। আমি আমার মাকে সাঁতোড় নিয়ে গিয়ে, যদুনারায়ণের হিরণ্ময়ী মূর্ত্তির পাশে

বসিয়ে রাখ্‌বো, মাকে আমার সে ভয়ঙ্করী বেশে দেখ্‌তে পার্ব্বো না, আমি পাগল হয়ে যাবো।

আগুন দ্বিগুণ জ্বলিল। রাণীর চক্ষে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি অধিকতর কঠোর কণ্ঠে বলিলেন ;—

রাজা, তুমি না সমাজপতি! বারেন্দ্র-সমাজের মুখপাত্র না তুমি! এই তোমার সমাজ নীতি! তবে তোমরাই ত সমাজকে পঙ্গু করে দিচ্ছ! আজ তোমার জামাই ব্যভিচারী, তুমি তোমার মেয়ের মুখের পানে চেয়ে সোণার জামাতা তৈরী করে মেয়ের পাশে বসাতে চাইছ, এতটা স্বার্থের কলুষ নিয়ে তুমি সমাজপতির আসনে বসেছ! তবে ত সমাজ ধ্বংস হবেই, শত অনাচার স্বেচ্ছাচারে হিন্দুত্ব লুপ্ত হবেই। কিন্তু ঠিক জেনো রাজা, রাণী ত্রিপুরাদেবী তাতে প্রশ্রয় দেবে না। কিশোরীর উপর তোমার কোনও দাবি নেই, দাবি সম্পূর্ণ আমার। আমার বংশ-গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে আমার পুত্রবধূকে আমি যা খুসী তাই কর্ব্বো। আমার বংশের কল্যাণের জন্য, আমার শ্বশুর-গোষ্ঠীর পবিত্রতা রক্ষার জন্য, আমার গৃহলক্ষ্মীকে আমি যে বেশে সাজাই না কেন, তাতে তোমার হস্তক্ষেপ কর্ব্বার কোনো অধিকার নেই। যদি সে দৃশ্য দেখ্‌তে আপনাকে অক্ষম বোধ করো, অন্তঃপুরে এসো না। আমার পুত্র মৃত! আমি নিজ হস্তে কিশোরীকে বৈধব্যের বেশ পরিয়ে দেবো।

এই বলিয়া রাণী দ্বিগুণ উৎসাহে নবকিশোরীর অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিতে লাগিলেন। কিশোরী স্থিরনেত্র; নেত্রপ্রান্ত দিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা পড়িতেছে, সে একদৃষ্টে মা-ব্রহ্মময়ীর চিত্র-পটখানির পানে চাহিয়া আছে।

সহসা ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহপ্রবিষ্ট হইলেন ও অতি শান্ত স্বরে বলিলেন ;—মা, ক্ষান্ত হও।

রাণী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—স্কন্ধে নামাবলী, গলে রুদ্রাক্ষমালা, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক-লেখা, জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ।

তখন প্রায় সমস্ত অলঙ্কার দেহচ্যুত হইয়াছে, মাত্র প্রকোষ্ঠে কঙ্কণ, সীমন্তে সিন্দূর-রেখা ও পরিধানে অর্দ্ধমলিন পট্টবস্ত্রখানি কিশোরীর বৈধব্যের অন্তরায়-চিহ্ন-স্বরূপ অবশিষ্ট ছিল। রাণী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন ;—অত উতলা কেন মা! কিশোরীকে এখনি বৈধব্যের বেশে সাজিয়ে তোর কি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে? কিশোরী এখনো সধবা—এ শাস্ত্র-বিধান।

রাণী শিহরিয়া উঠিলেন, কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন ;—ব্রা-হ্ম-ণ!

ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন—বলিলেন ;—মৃতের সংকার সম্পূর্ণ হলে তবে ত পত্নী বিধবা হয়, ভুল কচ্ছিস্ কেন মা! এখনি সতীর অকল্যাণ কচ্ছিস্ কেন মা!

এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় সস্নেহে কিশোরীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন ;—লক্ষ্মী দিদিটী আমার, কেঁদো না। ধৈর্য্য ধরো, ধৈর্য্যই স্ত্রীজাতির অলঙ্কার। মা-জানকী কত কষ্ট সয়েছিলেন, সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর অংশভূতা শক্তিরূপিণী তোরা, তোরা না সইবি ত কারা সইবে বল্ ত?

কতকটা আশ্বস্ত হইয়া রাজা পালঙ্কের উপর বসিয়া কন্যার পৃষ্ঠের বসন সংযত করিয়া দিতে লাগিলেন।

রাণী নিস্তব্ধ। তাঁহার অন্তরে তখন প্রলয় চলিয়াছে। যতক্ষণ উদ্দাম বায়ু বহিতে থাকে, ততক্ষণ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। বায়ু স্তম্ভিত হইলেই মেঘ সঞ্চিত হয়।

বাহিরে অনুপের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাণীর পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন ;—মা! মায়ের প্রাণ যে কতটা মর্ম্ম-যাতনায়, কতটা ক্ষোভের তাড়নায় এত নিষ্ঠুর হয়, তা বেশ জানি। কিন্তু অভিমানিনি! এ বৃথা চেষ্টা কেন? কুমাতা ত হয় না! মাতা কখনো পুত্রের স্মৃতি মুছে ফেল্‌তে পারে? গর্ভে ধরে যাকে পোষণ করেছ, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে যাকে মানুষ করেছ, শয়নে স্বপনে যার সুকুমার ছবি তোমার অন্তরাল হয়নি, যার মধুমাখা মা সম্বোধনে তুমি ঘুমিয়েও সাড়া দিয়েছ, সেই সন্তান, বুকের অস্থি সেই যে সন্তান, মাতৃনামের সার্থকতা সেই যে সন্তান, তার স্মৃতি তুমি কেমন করে মুছবে মা! তুমি যতদিন থাক্‌বে, যদুর স্মৃতি ততদিন থাক্‌বে, কিশোরী যতদিন থাক্‌বে, যদুর স্মৃতি ততদিন থাক্‌বে, ভাদুড়ী-চক্র যতদিন থাকবে, যদুর স্মৃতি ততদিন থাক্‌বে, আর ভাদুড়ী চক্রের বর্ত্তমান আশা-ভরসা, আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা অনুপম অনুপ—

বলিতে বলিতে—অমনি নাচিতে নাচিতে অনুপম অনুপ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল ;—ঠাকু-মা!

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অধিকতর আবেগ জড়িত উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ;—

ঐ দেখ্ মা! ঐ বয়সে তোর যদু ঠিক ঐরূপই ছিলো। ঐ দেখ্ সেই নিটোল নাসা, সেই আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু ; ঐ দেখ্ সেই প্রশস্ত ললাট, সেই সুঠাম সুগৌর অঙ্গশোভা। ঐ ত তোর যদু, তুই ক্ষেপেছিস্, যদুকে ভুল্‌বি!
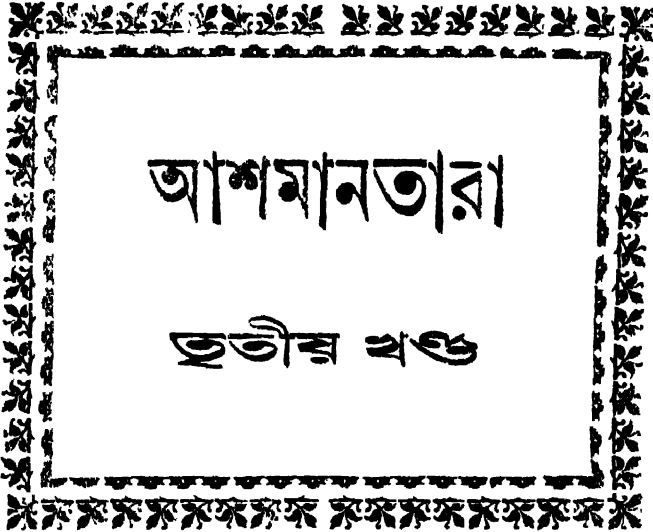
রাণী আর পারিলেন না। পুঞ্জীভূত জলদে বৃষ্টি ঝরিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন ও ছুটিয়া গিয়া স্তম্ভিত অনুপকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া,

দাদা আমার, ভাই আমার, সর্ব্বস্ব আমার, বংশতিলক আমার,—বলিতে বলিতে অজস্র চুম্বনে তাহাকে আকুল করিয়া তুলিলেন।

মা-ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সহসা সকলের চমক ভাঙ্গিল। অনুপকে কোলে লইয়া রাণী কিশোরীর হাত ধরিয়া ডাকিলেন ;—আয় মা, আয়—

কিশোরী উঠিয়া আসিল। সকলে ব্যস্ত ভাবে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

আশমানতারা

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

১

চিন্‌তে পারো কাসেম খাঁ!

চিন্‌তে এত বিলম্ব হবে কেন মা!

কি জানি, হাওয়া যে উল্টো বইতে আরম্ভ করেছে! করেছে কি,—দস্তুর মত বইছে! নসিব যখন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, বেপ্‌ড়তা যখন কথায় কথায় মানুষের উপর বিদ্রূপ চালাতে থাকে, তখন আর দুনিয়ার কারো উপর ভরসা কত্তে সাহস হয় না। তখন যেন একান্ত আপনার জনও তাকে উপহাস কচ্ছে,—কথায়-কার্য্যে টিট্‌কারী দিচ্ছে বলে সন্দেহ হয়। কাসেম, মনে পড়ে,—একদিন আমি তোমার উপর কতটা নির্ভর করেছিলাম?

খুব পড়ে—সে ত সেই সাহজাদায় সাহজাদায় লড়াইয়ের কথা! সাহজাদা লড়াই কত্তে ততটা ইচ্ছুক ছিলেন না। বিলাস-বাসনে তাঁর মতি স্থির ছিল না। তিনি স্বজাতি-ভক্ত ছিলেন,—কিন্তু স্বজাতির ভক্তি আকর্ষণ কত্তে হলে, স্বজাতিকে সুপ্রতিষ্ঠ কত্তে হলে, যে সামর্থ্য বা আগ্রহের দরকার হয়,—তা তাঁর ছিল না। মা! মার্জ্জনা কর্ব্বেন,—মৃত সম্রাটের আত্মাকে আর আমি অপমান কর্ব্বো না। কিন্তু সেদিন শুধু আপনারই তেজস্বিনী বাণী আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল,—মুসলমানের প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য আজিম সাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কত্তে। আপনারই

গরিমাময়ী মূর্ত্তির পদতলে আমার মস্তক নত হয়ে পড়েছিল,—একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় এবং সেই শ্রদ্ধাই আমাকে সেই গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য প্রেরণা এনে দিয়েছিল। কিন্তু মা! হতভাগ্য কাসেম তার প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারে নি,—অধিকন্তু—

ক্ষুব্ধ হয়ো না কাসেম! আমি সব জানি,—শুনেছিও। তোমার চেষ্টার ত কোনো ত্রুটী হয় নি,—বীরের ন্যায়ই তুমি লড়েছিলে। দুর্ভাগ্য আমার,—আর দুর্ভাগ্য মুসলমান জাতির,—তাই সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম,—সেই ব্যর্থতার লজ্জাই তোমাকে আমার সহিত এতদিন সাক্ষাতের অবসর দেয় নি। আমিও সাক্ষাৎ করিনি,—এ পোড়া মুখ তখন আর দেখিয়ে বিশেষ লাভও ছিলো না। কিন্তু অন্তরালে থেকে আমি সব লক্ষ্য করেছি। কাসেম, জান আমি তোমাকে কতটা স্নেহ করি,—জান আমি নিঃসন্তান?

কাসেম খাঁ মাতৃ-মূর্ত্তির পানে চাহিলেন—ডাকিলেন;—মা!

ভেবো না কাসেম, শুধু সম্রাটের মুখের পানে চেয়ে, সম্রাজ্ঞীর আসনে বস্‌বার প্রত্যাশায়, আমি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়েছিলাম। জাতিকে জাগিয়ে রাখ্‌তে গিয়ে ফতেমা বেগম অতটা স্বার্থপর হতে পার্ব্বে না, এটা স্থির ছিল। কিন্তু খোদা সে অবসর দিলেন না,—ফুরসুৎ কেড়ে নিলেন। হিন্দুর জয়-ডঙ্কা বেজে উঠলো,—হিন্দুর বই কি! সম্রাট্ হত হলেন,—তুমি আহত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় গৌড়ে নীত হলে। কিন্তু তবু ত মানুষ ভরসা হারাতে চায় না! মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস অবধি সে মৃত্যুর সহিত লড়াই করে, ব্যর্থতার মধ্যেও সে তার সফলতার জন্য হাত্‌ড়াতে থাকে,—যদি পায়,—খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে যদি মিলে যায়। আশা হলো, কাসেম এখনো জীবিত,—এখনো মুসলমান মরেনি,—

মুসলমান-মসনদের এখনো প্রত্যাশা আছে। দেখ্‌লাম, কাসেম আশমান-তারার কক্ষে,—আশমানের শুশ্রূষাধীন। আশমান, আজিম কন্যা আশমান। হোক্, তবু তাকে বড় ভালবাস্‌তাম। বড় সুন্দর তার মুখখানি। আহা, মা-হারা! বোঁটা-ছেঁড়া গোলাপ কলিটীর মত যখন সে তার ডাগর ডাগর চোক দুটীতে আমার পানে চাইত, আমি তাকে বুকে না নিয়ে, চুমু না খেয়ে থাক্‌তে পার্ত্তাম না,—ছুটে গিয়ে আঁক্‌ড়ে ধর্ত্তাম ; সেই আশমান। আজিমকেও যে আমি ভাল না বাস্‌তাম ঠিক তা নয় ; কিন্তু শেষে সে হিন্দুর বড় পক্ষপাতী হয়ে উঠ্‌লো, একেবারে বিগ্‌ড়ে গেলো, নিজের মেয়েটীকে অবধি নিজে মর্জ্জিমত গড়ে তুলতে লাগলো। কিন্তু তবু যেন মেয়েটাকে ভাল না বেসে থাক্‌তে পার্ত্তাম না! ক্রমে ক্রমে সে বড় হয়ে উঠ্‌তে লাগলো, আহা কি রূপের ঐশ্বর্য্যই না খোদা তার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলেন! সব ভাল, কেবল একটা খুঁৎ! সে যে ভয়ানক ত্রুটী, বাপের শিক্ষায় সে হিন্দুকে টানে। এদিকে দেখ্‌তে দেখতে গোলমাল বেঁধে উঠলো, আজিম মলো,—আমারো কপাল ভাঙ্‌লো। যাক্, হাঁ তারপর, সেই পিতৃহীনা আশমানের কক্ষে পীড়িত কাসেম, আর আশমান তার পাশে বসে তার সেবা কচ্ছে! হিংসাও হলো, আনন্দও হলো, অদৃষ্টের এত পরিহাস সত্বেও আশা হলো। একদিন লুকিয়ে দেখে এলাম, অতিরিক্ত রক্তস্রাবে পাণ্ডুর মুখ-কান্তি কাসেম, আর তার পার্শ্বে উদ্বেগ-জড়িত মুখে আশমান নির্ণিমেষ নেত্রে সেই ম্লান মুখ খানির পানে চেয়ে আছে! আশমানের চক্ষে জল, সে জল পিতার জন্য নয়, বেশ বোঝা গেলো। ভাব্‌লাম, তাই যদি হয়, এই ভাবে যদি মিলন হয়ে যায়, তা হলেও সুখ, আমার এ বৈধব্য তাহলেও সহনীয়। ক্রমে দেখ্‌লাম কাসেম, তুমি আশমানের

রূপে বিভোর হয়ে গিয়েছ। হওয়ারই কথা, বেটী যে রূপের ভাণ্ডার উজাড় করে তোমার সম্মুখে এসেছে, সে ত ভুলবার মত রূপ নয়! যুবক তুমি, রূপবান তুমি, প্রেমিক তুমি, তুমি ত তাকে অনাদর কত্তে পারো না! সে যে তোমারি যোগ্য, তাই তুমি তাকে তার যোগ্য আসনেই বসিয়েছিলে। কাসেম! সঙ্কুচিত হয়ো না;—সে মোহ স্বাভাবিক, সে মোহ সুন্দর, অন্যায় ত কিছু নয়!

কাসেমের সঙ্কোচ দূর করিয়া নসেরিত-বেগম পুনরায় বলিতে লাগিলেন;—ক্রমে আরো সুবাতাস বইতে লাগলো। রাজা গণেশের উদারতায় হিন্দুমুসলমানে সম্প্রীতি হতে সুরু হলো, তুমি সুস্থ হলে, সেনাপতিত্ব গ্রহণ কল্লে, রাজা তোমার সহিত আশমানতারার বিয়ে দেবেন এমন মতও প্রকাশ কল্লেন। আশা দ্বিগুণ বেড়ে গেলো, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে তা হলে,—মুসলমানের দুঃখ কর্ব্বার আর কিছুই থাক্‌বে না।

কিন্তু তা ত হলো না! গৌড়-সীমান্তে যুদ্ধ বেধে উঠ্‌লো। দিল্লীর বাদসা প্রতিদ্বন্দ্বী। বীর তুমি,—বীরের আমন্ত্রণে ছুটে গেলে। কিন্তু যেদিন বীরের তাজ মাথায় পরে ফিরে এসে দাঁড়ালে কাসেম! সেদিন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। রাজা গণেশ নেই.—হিন্দু-মুসলমানে প্রীতির বিদ্যুৎ ঝিলিক্ দিয়ে নিবে গেছে। যদু উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতার আসনে বস্‌তে আরম্ভ করেছে। মুসলমান তাতে রাজী নয়। রাজী হবেই বা কেন? এতদিন যে মুসলমান হিন্দুর নেতৃত্ব স্বীকার করেছিল, সেটাকেও আমি প্রশংসা কত্তে পারি না, তা তুমি যা বল কাসেম! জাতি-মাত্রই স্বার্থপর,—স্বার্থের জাগরণ নইলে জাতীয়ত্ব রক্ষা হয় না। জাতির জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থই বিসর্জ্জন দিতে হয়.—জাতির স্বার্থ গেলে জাতির রইল কি? সুতরাং, হিন্দুর উদারতা ধরা পড়ে গেলো। তুমি দিগ্বিজয়

করে এলে,—হিন্দু তোমাকে সম্বর্দ্ধনা কল্লে না,—তোমাকে অপমান কল্লে!

ইতিমধ্যে একদিন শুন্‌লাম,—ওঃ! সে কি শুন্‌লাম! যদু আশমানতারার প্রতি অনুরক্ত,—শুধু যদু নয়,—আশমানও—! কি ব্যাপার! মাল্যদান—বিনিময়ে আবার অঙ্গুরীয়দান অবধি! পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি জলে উঠ্‌লো। কিন্তু তবু যেন বিশ্বাস কত্তে ইচ্ছা হয় না; গৌড়-বাদসার একমাত্র পৌত্রী,—যার গর্ভে গৌড়-বাদসার ভাবী বংশধর,—যার গর্ভে মুসলমান জাতির গৌরবরক্ষার উপায় নিহিত,—যাকে আমি আমার কাসেমের যোগ্য পাত্রী বলে কত আশায় উৎফুল্ল হয়েছি,—যাকে যে ভাবে পাওয়ার আশায়, বুকে স্বামী-শোক পর্য্যন্ত স্থান দিই নি,—সেই আশমান স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হয়ে, হিন্দুর বাঁদী হতে চলেছে!—এও কি কখনো সম্ভব! কিন্তু কালক্রমে সেই অসম্ভবই কঠোর সত্যে পরিণত হতে চল্‌লো! শুধু তাই নয়,—কাসেম! মনে পড়ে সেই সেদিনের কথা?—

বলিতে বলিতে নসেরিত-বেগমের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল; অক্ষিপ্রান্ত হইতে জ্বালা নির্গত হইল; রুদ্ধ আবেগে বক্ষঃস্থল ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধে ও ক্ষোভে কাঁপিতে লাগিলেন। কাসেম খাঁ সেই বেপথুমানা তেজস্বিনী মহিলার পানে নির্ব্বাক্ ভাবে চাহিয়া রহিলেন। বেগম বলিয়া যাইতে লাগিলেন;—

যদু তার প্রণয়-পাত্র হলো,—তুমি প্রত্যাখ্যাত হলে! হিন্দু—বিধর্ম্মী কাফের তার স্বামী হলো,—আর যথার্থ বীর,—জাতির গৌরব, প্রকৃত মুসলমান অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে এলো! খুব পুরস্কার পেয়েছ,—কেমন কাসেম! তার পিতার সৎকারের তুমিই না ব্যবস্থা করেছিলে গৌড়ে

এনে! বেশ প্রতিদান দিয়েছে! আর আমিও বেশ প্রতিদান পেয়েছি! আমি তাকে ভালবাসতাম কিনা,—তাই যেমন কর্ম—তেমনি ফল! আরো কত কি হবে,—এই ত তার আরম্ভ,—সবে নীলামের বাদ্য বেজে উঠেছে বই ত নয়!

উভয়েই ক্ষণকাল নীরব। দুইজনই মর্ম্মবেদনায় কাতর। সুতরাং কাহারও বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। কেবল ক্ষণে ক্ষণে এক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কক্ষস্থ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের পর কাসেম খাঁ বলিলেন;—কিন্তু মা, এ ত আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্ম্ম বা সমাজগত ব্যাপারে বর্ত্তমান সম্রাট্ জালালুদ্দিন বা সাহজাদী আশমানতারা কাকেও ত দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। যখন যদুনারায়ণ মুসলমান-ধর্ম্মমতে আশমানতারাকে গ্রহণ করেছেন, তখন আর আমাদের বল্‌বার মত কি আছে?

বেগমসাহেবা উত্তর দিলেন;—ব্যাপার এক হিসাবে ব্যক্তিগত হলেও, এস্থলে ধর্ম্ম বা সমাজকে একটু স্পর্শ কচ্ছে বই কি? সাধারণ সংসারের কথা হলে বিশেষ কিছু এসে যেত না। এ যে একটা সাম্রাজ্যের শীর্ষ-স্থানীয় সংসারের কথা কাসেম!—যার উপর গৌড়ের ধর্ম্মগত, সমাজগত, নীতিগত শৃঙ্খলা নির্ভর কচ্ছে, যে সংসারের ছায়াতলে গৌড়ের মুসল-মান নিশ্চিন্তমনে অবস্থান কর্ব্বে, কোনো উদ্বেগ, অশান্তি বা বিঘ্ন থাক্‌বে না,—এ যে সেই সংসার! আরো বুঝে দেখো,—এ হৃদয় নিয়ে ব্যাপার। একটা মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়া যত সহজ, একটা হৃদয় ভেঙ্গে আর একটা হৃদয় গড়া তত সহজ নয়। তোমরা বুঝ্‌লে না,—অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখ্‌লে না,—খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে, সহসাই বিশাল রাজ্যটাকে খেল্‌নার মতই যার তার হাতে তুলে দিলে! একি কম চুক! একি

একটা সোজা বোকামি তুমি মনে করো কাসেম! আশমানতারা ত হিন্দু বলতে অজ্ঞান! যত হিন্দুর সন্তান,—মুসলমান হলেও হৃদয়ে সে যে হিন্দুই! স্বেচ্ছায় সে মুসলমান হলে কোনো কথাই ছিলো না। সে ত জবরদস্তি মুসলমান! সে এই জাতিটাকে ভয় করে,—তাই সে মুসলমান ধর্ম্মের বর্ম্মে নিজেকে আবৃত করে ছলে মুসলমানকে আয়ত্ত কত্তে চায়। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে সে কিছুতেই চুপ করে থাক্‌বে না,—নিশ্চয়ই সে কৃত্রিম আবরণ ছুড়ে ফেলে দেবে। তখন তোমরা এম্‌নি ঠকা ঠক্‌বে যে, তার প্রতীকারের আর কোনো উপায় থাক্‌বে না। কাসেম! আশমানতারা হতে বঞ্চিত হয়েছ, সাম্রাজ্য হতে নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করেছ, শুধু সেই যাদুকরের যাদুমন্ত্রে! তুমি বীর,—কিন্তু শুধুই বীর; কূট-নীতিতে তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। বিরক্ত হয়ো না,—আমি তোমার ভালর জন্য,—শুধু তোমার কেন,—জাতির ভালর জন্যও এ কথাগুলো তোমাকে জানাচ্ছি। তোমাকে আমার পুত্রের আসনে বসায়েছি, তোমাকেই এই পতনোন্মুখ জাতির একমাত্র স্তম্ভ বলেই জানি, তাই তোমাকে জানাতে এসেছি। খুব সাবধান কাসেম খাঁ,—এখনো সতর্ক হও। অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেছ,—শীঘ্রই ভুল ভেঙে যাবে। সেটাকে শুধ্‌রে নিতে এখন থেকে প্রস্তুত হও।

কাসেম খাঁ বলিলেন;—সম্রাট্‌কে নিয়ে শীঘ্র একটা গোলমাল যে বাধ্‌বে, এ সংবাদ আমি রেখেছি,—সেজন্য তৈরীও—

বেগম সাহেবা বলিয়া উঠিলেন;—সেজন্য যে ভাবে তৈরী হচ্ছ, তাতে কোনো ফলই হবে না। লক্ষ্য রেখেছ কি,—সেজন্য তোমাদের বাদসার কোনো উদ্বেগ বা চেষ্টা নেই? তিনি দিবারাত্র তোফা ফূর্ত্তি চালাচ্ছেন! আশমানের সঙ্গীত-লহর গৌড়-প্রাসাদের আশমান প্রায় সকল সময় সরগরম

করে রেখেছে! তাদের চিন্তা কর্ব্বার কি গরজ? মর্ত্তে মর্ব্বে মুসলমান; বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না,—কপট সম্রাট্ স্তোক-বাক্যে তোমাদের বিভ্রান্ত করে রাখ্‌ছে! যখন হিন্দুসৈন্য গৌড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে, তখন তোমরা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাক্‌বে, আর তোমাদের পিয়ারের বাদসা হাস্‌তে হাস্‌তে হিন্দুর কাছে আত্মসমর্পণ কর্ব্বেন,—তোমরা একাল-আখেরের মত জাহান্নমে যাবে। যাবে না?—এই বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না,—কত কারচুপি,—হিন্দু মুসলমান হতে পারে,—আর মুসলমান হিন্দু হতে পারে না!—একি একটা কথা!

কাসেম বলিলেন;—না মা,—তা ত নয়,—শুনেছি, মুসলমানও হিন্দু হতে পারে,—তবে ব্রাহ্মণ হয় না,—হীন শূদ্র হতে পারে।

বেগম সাহেবা বলিলেন;—তাই না হয় হলো,—হিন্দু ত হতে পারে? তবে আর কি? এইটুকু বোঝ না কেন,—যে হিন্দু মুসলমান হতে পারে, সে মুসলমান হিন্দু হতে কতক্ষণ? না হয়, প্রথমে সে শূদ্রই হল,—শূদ্র হয়েই ধরো না কেন, সে রাজ্যশাসন কত্তে লাগ্‌লো, তাতে হিন্দু জাতির লোকসানটা কি? যে দেশের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা, সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব-স্থাপন করা তার পক্ষে কি এতই অসম্ভব! কাসেম, বোধ হয় তুমি জাননা, এ যুদ্ধোদ্যমের প্রধান পাণ্ডা কে?

কাসেম খাঁ চিন্তাযুক্ত ভাবে উত্তর দিলেন;—সমস্ত ঠিক খোঁজ পাই নি বটে, তবে যা শুনেছি, তাতে সাঁতোড়রাজ অবনীনাথই এ যুদ্ধের নেতা, আর তাই-ই সম্ভব।

বেগমসাহেবা হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না,—হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—ঐ ধারণাটাই তোমাদের ভুল। কাসেম! জেনে রাখো,—

ছেলের বিরুদ্ধে মায়ের এ অভিযান! জগতের ইতিহাসে এ একটা নূতন ঘটনা!

কাসেম খাঁ সবিস্ময়ে বলিলেন;—সে কি! রাণী ত্রিপুরা দেবী?

বেগমসাহেবা দৃঢ়তাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিলেন—হাঁ তাই! আর কেন তা জানো?

কাসেম খাঁর তবু যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। তিনি জানিতেন,—রাণী ত্রিপুরার স্নেহচ্ছায়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিরই তুল্যাধিকার। আজ এই আকস্মিক বিপর্য্যয়ে সে সমদৃষ্টির ব্যতিক্রম ঘটিলেও, তাহা স্বভাবশান্ত বঙ্গরমণীর চিত্তকে ততটা উদ্বেজিত করিতে পারে না যাহাতে এতবড় একটা পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা সম্ভাবিত হয়। কিন্তু আবার ভাবিলেন,—রাণী তেজস্বিনী; রাজা গণেশনারায়ণ স্বয়ং অনেক সময় সে তেজস্বিতার সমক্ষে পরাজয় স্বীকার করিতেন। মনে পড়িল, কুমার যদুনারায়ণের সেই অসামান্য বীরত্বের কথা,—যে অমিতবীর্য্য একদিন দিল্লীশ্বর-বিজয়ী কাসেম খাঁর বাহু-বলকেও ব্যাহত করিয়াছিল। কিন্তু রমণীর অভিযান,—তাহা কি হইতে পারে? তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিলেন;—যদিও হয়, তাহলে বুঝ্‌তে হবে, এ অভিমানের অভিযান,—ধর্ম্মত্যাগী পুত্রের বিরুদ্ধে ধর্ম্মান্ধ জননীর এ আক্রমণ। এতে হিন্দু বা মুসলমান কোনো জাতির সংশ্রব নেই।

বেগমসাহেবা সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন;—কাসেম, না বলে থাক্‌তে পাচ্ছি না,—তোমার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে! তোমার সে মস্তিষ্ক আর নেই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এত অল্প দিনের দাসত্বে তুমি এতটা বিকৃত হয়ে পড়েছ! মা ছেলেকে শাস্তি দিতে আস্‌ছে, কোলের শিশুটী কিনা! কাসেম! যা ভাব্‌ছ তা নয়।

করে রেখেছে! তাদের চিন্তা কর্ব্বার কি গরজ? মর্ত্তে মর্ব্বে মুসলমান; বুঝ্‌তে পাচ্ছ না,—কপট সম্রাট্‌ স্তোক-বাক্যে তোমাদের বিভ্রান্ত করে রাখ্‌ছে! যখন হিন্দুসৈন্য গৌড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে, তখন তোমরা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাক্‌বে, আর তোমাদের পিয়ারের বাদসা হাস্‌তে হাস্‌তে হিন্দুর কাছে আত্মসমর্পণ কর্ব্বেন,— তোমরা একাল-আখেরের মত জাহান্নমে যাবে। যাবে না?—এই বুঝ্‌তে পাচ্ছ না,—কত কারচুপি,—হিন্দু মুসলমান হতে পারে,—আর মুসলমান হিন্দু হতে পারে না!—একি একটা কথা!

কাসেম বলিলেন;—না মা,—তা ত নয়,—শুনেছি, মুসলমানও হিন্দু হতে পারে,—তবে ব্রাহ্মণ হয় না,—হীন শূদ্র হতে পারে।

বেগম সাহেবা বলিলেন;—তাই না হয় হলো,—হিন্দু ত হতে পারে? তবে আর কি? এইটুকু বোঝ না কেন,—যে হিন্দু মুসলমান হতে পারে, সে মুসলমান হিন্দু হতে কতক্ষণ? না হয়, প্রথমে সে শূদ্রই হল,—শূদ্র হয়েই ধরো না কেন, সে রাজ্যশাসন কর্ত্তে লাগ্‌লো, তাতে হিন্দু জাতির লোকসানটা কি? যে দেশের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা, সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব-স্থাপন করা তার পক্ষে কি এতই অসম্ভব! কাসেম, বোধ হয় তুমি জাননা, এ যুদ্ধোদ্যমের প্রধান পাণ্ডা কে?

কাসেম খাঁ চিন্তাযুক্ত ভাবে উত্তর দিলেন;—সমস্ত ঠিক খোঁজ পাই নি বটে, তবে যা শুনেছি, তাতে সাঁতোড়রাজ অবনীনাথই এ যুদ্ধের নেতা, আর তাই-ই সম্ভব।

বেগমসাহেবা হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না,—হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—ঐ ধারণাটাই তোমাদের ভুল। কাসেম! জেনে রাখো,—

ছেলের বিরুদ্ধে মায়ের এ অভিযান! জগতের ইতিহাসে এ একটা নূতন ঘটনা!

কাসেম খাঁ সবিস্ময়ে বলিলেন ;—সে কি! রাণী ত্রিপুরা দেবী?

বেগমসাহেবা দৃঢ়তাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিলেন—হাঁ তাই! আর কেন তা জানো?

কাসেম খাঁর তবু যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। তিনি জানিতেন,—রাণী ত্রিপুরার স্নেহচ্ছায়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিরই তুল্যাধিকার। আজ এই আকস্মিক বিপর্য্যয়ে সে সমদৃষ্টির ব্যতিক্রম ঘটিলেও, তাহা স্বভাবশান্ত বঙ্গরমণীর চিত্তকে ততটা উত্তেজিত করিতে পারে না যাহাতে এতবড় একটা পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা সম্ভাবিত হয়। কিন্তু আবার ভাবিলেন,—রাণী তেজস্বিনী; রাজা গণেশনারায়ণ স্বয়ং অনেক সময় সে তেজস্বিতার সমক্ষে পরাজয় স্বীকার করিতেন। মনে পড়িল, কুমার যদুনারায়ণের সেই অসামান্য বীরত্বের কথা,—যে অনিতবীর্য্য একদিন দিল্লীশ্বর-বিজয়ী কাসেম খাঁর বাহু-বলকেও ব্যাহত করিয়াছিল। কিন্তু রমণীর অভিযান,—তাহা কি হইতে পারে? তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিলেন ;—যদিও হয়, তাহলে বুঝ্‌তে হবে, এ অভিমানের অভিযান,—ধর্ম্মত্যাগী পুত্রের বিরুদ্ধে ধর্ম্মান্ধ জননীর এ আক্রমণ। এতে হিন্দু বা মুসলমান কোনো জাতির সংশ্রব নেই।

বেগমসাহেবা সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ;—কাসেম, না বলে থাক্‌তে পাচ্ছি না,—তোমার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে! তোমার সে মস্তিষ্ক আর নেই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এত অল্প দিনের দাসত্বে তুমি এতটা বিকৃত হয়ে পড়েছ! মা ছেলেকে শাস্তি দিতে আস্‌ছে, কোলের শিশুটী কিনা! কাসেম! যা ভাব্‌ছ তা নয়।

মা আস্‌ছে ছেলেকে সুপ্রতিষ্ঠ কত্তে, আর তোমাদের দফাটা একেবারে রফা কত্তে! আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তোমরা কিছুতেই পেরে উঠ্‌বে না।

কাসেম খাঁ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন;—হাঁ মা, এইবার বুঝ্‌তে পেরেছি, রাজনৈতিক ব্যাপারে শুধু উজ্জ্বল দিক দেখ্‌লে চল্‌বে না,—বিশেষ শত্রুর। হিন্দু মুসলমানকে যতই আপনার বলে ঘোষণা করুক্, সে তার জাতিকে ঠেলে দিয়ে মুসলমানকে ঠাই দেবে না। যদি দেয়, বুঝ্‌তে হবে, তার মধ্যে তঞ্চকতা আছে, অথবা তার মধ্যে জাতি বলে কিছু নেই, সে মানুষ নয়। মা! আমার প্রাণে নিচ্ছে, সম্রাট্ এখনো হিন্দু, হিন্দুরাজ্য-স্থাপনই তাঁর উদ্দেশ্য, মুসলমানধর্ম্ম-গ্রহণ তাঁর লৌকিক অনুষ্ঠান মাত্র।

বেগমসাহেবা উৎসাহভরে বলিলেন;—শুধু তাই নয়, আশমানতারার প্রতি আসক্তিই তাকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়েছে। সেটাকেও তুচ্ছ ভেবো না। প্রবৃত্তির দাসত্ব যত অনর্থের মূল। কাসেম! ভেবে দেখেছ কি, এত বড় বংশের মেয়ে শেষে কিনা একটা কাফেরের বাঁদী হলো! ছি! ছি! ধিক! যে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান জাতির আবরু-প্রথা একটা শ্রেষ্ঠ সভ্যজাতির আদব-কায়দা বলে খেতাব পেয়েছে, বাদসার হারেমে তার চিহ্নমাত্র নেই! বল্‌তে কি, অন্দরমহল আর বাজারে খুব সামান্যই তফাৎ! শুধু স্বেচ্ছাচার, যেন দানা-দৈত্যের নৃত্য চল্‌ছে! দুদিন পরে আরো ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে, সে এত ভয়ানক যে, ভাব্‌লে প্রাণ শিউরে ওঠে। কাসেম! সেই অবশ্যম্ভাবী বিপদের আশঙ্কায় আজ তোমার আশ্রয়ে এসেছি। আর আমি সে কাফেরের হাটে ফিরে যেতে চাই না, এখানে,—তোমার কাছে থাকৃতে চাই। কি বলো? মায়ের মর্য্যাদা—

কাসেম খাঁ আর বলিতে দিলেন না, বলিলেন ;—সন্তানকে আর লজ্জা দিও না মা! তোমার আশ্রয়ে তুমি থাক্‌বে, তোমার নফর তোমার হুকুম তামিল কর্ব্বে মাত্র। মা! বড় দুর্য্যোগ! মুসলমান জাতির এ বিপত্তির সময় তোমার মত বুদ্ধিমতী রমণীর উপদেশ, এই দিগ্‌ভ্রান্তের পক্ষে দীপ-বর্ত্তিকার কাজ কর্ব্বে। আমি তোমাকে ছাড়্‌তে পারি না ত! তুমি এখানেই থাকো। আমাকে জাগিয়ে রাখো, তন্দ্রালস জাতিটাকে যদি আবার ঝাঁকৃরা দিয়ে চেতিয়ে তুল্‌তে পারি। এসো মা, তোমার অবস্থান-কক্ষ তুমি নিজেই বেছে নাও, দাস তোমার সেবার কোনো ক্রটী কর্ব্বে না।

সেই দিন হইতে নসেরিত-বেগম দুর্গমধ্যেই রহিয়া গেলেন। কাসেম খাঁ ও অন্যান্য মুসলমান সেনানায়কগণের সহিত নানাপ্রকার মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া হিন্দুর গৌড়-আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সমস্ত ব্যাপার অতি গোপনে, অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিল। কোনও হিন্দু সৈনিক বা সামরিক কর্ম্মচারী যাহাতে সে ষড়যন্ত্রের বিন্দু-বিসর্গ জানিতে না পারে, ঘটনাচক্রে জানিতে পারিলেও, কোনও প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সুবিধা না পায়, সে জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হইল।

কাসেম খাঁ বুঝি সত্যসত্যই বিদ্রোহী হইলেন।

২

আশমানতারা তাহার সাধের সারঙ্গটী লইয়া গাহিতেছিল। গগন-স্পর্শী গৌড়-প্রাসাদের বিস্তীর্ণ ছাদতলে সুবিন্যস্ত সযত্নরোপিত নিত্য-সলিল-নিষিক্ত বেলা মল্লিকা গোলাপ যূথিকা পুষ্প বল্লরীর কান্ত-সুষমা নন্দন-কাননের শুভ-সূচন করিয়াছিল। ঊর্দ্ধে নীলাকাশ, নীলাকাশে রজত-কৌমুদী; সেই জ্যোৎস্না-প্লাবনের তরঙ্গ বিশ্ব ব্যাপিয়া সুশুভ্র পূত সাম্যের অভিনব বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল। বসন্ত-সমীর যেন অতি পটুতার সহিত সেই প্রসূন-সুরভি ও চান্দ্র-সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটাইয়া, গৌরবে লীলাভরে কখন্ বা সুন্দরী আশমানের চূর্ণালক-গুচ্ছে, কখন্ বা স্বচ্ছ স্ফটিক-বেষ্টনী স্বর্ণদীপাধারের গাত্রে লুটাইয়া পড়িতেছিল।

স্নিগ্ধালোক-সান্নিধ্যে বিচিত্র গালিচায় আলোক-প্রতিমা আশমান এইমাত্র তাহার লেখনী রাখিয়া সারঙ্গে গান আরম্ভ করিয়াছে। তাহারই রচিত সঙ্গীত, সঙ্গীতে তাহারই হৃদয়ের অভিব্যক্তি বিগলিত। সুধানিঃস্যন্দী কণ্ঠে সে গাহিতেছিল;—

আমি, দিবানিশি ধরি অর্চ্চনা করি,
তবু মনোমত হয় না—হয় না,
আমি, চির ব্যাকুলিত বিনোদিতে চিত,
তবু যেন মনে লয় না—লয় না!

আমি, কত আবাহনে কতবার ডাকি,
তবু মনে হয়,—কত রয় বাকি,
শুধু, ভাবভরে থাকি, অনিমিখ আঁখি,
ভাষা খুলে কিছু কয় না—কয় না !
তুমি, ভালবাসিয়াছ, সকলি দিয়াছ,
প্রতিদান তার পেলে না গো,
আমি, যা কিছু দিয়েছি, আদরে নিয়াছ,—
ঠেলে ফেলে চলে গেলে না গো ;—
আমি, কাঞ্চন পেয়ে কাচ-বিনিময়ে,
জানিনা কেমনে রাখিতে হৃদয়ে,
তুমি, তবু উজলিছ অবহেলা সয়ে,
সুখের এ দুখ সয় না—সয় না !

রজনীর প্রথম যাম সমাতীত। চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে এই মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত, যেন আকাশ, বাতাস, ফুলবীথি সমস্তটাকে বেদনাতুর করিয়া তুলিল ! আশমানের চক্ষে অশ্রু, আরক্ত মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু স্বেদ-নির্গম, অপূর্ব্ব শোভা !

কিন্তু তবু যেন আশমানের তৃপ্তি হইল না, প্রাণের আবেগ, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তবু যেন নিঃশেষে ব্যক্ত করা হইল না ! তাই ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, আরও যেন ভাব-বিভোর কণ্ঠে সে তাহার আরাধ্য দেবতার বন্দনা-গীতি আরম্ভ করিল। সে গাহিল ;—

হে মোর তৃষিত-চিত্ত-চাতক-
শীতলিত-পূত অমিয়-ধারা,

হে মোর জীবন-মরু-নিকুঞ্জ-
কান্ত-পান্থ-পাদপ-পারা।
হে মোর দয়িত সুচির-মধুর,
প্রেম-প্রশান্ত করুণা-বিধুর,
সঞ্চিত কত পুণ্য হে মোর,—
বাঞ্ছিত মম জীবন সারা।
নিরুপম কম প্রিয়তম মম,
দিব্যানিন্দ্য সুন্দরতম,
অতি মনোরম তুমি প্রভু মম,
চিরাধীনা দাসী আপনা-হারা ;—
তুমি সুবিশাল হে মোর সিন্ধু,
আমি সে তটিনী-সলিল-বিন্দু,
কোটী শশী তুমি, আমি তব পাশে
ক্ষুদ্র তারকা—"আশমানতারা"।

গান সমাপ্তির পর আশমান ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সুর-সুরভি যেন সেই স্তব্ধতার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন সময় পশ্চাদ্দেশ হইতে গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল ;—আশমান,—

আশমান চমকিল না, শুধু উৎফুল্ল হইল। সে যাঁহার ধ্যানে বিভোর, সে যাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, এ যে তাঁহারই নিত্যশ্রুত, নিত্যমধুর কণ্ঠস্বর! অপ্রত্যাশিত আহ্বান নয় ত! সে সযত্নে সারঙ্গটী রাখিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং অতি আগ্রহে মৃণাল-বাহু বিস্তার করিয়া, কাঙ্ক্ষিতের করপল্লব নিজ কুসুম-পেলব করতলে ন্যস্ত করিয়া উৎসুক কণ্ঠে শুধু বলিল ;—প্রভু!

এ ভাবে কত দিন চল্‌বে আশমান ?

ভাবটা কি দেখলে ?

এই ভাব-বিভোর ভাব ?—না, আশমান, তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি কচ্ছ।

বাড়াবাড়িটা কি ? যা ঠিক তাই ত কচ্ছি !

তুমি বড় বেশী বুঝে ফেল্‌ছ আমাকে।

বেশী বুঝ ছি কি রকম ?

নয় ?

তোমার বোধ হতে পারে, আমার কাছে নয়।

আমি তোমাকে সব দিয়েছি, তুমি কিছুই দেওনি, কথাটা কবিত্বের বটে, গানে—বিশেষ তোমার মন-মাতানো গলায় আরো মিষ্ট লাগে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে ঠিক তার উল্‌টো। তুমিই দিয়েছ, আমিই বরং দিইনি, দিতে পারিনি। তুমি আমার কাছ থেকে সমস্ত ভালবাসা নিঃশেষে নিতে পার না ত ! জানই ত আমি কি প্রেমের রাজ্য ছেড়ে এসেছি, জানই ত আমি কি ঐশ্বর্য্য কেড়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছি, জানই ত আমি একজনকে একেবারে নিঃস্ব করে চলে এসেছি ! তার জন্য আমার কি এতটুকু কর্ত্তব্য নেই, এত বিশ্বাসঘাতক, হৃদয়হীন আমি ! না, তা আমি হতে পারবো না, কখনো না ! তার যা, তার প্রাপ্য যেটুকু, সে আমার কাছে তার গচ্ছিত থাক্‌বে, সুদূর ব্যবধানের মধ্যেও আমার তা অতি সন্তর্পণে রক্ষা কত্তে হবে। আজ নয় একদিন, এ জীবনে নয়, জীবনের পরপারে, সে সম্পদ আমার তাকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতেই হবে। তবে আমি তোমাকে কি দিলাম, কতটুকু দিলাম আশমান ! তুমিই ত বরং সর্ব্বস্ব দিয়েছ ! প্রেমময়ী আমার, আমাকে আর লজ্জা দিও না !

এত সঙ্কোচ কেন নাথ! তুমি মহৎ, তাই নিজেকে অত তুচ্ছ ভাব্‌ছ। তুমি যা দিয়েছ, আমার পক্ষে তা প্রচুর, পর্য্যাপ্ত। তোমার সুবিস্তীর্ণ হৃদয়ের এক প্রান্তে আমাকে আশ্রয় দিয়েছ, অতি ক্ষুদ্র আমি, আমার কাছে সে যেন একটা বিরাট্‌ সাম্রাজ্য! সে সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী আমি, আমার অভাব কি? সাধ্বীর গচ্ছিত ধনে লোভ আমার কি দরকার? সে ধন গচ্ছিতই থাকুক, দিনে দিনে, স্তূপে স্তূপে সে ঐশ্বর্য্য বেড়ে উঠুক, আমার তাতে হিংসা কি? বলতে পারো, নারী স্বামীর ভাগ দিতে বড় নারাজ। কিন্তু সে কেন? যে স্বামীর অন্তর সংকীর্ণ, একাধিকের উপযুক্ত প্রেম যে স্বামী বিতরণ কর্ত্তে অক্ষম, এক কে সন্তুষ্ট কর্ত্তে যে স্বামীর হৃদয় নিঃশেষ হয়ে যায়, সে স্বামীর স্ত্রী, সে স্বামীর সাধারণ স্ত্রী সপত্নী-বিদ্বেষ কর্ত্তে পারে। কিন্তু প্রেমের অধিরাট্‌ যে স্বামী, যে স্বামীর প্রেম শুধু দাম্পত্যের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ নয়, বিশ্বপ্রেমিকের প্রতিমূর্ত্তি যে স্বামী, সে স্বামীর অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে কোন্‌ নারী নিজ সৌভাগ্যে তৃপ্ত নয়? স্বামিন্‌, অফুরন্ত ভাণ্ডার তোমার, প্রেমের সাগর তুমি, তোমার লজ্জা! ছি! লজ্জা আশমানের,—যে সেই প্রেমসিন্ধুতে এক অঞ্জলি জলদান কর্ত্তে প্রয়াস পায়!

আশমান, তুমি অত্যন্ত ভাব-প্রবণ হয়ে পড়েছ। তোমাকে আমি এঁটে উঠ্‌তে পার্ব্বো না। তোমার গান, তোমার কথা, তোমার প্রতি কার্য্য, সমস্তই যেন কি এক প্রহেলিকা, মধুর, মোহন, কেমন যেন পবিত্র কি-একটা-কি! আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে, যেন সমস্ত ক্ষত সমস্ত জ্বালার উপর শীতল প্রলেপ দিয়ে রেখেছে, আমাকে আর্ত্তনাদ কর্ত্তে দেয় না। আশমান, তুমিই আমার সান্ত্বনা, একমাত্র শান্তি। কর্ত্তব্যের কশায় জর্জ্জরিত আমি, তুমিই আমাকে কতকটা স্থির রেখেছ।

হৃদয়ের সহিত লড়্ছি,—তোমার পানে চেয়ে। বিপদের উপর বিপদ, সমস্যার উপর সমস্যা জটিল হয়ে আস্ছে, তোমাকে অবলম্বন করে কতকটা ছিন্ন কচ্ছি। আবার এক বিপদ—গুরুতর সমস্যা এসে সম্মুখীন হয়েছে। আশমান, ভাব-রাজ্য থেকে একবার বাস্তব জগতে নেমে এসো আশমান! বড় বিপদ,—মা আমার যুদ্ধযাত্রা করেছেন।

আশমান বিস্ময়সূচক উৎকণ্ঠার সহিত বলিল:—মা!—সেকি! তুমিই ত সেদিন বল্‌ছিলে,—রাজা অবনীনাথের প্ররোচনায়, হিন্দু মুসলমানে এই সংঘর্ষের উদ্ভব হবে?

বলেছিলাম,—সংবাদও তাই পেয়েছিলাম। কিন্তু সে সময় এটাও ভেবেছিলাম,—মা আমার ভয়ানক তেজস্বিনী,—অত্যধিক অভিমানিনী। হিন্দুর প্রভাব গৌড়ের উপর অক্ষুন্ন থাকে, এই তাঁর মত। আমি কোনো দিন সে মতের সমর্থন কত্তে পারিনি বটে, কিন্তু একটী দিনও আমি তাঁর চোকের উপর চোক দিয়ে, সে মতের প্রতিবাদ পূর্ণভাবে কত্তে সাহসী হইনি:—নেত্রের দীপ্তি এত প্রখর,—সে বাণীর শক্তি এত বিপুল যে, আমাকে স্তম্ভিত নির্ব্বাক রাখ্‌ত। সেই অমিতবীর্য্যবতী নারীর, স্নেহ-কোমলা অথচ দৃঢ়তার প্রতিমূর্ত্তি মায়ের আমার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এই দুঃসাহসিক অনুষ্ঠান করেছি। সুতরাং, একটা অনর্থপাত হবেই। আশমান, মা তাঁর অবাধ্য সন্তানকে শাস্তি দিতে আস্‌ছেন।

আশমান জিজ্ঞাসিল;—তার পর, সন্তান এখন কি কর্ব্বেন স্থির কর্চ্ছেন?

এখনো কিছুই স্থির করে উঠ্‌তে পারিনি। কিন্তু এত শুধু সন্তানের কর্ত্তব্যপালন কল্লে চল্‌বে না। আশমান! গৌড়ের সম্রাট্-হিসাবে আমার আরো কর্ত্তব্য আছে।

তবে কি যুদ্ধই কর্ব্বে?

তাই ত ভাবছি।

ভাব্‌ছ কি? সে ভাবনা ছেড়ে দিতে হবে। মায়ের বিরুদ্ধে ছেলে লড়্‌বে, সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

কোন্‌টা স্বাভাবিক হচ্ছে আশমান! মা-ই ত ছেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর! ছেলে বাধা দিতে যাচ্ছে বই ত' নয়!

তবু—মা আর ছেলে—কেমনতর—

আশমান, মা বলেছেন কি জান? তাঁর পক্ষে আমি মৃত!

শতবার বলুন, সে তোমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ। যত রকমের ব্যবধান আসুক না কেন, পরস্পরের সম্বন্ধ—পরস্পরের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ সে ত যাবার নয়। তিনি অভিমানভরে যাই বলুন না কেন, তুমি তাতে বিচলিত হয়ো না, মায়ের অসম্মান কোরো না। শৈশবে মাকে হারিয়েছি। বাবার স্নেহের বুকের অফুরন্ত পীযূষ পান করে মায়ের অভাব তেমন বুঝ্‌তে পারিনি বটে, কিন্তু এক-এক দিন মায়ের জন্য প্রাণ এত হাহাকার করে উঠ্‌ত যে, শত চেষ্টাতেও বাবা আমায় সান্ত্বনা দিতে পার্ত্তেন না, অবশেষে নিজেই কেঁদে আকুল হয়ে পড়্‌তেন! এমন যে মা, যাঁর আসন একাধারে পিতামাতা আমার পিতা পর্য্যন্ত পূর্ণ কর্ত্তে পারেন নি,—সেই মায়ের অমূল্য-স্নেহ-বঞ্চিত আমাকে উপলক্ষ্য করে আজ মাতা-পুত্রে যুদ্ধ বাধ্‌বে,—তা কিছুতেই হতে দেবো না। আমি নিজ হাতে এক দিন আমার পিতাকে সমর-সাজে সাজিয়ে দিয়েছি,কিন্তু আজ যেন এ যুদ্ধকে সমর্থন কর্ত্তে কিছুতেই সাহস হয় না। সে যুদ্ধে এ যুদ্ধে অনেক প্রভেদ। আমার যেন বেশ মনে নিচ্ছে, এ যুদ্ধে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আজ তুমি সম্রাট্‌ বলে, সাম্রাজ্যের দিক দিয়ে মায়ের বিরুদ্ধে যদি দাঁড়াও, তা হলেও লোকে বল্‌বে, হিন্দু-দ্বেষী মুসলমান সম্রাট্‌ হিন্দুকে বিধ্বস্ত কর্ব্বার জন্য অস্ত্রধারণ করেছে।

হিন্দু সমাজ-সম্পর্কে তোমাকে হারিয়ে প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছে। যতই তুমি তোমার হৃদয় দিয়ে তাদের প্রতি সরল ব্যবহার করো না কেন, তারা কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস কত্তে চাইবেনা, তুমি তাদের সেই আপনার জনই আছ। বরং, এ যুদ্ধে তাদের বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হবে। কাসেম খাঁর নেতৃত্বে দিল্লীশ্বর-বিজয়ী গৌড়-সেনার সম্মুখে সাঁতোড় ও ভাদুড়ীচক্রের সম্মিলিত সৈন্য কতক্ষণ দাঁড়াতে পার্ব্বে? কিন্তু বুঝ্তে হবে,—এ অভিমানিনী মাতার অভিযান। তাঁর প্রেরণায় উন্মত্ত হিন্দুসৈন্য বেগতিক দেখ্লেও রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন কর্ব্বে না। বিশেষতঃ, মা যদি সঙ্গে থাকেন। যদি থাকেন কি? আছেন বলেই স্থির। তা হলে আরো বিপদ। এ যুদ্ধে একটা অনর্থক মহামারী হয়ে যাবে। তিনি হয়ত তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে অবশেষে নিজের জীবন অবধি বিসর্জ্জন কত্তে বদ্ধপরিকর হবেন। হিন্দু-জাতি চূর্ণ হয়ে যাবে, দুর্দ্ধর্ষ গৌড়-সৈন্য হিন্দু-রক্ত-কলঙ্কিত পতাকা উড্ডীন্ করে ফিরে আস্বে, সে আমি দেখ্তে পার্ব্বো না। প্রভু, কেমন করে সইব বল দেখি,—তোমার পুণ্যময় নামের সঙ্গে মাতৃঘাতী, স্বধর্ম্ম-দ্রোহী, স্বজাতি-বিধ্বংসী এই সকল অভিধান সংযুক্ত হবে! না, তা হতে দেবো না। সম্রাট্, এ যুদ্ধ স্যাম্যের পরিপন্থী, মায়ের সহিত ছেলের যুদ্ধ, এ এক অতি গর্হিতকর বৈষম্য।

সম্রাট্ একটু হাসিলেন মাত্র। তারপর অতি ধীরে, ঈষৎ বিদ্রূপব্যঞ্জক কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন;—তবে কি বল্তে চাও,—যুদ্ধ-বিগ্রহ না করে, সুবোধ সুশীল শিশুটীর মত চুপ্ করে বসে থাক্বো, আর আমার মা এসে, তাঁর কুসুম-কোমল হস্তে পৃষ্ঠে একটী মিষ্ট-মধুর চপেটাঘাত করে, অবাধ্য সন্তানকে তাঁর হতভাগা ছেলে বলে কোলে তুলে নেবেন! একদণ্ডের জন্যও ভেবো না, আশমান, এ মা তেমন মা নয়, এ বড় সাংঘাতিক মা!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সম্রাট্ গম্ভীরভাবে বলিলেন ;—এ মা গোমুখী-ধারার ন্যায় স্নেহ-শীতল হলেও, গোমুখী-নিঃস্রাবের ন্যায়ই ভীম-ভৈরব। আজ আমি তাঁর চক্ষে যে অপরাধে অপরাধী, তাঁর কাছে তার মার্জ্জনা নেই। আর আমি চুপ্ করে থাক্‌লেই বা মুসলমান শুন্‌বে কেন? আমি না হয় আমার মায়ের আক্রমণ সইতে পারি, অপরে তা সইবে কেন? ঠিক জেনো, আমাকে নিশ্চেষ্ট দেখ্‌লে সকলেরই সন্দেহ হবে,—আমি হিন্দুর পক্ষপাতী, আমি হিন্দুর হস্তে আত্মসমর্পণ কর্ত্তে সঙ্কল্প করেছি, হিন্দুর প্রতিষ্ঠা পুনঃ-স্থাপিত কর্ব্বার জন্য আমি নাম-মাত্র মুসলমান হয়েছি। আমাকে কপটী ভেবে মুসলমান বিদ্রোহী হবে। কাসেম খাঁর মনে এতদিনে আমি যে বিশ্বাসটুকু স্থাপন কর্ত্তে সমর্থ হয়েছি, তার বিনিময়ে অবিশ্বাস ও ঘৃণার আগুন দ্বিগুণ জলে উঠ্‌বে, তখন তাকে শান্ত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়্‌বে। সুতরাং, নিশ্চেষ্ট থাক্‌লেও আমাদের উদ্দেশ্য সেই ব্যর্থই হবে। আর যদি তাও না হয়, যদি কোনো প্রকারে মুসলমান সমাজ ও কাসেম খাঁকে নিরস্ত কর্ত্তে পারি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রতিবন্ধহীন বন্যার ন্যায়, হিন্দু-সৈন্য বিপুল বিক্রমে গৌড়ে এসে পড়্‌বে। ভেবো না, মা গৌড়ে পদার্পণ করেই চরিতার্থ হয়ে ফিরে যাবেন। তাঁর শিকার আমি,—আর—আর আমার জন্য তুমি!

সহসা সম্রাটের কণ্ঠস্বর গাঢ়তর হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন ;—আশমান, আজ যদি তোমার আমার অস্তিত্ব জগৎ থেকে সহসা লোপ পেয়ে যায়, তবেই বোধ হয়, মায়ের এ চিত্তবিক্ষোভ,—

আশমান সেই কথার পৃষ্ঠে বলিয়া উঠিল ;—না, তা কখনো নয়। মায়ের অভিমান কতটুকু? নারীর অভিমান, মাতৃজাতির অভিমান যতই ভীষণ হোক্ না, কতক্ষণ তা স্থায়ী হতে পারে সম্রাট্! কোমলতার মধ্যে কঠোরতা

কতক্ষণ ? নারী-হৃদয় যে একটুকুতেই বিগলিত হয় ! তাই ত নারীর কথায় কথায় অভিমান, সামান্য ব্যাপারে আঁখি-তটে অশ্রু ফুটে ওঠে ! তারপর মা যে করুণার উৎস ! সে যে সন্তানের মুখপানে তাকিয়ে তার সমস্ত ত্রুটী ভুলে যায় ! তাই যদি না হোত, মাতৃত্বের মধ্যে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ত্যাগ ও মমতার নিত্যলীলা না চল্‌ত, তবে জগতের কটী জীব বাঁচ্‌তে পার্‌ত ? মাতৃরোষ ঐ চপেটাঘাতেই পর্য্যবসিত, তার বেশী নয়। আমি তোমার মাকে জানি। সম্রাট্, তখন আমি শিশু, সবে মাতৃহারা হয়েছি। বাবা আমার পাণ্ডুয়াতে বেড়াতে গিয়েছিলেন,—শোকাচ্ছন্ন হৃদয়কে সান্ত্বনা দেবার জন্য তোমার পিতার রাজধানীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, আমাকে দেখে তোমার মা বলেছিলেন,—"আহা এমন বুকের ধনটী ছেড়ে মায়ের প্রাণ না জানি কোথা গিয়ে শান্তি পাচ্ছে ! মেয়েটীকে বুকে নিয়ে, তার মা-হারা অভাব খানিকক্ষণের জন্য দূর করে দিতে ইচ্ছা হয়। আজিম ! মেয়েটীকে ছেড়ে তিলার্দ্ধ থাক্‌তে পার না বুঝি ? তাই সঙ্গে এনেছ ? বেশ, খুব ভাল করেছ। আহা, সন্তান যে কি জিনিষ !" শুধু মুখের কথা নয়, চোখে তাঁর অশ্রু-রেখা দেখেছিলাম। তিনি দুহাত বাড়িয়ে আমাকে কোলে নিতে চেয়েছিলেন। আমি নূতন কোল বলে তাঁর কোলে যেতে চাইনি, বাবাকে জোরে আঁকড়ে ধরেছিলাম। তখন দুজনে খুব হাসি ! রাণী বল্লেন—"দেখে সুখী হলাম, মেয়ে বাপ্‌কে খুব চিনেছে। মায়ের অভাব একে তত জানাবে না।" সেই মা, কতটা কঠিন হতে পারেন ? মাটী কতটা কঠিন হতে পারে ? রৌদ্রতপ্ত হলে যতই কঠিন হোক্ না, সামান্য বারিপাতেই তা কর্দ্দমে পরিণত হয় না কি ?

সম্রাট্ আবেগভরে আশমানকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন;—

কিন্তু আশমান, এ দুরন্ত নিদাঘে সে মৃত্তিকায় সলিল-নিষেক কি করে হবে? মা যে অগ্নিমুখী হয়ে ছুটে আসছেন! আজ আমরা তাঁকে কি করে সিক্ত কর্ব্বো? আজ আর কি তিনি সে ভাবে তোমাকে কোলে নিতে চাইবেন আশমান!

আশমান উত্তর দিল;—দেখো, এসো আমরা এক কাজ করি। সৈন্যসজ্জা করে চলো আমরা মাকে গৌড়ে আহ্বান কত্তে যাই। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দুজনে গোপনে মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। একেবারে পায়ে লুটিয়ে পড়্বো। দেখ্বো, মাতৃহারার অশ্রু-নিষিক্ত মাতৃসম্বোধনে মায়ের হৃদয় কতক্ষণ কঠিন থাকৃতে পারে। তোমার কিছুই কত্তে হবে না, আমিই সব কর্ব্বো। দোষী আমি—আমিই মাপ চাইব, আমিই ভিখারীর ন্যায় তাঁর কাছ থেকে তোমার জন্য মার্জ্জনা চেয়ে নেবো। হৃদয় দিয়ে হৃদয় জয় কত্তে হবে। বাহুবল এখানে ব্যর্থ, বরং, অনর্থপাতের সূচনা কর্ব্বে। হয় ত এই সংঘর্ষে একটা জাতি একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তা হতে দেওয়া হবে না, দুটোকেই বজায় রাখ্তে হবে। সম্রাট্, এ ধাতু সে ধাতু নয় যে পিটিয়ে নেবে, এ গলিয়ে মিলিয়ে নিতে হবে—প্রীতির আগুনে। সেই ভাল যুক্তি। নাথ! এসো, মায়ের সহিত সন্তানের যুদ্ধ কি করে কত্তে হয়, একবার জগতকে দেখিয়ে দিয়ে যাই। অশ্রুই এ যুদ্ধের অস্ত্র, পা জড়িয়ে ধরাই এ যুদ্ধের দুর্গাবরোধ, মিনতিই এ যুদ্ধের চীৎকার। যদি অশ্রুপাতে সে হৃদয় বিগলিত না হয়, পদ-লগ্ন হলেও যদি তিনি পায়ে ঠেলে চলে যান, শত মিনতিতেও যদি তিনি বধির থাকেন, আত্মহত্যা কর্ব্বো। না হয়, সেইখানেই আশমানতারার শেষ-সমাধি হয়ে যাবে! আমিই অমঙ্গল, আমিই অন্তরায়, সেইখানেই তার সমাপ্তি হয় হোক্। সম্রাট্, আশমানকে তোমার অবিশ্বাস কোরো না। তোমাকে পেয়ে তার সব সাধ পূর্ণ হয়েছে, বাকি শুধু তোমাদের

মিলন আর সার্ব্বজনীন সাম্য, জীবন দিয়ে না হয় সে অবশিষ্টটুকু পূরণ করে চলে যাবো।

সম্রাট্ বলিলেন ;—তুমি তা পারো আশমান, আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। কিন্তু আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বল্‌তে থাকে, তখন তাকে ফুৎকার দিয়ে নির্ব্বাণ কত্তে চেষ্টা কল্লে সে ত নেবে না, বরং, দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে। এও ঠিক তাই হবে। এখন তিনি ক্ষমা কত্তে পারেন না। বরং, তোমার আমার অকস্মাৎ আবির্ভাবে তার অভিমান আরো উদ্দাম হয়ে উঠ্‌বে। আমি যে তাঁর সংসার চূর্ণ করে দিয়ে এসেছি! শুধু তাই নয়, তাঁর বিশ্বাস, আমি হিন্দুদ্বেষী হবো। হিন্দুধর্ম্মে অকপট বিশ্বাসবতী মা আমার, আমাকে হিন্দুর শত্রু ভেবে নিয়ে সেই শত্রুকে বিনাশ কত্তে আস্‌ছেন। সেই শত্রু আজ যদি তার মুসলমান-পত্নী নিয়ে, তাঁর কাছে মাপ চাইতে যায়, তাঁর কিছুতেই বিশ্বাস হবে না যে, সে তাঁর কাছে হিন্দুর মঙ্গল উপঢৌকন দিতে এসেছে। বরং, তিনি বুঝ্‌বেন, সে হিন্দুকে উপহাস কত্তে এসেছে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সম্রাট্ ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ;—তবে তাঁর ক্ষমা তখন আমি প্রত্যাশা কত্তে পার্ব্বো, যখন তিনি দেখ্‌বেন, ধর্ম্মান্তরগ্রহণ করেও আমি হিন্দুকে তার ন্যায্য দাবী থেকে একতিল বঞ্চনা কচ্ছিনে। যখন তিনি প্রত্যক্ষ দেখ্‌বেন, উভয় জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজ প্রত্যেকটীর মধ্য দিয়ে, এক অভিনব সাম্যের পূতধারা প্রবাহিত কত্তে সমর্থ হয়েছি, অথচ কোনটাই কোনটার সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে না, তখন। তখন এই শোক মন্দীভূত হয়ে আস্‌বে, আমার স্বভাব সহনীয় হয়ে উঠ্‌বে, হৃদয়ের জ্বালা জ্বলে জ্বলে ক্রমে শান্ত হয়ে পড়্‌বে। এখন নয়। আশমান, এ একটা বিপ্লব। এ বিপ্লবকে বাধা দেওয়া কিছু নয়,

বিপ্লবে ভেসে যাওয়াও কিছু নয়, বরং, বিপ্লব থেকে দূরে থাকাই উচিত, জল সরে যাক্, পথ মুক্ত করে দিতে হবে, যাতে এর জল সহজে অতি শীঘ্রই গিয়ে কাল-সাগরে লীন হতে পারে। আশমান, সে একদিন ত তোমাকে শুনিয়েছি, জাহ্নবীর জলোচ্ছ্বাসে ঐরাবত ভেসে গিয়েছিল। আমরাও সেই ঐরাবত, এ জল-প্রপাতের সম্মুখীন হলে আমরাও সেইরূপ ভেসে যাবো। সুতরাং, যেতে দাও তরঙ্গ-ভৈরব উন্মত্ত নর্ত্তনে ভাগীরথীর এ গৈরিক নিঃস্রাব। একদিন প্লাবন-মগ্ন ভূমি সদ্যঃস্নাত ফুল্ল-সৌন্দর্য্যে জেগে উঠ্‌বে, কত উষর ক্ষেত্র শস্য-শ্যামল হওয়ার অবসর পাবে, কত বনানী ফুলে-ফলে, কূজনে-গুঞ্জনে উচ্ছল সজীবতার সন্ধান দেবে। যখন উচ্ছ্বাস থেমে গিয়ে নির্ম্মল নিস্তরঙ্গ জলধারা বইতে থাকবে, তখন সেই স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন কোরো, শীতল হবে,—ধন্য হবে। আজ কোথা যাবে আশমান! আজ আমি তোমাকে সেখানে যেতে দেবো না। ঝাঁপ দিয়ে আগুন নিবিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আত্মহত্যা কর্ব্বে কেন? আমি তোমাকে হারাতে পার্ব্বো না। আজ আমার এই বিঘ্নবহুল জীবন-যাত্রার একমাত্র সঙ্গিনী তুমি, তুমিই আমার উৎসাহ, সান্ত্বনা যা কিছু সব, তোমাকে আমার সাথে সাথে থাক্‌তেই হবে। আমি আমার সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফেলেছি। আমি বড় নিঃস্ব,—একমাত্র সম্বল তুমি। সর্ব্বস্বের বিনিময়ে তোমাকে পেয়েছি, তোমাকে ছেড়ে আমি একদণ্ড স্থির থাকতে পার্ব্বো না, আমি লক্ষ্য হারিয়ে ফেল্‌বো। আমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাবো। মধুময়ী সঙ্গিনী আমার, তোমার মোহন আবেষ্টনে আমাকে ঘিরে নিয়ে অবস্থান করো। আমিই সব কর্ব্বো,—তোমাকে আর কিছুই কত্তে হবে না, শুধু মধ্যে মধ্যে তোমার পুষ্প-সুবাস আমাকে উপহার দিও, আমি পূর্ণোদ্যমে আমার কর্ত্তব্য পালন করে চলে যাবো, কিছুই তোমার ভাব্‌তে হবে না।

সম্রাট্ তখন আগ্রহাধিক্যে আশমানকে তাঁহার বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছেন। আশমানতারা অশ্রুসিক্ত কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে সম্রাটের পানে চাহিয়া হাস্যমধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল;—তবে সৌভাগ্যবতীর হৃদয়-সম্রাট্ কি কর্ব্বেন স্থির করেছেন ?

সম্রাটও ভাব-গম্ভীর হাস্যমধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন;—সৌভাগ্যবতীর হৃদয়-সম্রাট্ সৌভাগ্যবতীর হৃদয়-রাজ্যের কতখানির একচ্ছত্র-সম্রাট্ হয়ে সৌভাগ্যবান্ হতে সমর্থ হয়েছেন, এতক্ষণ তারই একটা পরিমাপ কচ্ছিলেন। আশমান, আজ সম্রাট্ বেশ বুঝতে পেরেছেন,—সৌভাগ্যবতীর অপেক্ষা সৌভাগ্যবানের সৌভাগ্য একটুও ন্যূন হয়! প্রিয় সখি আমার, তুমি যা বলেছ, তাই-ই ঠিক এবং পূর্ব্বেই আমিও তাই সিদ্ধান্ত করেছিলাম;—বাহুবল এক্ষেত্রে ব্যর্থ, হৃদয়ের যুদ্ধ হৃদয় দিয়েই জয় কত্তে হবে। আমি স্থির করেছি,—কালই ঘোষণা কর্ব্বো;—মা আস্‌ছেন,—গৌড়ের ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধির বিধবা পত্নী রাণী ত্রিপুরা দেবী আস্‌ছেন,—গৌড়ের বর্ত্তমান সম্রাটের মহিমময়ী জননী আস্‌ছেন,—তাঁকে অভ্যর্থনা কত্তে হবে,—যথাযোগ্য অনুষ্ঠানে তাঁর সম্মাননা কত্তে হবে। গৌড়ের প্রতি রাজপথে তোরণ উত্থিত হবে, প্রতি তোরণে নহবৎ বস্‌বে; ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত, পুষ্পে পল্লবে, দীপমালায় ও হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় পতাকায় সজ্জিত হবে; মাতার আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্ব হতে দুর্গ থেকে ঘন ঘন দামামাধ্বনি ও মসজিদ ও মন্দির থেকে ভগবানের স্তুতি-গীতি গৌড়ের আকাশকে মুখরিত করে তুল্‌বে; হিন্দু মুসলমান নর-নারী নব নব বসন-ভূষণে সেজে মায়ের আগমন-প্রতীক্ষা কর্ব্বে; ধুনা, গুগ্‌গুল, কর্পূর, চন্দন, লোবান, গোলাপ, মৃগনাভি প্রভৃতির মিশ্র গন্ধে গৌড়ের বাতাস সুরভিত হবে; গৌড়ের সম্ভ্রান্ত নাগরিক, একনিষ্ঠ

ব্রাহ্মণ ও মৌলানা-মৌলবীগণ অগ্রগামী হয়ে নগরের প্রান্তদেশ থেকে মাকে সাদরে আহ্বান করে আন্‌বেন; মায়ের আগমন-পথে লাজাঞ্জলি ও পুষ্পরাশি বর্ষিত হবে; গৌড়ের সমগ্র হিন্দু-সৈন্যের একভাগ নগরের শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত হবে, অন্য ভাগ অভ্যর্থিত ও অভ্যর্থক মণ্ডলীকে বেষ্টন করে মাতৃজয় গাথা কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন কর্ব্বে ও মাতৃপক্ষীয় সৈন্যবর্গের যথোচিত তত্ত্বাবধান কর্ব্বে; মুসলমান সৈন্য দুর্গ-রক্ষার ভার গ্রহণ কর্ব্বে,—পাছে, বহিঃশত্রু এসে আনন্দোৎসবে বিঘ্নোৎ-পাদন করে। উৎসব সপ্তাহব্যাপী হবে; গৃহে গৃহে, কক্ষে কক্ষে আনন্দ-কোলাহল, নির্ম্মল আমোদ-প্রমোদ, নৃত্য-গীত চল্‌বে; সাতদিন ধরে দেশ-দেশান্তরের কাঙাল, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, ফকির যার যা প্রয়োজন, তাই তাকে বিতরিত হবে; কেউ অভুক্ত থাকবে না, কেউ প্রত্যাখ্যাত হবে না; কোনো অতিথি-আগন্তুক বিমুখ হয়ে ফিরে যাবে না। মায়ের ঈপ্সিত আবাস-গৃহ গঙ্গোদকে পবিত্রীকৃত হবে; নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-কুমারী তাঁর সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হবে। তাঁর অনুগামী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রত্যেকের জন্য হিন্দু-শাস্ত্রোচিত সুচারু বন্দোবস্ত হবে। আর গৌড়-প্রাসাদের সর্ব্বত্র মায়ের অবারিত দ্বার হবে।

এই অবধি বলিয়া সম্রাট্ ক্ষণকাল মৌন রহিলেন। আশমান অপলক নেত্রে তাঁহার মহত্ত্ব-মণ্ডিত মুখের পানে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া ছিল,—সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল! সম্রাট্ পুনরায় বলিতে লাগিলেন;—আশমান! সংবাদ পেয়েছি,—মুসলমানকে এখনো তিনি অবিশ্বাস করেন না, তিনি মুসলমানের হস্তে পুরী-রক্ষার ভার দিয়ে, শুধু হিন্দু-সৈন্য নিয়ে গৌড় আক্রমণ কর্ত্তে আসছেন। আমিও আমার ঔদার্য্যময়ী জননীর পদাঙ্ক অনুসরণ কর্ব্বো,—আমার হিন্দু-সৈন্যই তাঁর সম্বর্দ্ধনা কর্ব্বে। তিনি তাঁর

সৈন্যদলে প্রচার করেছেন,—বাধা না পেলে বিপক্ষের অঙ্গে অযথা অস্ত্রাঘাত কর্ব্বে না; আমিও সৈন্যদলে প্রচার কর্ব্বো,—সম্মুখীন হলেই মাতৃ-সৈন্যকে ভাই বলে সম্বোধন কর্ব্বে ও তাদের গন্তব্যপথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াবে। সশস্ত্র সৈনিককে নিরস্ত্র সৈনিক দুবাহু বিস্তার করে আলিঙ্গন কর্ব্বে ও সসম্ভ্রমে তার পশ্চাদ্বর্ত্তী হবে। নগরবাসীর প্রতি অত্যাচার তাঁর আজ্ঞায় নিষিদ্ধ; আমিও ব্যবস্থা কর্ব্বো,—তাঁর পুরী-প্রবেশকালে কোনো নগরবাসীর গৃহদ্বার রুদ্ধ থাকবে না, প্রতি নগরবাসী উৎসুকচিত্তে পুলকনেত্রে মায়ের আমার এই অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ কর্ব্বে। আশমান! কি সুন্দর দৃশ্য হবে!

আশমানতারা অতি কৌতূহলপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল;—সে মহনীয় দৃশ্য আমরা কোথা হতে দেখ্‌বো প্রভু!

সম্রাট্ আশমানকে আরও বুকের দিকে টানিয়া লইয়া বলিলেন;—আশমান, সখি আমার, আমরা দুর্গের শীর্ষদেশ থেকে, শুধু সেই অস্পষ্ট জনস্রোত, অস্পষ্ট নগর-সজ্জা দেখ্‌বো, আর দূর হতে অস্পষ্ট আনন্দ-কোলাহল শুন্‌তে পাবো, এর বেশী আর কি প্রত্যাশা কত্তে পারি?

আশমান সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল;—দুর্গ হতে!

হাঁ, আমাদের যে মায়ের ভয়ে দুর্গে আশ্রয় নিতে হবে আশমান! বলেছিই ত, আমরাই তাঁর শিকার!

আশমানতারা আকুল হইয়া উঠিল, উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল;—দুর্গ—দুর্গ হতে কেন?

সম্রাট্ উত্তর করিলেন;—দুর্গব্যতীত আমাদের আর আশ্রয়স্থল কোথা?

আশমান বিপন্নভাবে বলিয়া উঠিল;—দুর্গে যে কাসেম খাঁ!

সম্রাট্ বিস্মিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ;—আশমান, অত ব্যাকুল হচ্ছ কেন বলো দেখি? কাসেম খাঁই ত দুর্গের অধিনায়ক, দুর্গ-রক্ষক!

আশমানতারা কাঁদিয়া ফেলিল ; কাঁদিতে কাঁদিতে সম্রাটের পাতুখানি ধরিয়া বলিতে লাগিল :—সম্রাট্, প্রভু, দুর্গে কাসেম খাঁর অধীনে গিয়ে কাজ নেই, অন্য ব্যবস্থা করো।

সম্রাট্ আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন ;—সে কি! কেন? আশমান, একটু শান্ত হও, শুনি ব্যাপার কি? বলো, শীঘ্র বলো, কাসেম খাঁকে অত শঙ্কা কেন? কাসেম বীর, হৃদয়বান্—

আশমান বলিল ,—কাসেম সব, কিন্তু কাসেম আমাদের শত্রু,—কাসেম প্রত্যাখ্যাত—

সম্রাটের কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইল, বলিলেন ;—প্রত্যাখ্যাত। সে কি! কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না, একটু খুলে বলো আশমান! এই বলিয়া তিনি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার সেই অশ্রু-প্লাবিত আরক্ত গণ্ডে একটী চুম্বন করিলেন।

আশমান যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল। সে ধীরে ধীরে তাহার পিতা আজিম সাহের পতন, তৎকালে কাসেম খাঁর উদারতা, তাহার মুক্তামালা উপহার প্রদানের প্রস্তাব, কাসেম কর্তৃক তাহার প্রত্যাখ্যান, পীড়িতাবস্থায় কাসেম খাঁর তৎপ্রতি সতৃষ্ণ-ভাব, যুদ্ধান্তে গৌড়-সীমান্ত হইতে প্রত্যাগমনের পর তাহার সহিত কাসেম খাঁর সাক্ষাৎ, মুক্তামালা প্রার্থনা ও বিবাহ-প্রস্তাব, তাহার অস্বীকারে কাসেম খাঁর তেজোব্যঞ্জক উক্তি ও কাসেমের বিদায়-কালীন বাক্যাবলী সমুদয় বিষয় বিবৃত করিল। শেষে বলিল ;—আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্চ্ছি, এ সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়্‌বে না। আমি সেদিন তার চোকে যে বিভীষিকা দেখেছিলাম, তা জীবনে ভুল্‌তে পার্ব্বো না।

নিরুপায় হয়ে সে তোমাকে গৌড়-মসনদ ছেড়ে দিয়েছে; কিন্তু তবু সে নির্ব্বোধের মত সরলভাবে কাজ করেনি। সে সেনাপতি,—সৈন্য—তারই শিক্ষিত সৈন্য তার হাতে। একটু সুবিধা পেলেই সে বিদ্রোহী হবে। তোমাকে কবলগত কত্তে পাল্লে'ই সে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ কর্ব্বে।

সম্রাট্ চঞ্চল হইলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন;—আশমান, এতদিন এ কথা কেন বলোনি? সব মীমাংসা হয়ে যেত। সময় বড় অল্প, তাইত, আশমান—আশমান, আমার এখনি দুর্গে যেতে হবে।

আশমান নিতান্ত অধীরভাবে বলিল;—কি বল্‌ছ তুমি? এখনি এই রাত্রে!

সম্রাট্ ব্যস্ততাসূচক কণ্ঠে বলিলেন,—হাঁ আশমান, আমার এখনি যেতে হবে। শুনেছি, নসেরিত-বেগম আজ দুদিন প্রাসাদ ত্যাগ করেছেন, তিনি দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে! রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, এই ষড়যন্ত্রের সময়। কাসেম রাজনীতিজ্ঞ বীর মুসলমান, এখনো তার হিন্দু-বিদ্বেষ যায় নি। সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী!—হাঁ, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীই ত! এখনি প্রতিবিধান কত্তে হবে, বিলম্বে আগুন জ্বলে উঠবে, সব ছাই হয়ে যাবে। না—না আশমান,—ভাল কথা নয়। মায়ের গৌড়ে আস্‌বার আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি,—এর বেশী নয়। আশমান, এখন তুমি এখানে থাকো, আমি যাই, তার পর সময় মত আমি তোমাকে নিয়ে যাবো, এখন নয়।

আশমান নিরুপায়ভাবে চাহিয়া রহিল, কিছুই বলিতে পারিল না। সম্রাট্ গাত্রোত্থান করিয়া পাদচারণ করিতে করিতে কি চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন;—যদি আমার ফির্‌তে বিলম্ব হয়, স্বয়ং দুর্গে প্রবেশ কোরো, আমি তার ব্যবস্থা কর্ব্বো। খুব সম্ভব, কাসেম খাঁর কক্ষে আমার

সাক্ষাৎ পাবে। অনিবার্য্য—আশু কর্ত্তব্য সম্মুখে,— তবে আসি আশমান,— সাহাজাদি,— সম্রাজ্ঞি,—

অত্যধিক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শেষ-আহ্বানে আশমানের যেন চমক ভাঙ্গিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কি অনির্ব্বচনীয় প্রতিভায় তাহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে শুধু বলিল ,—হাঁ—এসো।

৩

আজ গৌড়ীয় হিন্দু-সৈন্যগণের মধ্যে সারারাত্রব্যাপী আনন্দোৎসব পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত সৈন্যগণের সাহচর্য্যে কাসেমখাঁ দিল্লী-বাহিনীকে গৌড়-সীমান্ত হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সৈন্যের একাগ্র চেষ্টা ও অদম্য বীর্য্যবত্তাই তাঁহাকে সার্থকতায় ভূষিত করিয়াছিল। সেই সূত্রে তাহাদের প্রতি তাঁহার প্রীতিজ্ঞাপনকল্পে তিনি একদিন মুসলমান সৈন্যগণকে একটী আনন্দ-ভোজ দিয়াছিলেন; সেদিন মুসলমান সৈন্যগণও ঠিক এইরূপ আনন্দোৎসবে মাতিয়াছিল। কিন্তু হিন্দু-সৈন্যগণের জন্য এতদিন তিনি কোনও ব্যবস্থাই করেন নাই,—করিবার মত মনোভাবও তিনি কোনও দিন প্রকাশ করেন নাই। আজ প্রাতে সহসা তাঁহার চিত্তে সেই অসমাপ্ত কর্ত্তব্য-পালনের জল্পনা জাগিয়া উঠিল। তিনি হিন্দু-সেনানিবাসে ঘোষণা দিলেন,—আজ সমস্ত রাত্রি হিন্দু-সৈন্যগণ তাহাদের ইচ্ছামত গীতবাদ্য পানভোজনাদি করিতে পারিবে। কোনও রূপ বাধা নাই,—কোনও রূপ সঙ্কোচ করিতে হইবে না,—যাহার যাহা প্রয়োজন জানাইলেই, আমোদ-প্রমোদের উপকরণ অবিলম্বে সরবরাহ হইবে। শান্ত নির্ম্মল আমোদ-প্রমোদ, ব্যভিচার-বর্জ্জিত নির্ম্মল আমোদ-প্রমোদ। মুসলমান সৈন্যেরা এ আমোদ-প্রমোদের কনোও সংশ্রবে থাকিবে না।

কাসেম খাঁর এই আকস্মিক উদারতা হিন্দু-সৈন্যগণকে প্রথমে একটু

বিস্মিত করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি হিন্দু ও মুসলমান সেনানিবাসের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রসদ-পত্রাদি অন্যান্য অনেক বিষয়েও বিশেষ তারতম্য সাধিত হইয়াছিল। এমন কি, হিন্দুসৈন্যগণের অস্ত্রশস্ত্রাদি যথা-সম্ভব তাহাদের নিকট হইতে কৌশলে কাড়িয়া লওয়াও হইয়াছিল। কিন্তু তাহা দুই একজন বিচক্ষণ সেনানী ব্যতীত অন্যের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। তাহারা বুঝিয়াছিল,—বর্ত্তমানে দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে, অস্ত্র-ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নাই। তারতম্য বুঝিবার অবসর তাহাদের ছিল না। যেহেতু, মুসলমান সেনা-নিবাসে তাহারা যাইতে পারিত না, উভয় সৈন্যে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনাও খুব কম ছিল। যাহা হউক, আজ এই অপ্রত্যাশিত উদারতায় বিস্ময়াপন্ন হইয়াও, হিন্দুসৈন্যগণ এই উৎসাহে যোগ-দান করিয়াছিল। একঘেয়ে জীবন-যাপনের মধ্যে আজ এই আমোদোৎসব তাহাদের পক্ষে ততটা বেখাপ্ বোধ হয় নাই।

স্বীয় কক্ষে কাসেম খাঁ একাকী ছিলেন। দিবারাত্র অবিশ্রান্ত চিন্তা ও পরিশ্রমে তাঁহাকে ঈষৎ কৃশ বোধ হইতেছিল। কিন্তু এত ক্লান্তিতেও আজ তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই! গভীর তমিস্রাময়ী রজনী। তিনি কখন্ বা কক্ষতলে পাদচারণ করিতেছিলেন, কখন্ বা মুক্ত গবাক্ষের পানে চাহিয়া কি জটিল বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন। চিত্ত বড়ই অধীর,—অতি অন্যমনস্ক।

এমন সময় ধীর পদ-বিক্ষেপে নসেরিত-বেগম তথায় উপস্থিত হইলেন। উভয়ে যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলে, বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসির সহিত নসেরিত-বেগম বলিলেন ;—তা হলে এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছ কাসেম খাঁ, মুসলমানের ভালর জন্য তোমাদের মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী গৌড়-সম্রাট্ কতটা চিন্তিত ?

কাসেম খাঁ একটু অপ্রতিভভাবে বলিলেন ;—আর কেন লজ্জা দিচ্ছ মা ? কাসেম খাঁ আর ত সে মুসলমান-নামধারী যদুনারায়ণকে বিশ্বাস করে না। সে তার ভ্রান্তি বুঝ্‌তে পেরেছে এবং সে ভুলটাকে সুধ্‌রে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা কচ্ছে।

বেগম-সাহেবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—কি রকম চেষ্টা, শুন্‌তে পাই কি ?

নিশ্চয়ই. তোমার কাছে গোপনীয় কিছুই থাকৃতে পারে না। অন্ধ হয়ে ছুটেছিলাম, তোমা হতেই দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছি। মুসলমানজাতি অতলে নেমে যেতে বসেছিল, তুমিই তাকে নিমজ্জন থেকে রক্ষা করেছ। তোমার নিকট অবক্তব্য কি থাকৃবে ?

বলো শুনি, প্রতীকারের কি উপায় স্থির করেছ ? শুধু উপায়-নির্দ্ধারণ নয়, আমি শুনতে চাই,—প্রতীকার কত্তে কতকটা অগ্রসর হয়েছ। শুধু ভেবে বসে থাকৃলে চল্‌বে না ত! হিন্দু সৈন্য অর্দ্ধপথ এগিয়ে এসেছে. তাদের বাধা দিতে হবে। তার কি ব্যবস্থা করেছ কাসেম !

কাসেম খাঁ বলিলেন ;—মুনীম খাঁর অধিনেতৃত্বে একদল সৈন্য আজ নিশীথেই হিন্দুর গতি প্রতিরোধ কত্তে পাঠাচ্ছি। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই তারা যাতে রাজধানীর বহুদূর গিয়ে পৌছুতে পারে, অতি কৌশ-লের সহিত তার ব্যবস্থা হয়েছে।

নসেরিত-বেগম উৎকর্ণ হইলেন। নৈশ সমীরণ হিন্দুসৈন্যগণের আনন্দ-কোলাহল বহন করিয়া আনিতেছিল। নসেরিত-বেগম হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—ঐ বুঝি সে কৌশলের একটী ?

কাসেম খাঁও একটু হাসিয়া বলিলেন ;—হাঁ, এতদিন স্মরণ ছিলো না, আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেলো। ভাব্‌লাম ফন্দি মন্দ নয়,—হুজুগ দিয়ে সুযোগ

করা গেলো। ওরা আনন্দোৎসবে মত্ত হয়ে এ অভিযানের বিন্দু-বিসর্গও জান্‌তে পার্ব্বে না, সম্রাটের কাণেও এ সংবাদ পৌছবে না,—যদি পৌছয়,—বিলম্বে,—তার মধ্যে আমাদের সৈন্য অনেক দূর গিয়ে পড়্‌বে।

নসেরিত বেগম উৎসাহ-সূচক কণ্ঠে বলিলেন ;—বেশ—বেশ বাবা, ঠিক করেছ,—এই-ই্‌ ত চাই। ছলে-বলে-কৌশলে কাজ ফতে করাই পুরুষত্ব। শুধু্‌ বীরত্বে বা বাহুবলে প্রতিষ্ঠাকে বজায় রাখা সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। তারপর,—সে ত হল,—এখন আসল বিষয়ের কি কচ্ছ শুনি ?

কাসেম খাঁ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন ;—কাল দরবারে সম্রাটের মতামতটা জেনে নিয়ে শেষ ব্যবস্থা যা হয় একটা কর্ব্বো ভাব্‌ছি,—সহসাই—

এবার নসেরিত-বেগম বিরক্ত হইলেন। উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন ;—ঐ দরবারই তোমাদের উৎসন্ন দিলে ! দরবার—দরবার—দরবার ! কথায় কথায় দরবার,—সব তাইতে দরবার ! কাসেম, দরবারে তুমি কি স্থির কর্ত্তে যাচ্ছ ? কোথা তুমি মুসলমানের মঙ্গল আহরণ কর্ত্তে যাচ্ছ শুনি ? ভণ্ডের নিকট থেকে তুমি কি উপদেশ প্রত্যাশা কচ্ছ ! যে দোষী, সেই যদি বিচারক হয়, সে সে দোষের জন্য কি সুবিচার কর্ত্তে পারে ? তা যদি হত, তা হলে দুনিয়া কবে বেহেস্ত হয়ে যেত। কাসেম ! ও সব মতলব ছেড়ে দেও, ওতে কোনো ফল হবে না। আমাদের এত চেষ্টা সমস্ত পণ্ড হবে, হয়ত শেষে নিজেই বিপন্ন হয়ে পড়্‌বে। তোমাকে ত বার-বার বুঝিয়ে দিচ্ছি,—সে যাদুকর, কথার মোহে তোমাকে বোকা বানিয়ে দেবে। যদিও কোনো ক্রমে সে মোহ-পাশ থেকে মুক্ত হয়েছ,

আর তার সীমানায় যেয়ো না,—সাম্‌লাতে পার্ব্বে না,—বল্‌ছি,—ঠিক বিপদে পড়্‌বে।

কাসেম খাঁ মাথা নাড়িলেন,—বলিলেন ;—না মা, এবার আর কাসেম খাঁ তার স্তোক-বাক্যে ভুল্‌বে না। ভুল্‌বে ত না-ই,—অধিকন্তু, সে সম্রাট্‌কে বেশ ভাল করে বুঝে নেবে। শুধু নিজে বুঝ্‌বে তা নয়,—মুসলমানের মধ্যে অনেকেই সম্রাটের গোঁড়া হয়ে পড়েছেন,—যেমন উজির সাহেব প্রভৃতি,—তাঁদেরও সে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেবে,—কি সুদর্শন অজগর এসে মুসলমান-প্রতিষ্ঠাকে জড়িয়ে ধরেছে।

নসেরিত-বেগম সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন ;—না কাসেম! সে যুক্তি ভাল নয়। অত্যন্ত সরল তুমি,—আত্মগোপন কর্ত্তে পার্ব্বে না, তোমার বিদ্রোহিতা প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে। তাতে সে আরো সাবধান হবে। না হয়, তখন সে এমন ছোবল্‌ ছোব্‌লাবে যে, তাতে মুসলমান শক্তি একেবারে জর্জ্জরিত হয়ে পড়্‌বে। বুঝতে পার্চ্ছ না,—অজগর তোমাদের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করে মাথার উপর ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে! এখন তার অতর্কিতে প্রথমেই তার মাথাটাকে চূর্ণ কর্ত্তে হবে। নচেৎ, এ জাতির মৃত্যু অনিবার্য্য।

কাসেম খাঁ চিন্তিত ভাবে বলিলেন ;—তা হলে—আপনি বল্‌ছেন,—

নসেরিত-বেগম বাধা দিয়া বলিলেন ;—বল্‌ছি কি ?—তাই-ই কর্ত্তে হবে,—যখন তার আবেষ্টনে অনেকগুলি আমীর-ওমরাহ আজ বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। সাধারণের কথা ছেড়ে দেও। তারা চিরকালই একটা নূতন কিছু চায়। তারা ত তলিয়ে কিছু দেখ্‌বে না,—ক্ষমতাও হারিয়েছে। এখন সহসা প্রকাশ্যভাবে কোনো কাজই যুক্তিসঙ্গত নয়। আগে শেষ করো, তারপর

বুঝিয়ে দিলে চল্‌বে,—তারা যা ভেবে তার আলিঙ্গনের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ কত্তে গিয়েছিল, সে তা নয়,—সে শয়তান!

কাসেম খাঁ তবু যেন রাজি হইতেছিলেন না। তিনি বলিলেন;—মা,—আমার যেন বোধ হয়, তখন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া কষ্টকর হবে।

বেগম সাহেবা প্রতিবাদ করিলেন;—কেন কষ্টকর হবে? এটা ঠিক জেনো,—সকলেই সম্পূর্ণভাবে তার গোঁড়া হয়ে উঠ্‌তে পারে না। কেউ বা মোহে,—কেউ বা ভয়ে,—কেউ বা স্বার্থের জন্য তার আনুগত্য স্বীকার করেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কখনো আন্তরিকতা আস্‌তে পারে না। আজ দুদিন যারা পায়ের তলায় লুটিয়ে তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা কচ্ছে,—কাল আবার তার পতনের পরই দেখ্‌বে,—তারাই তোমার পায়ে এসে উপুড় হয়ে পড়েছে। এই ভাবের লোকই জগতে বেশী।

কাসেম খাঁ যেন ক্রমশই অধিকতর চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। নসেরিত-বেগমের উত্তেজনাপূর্ণ বাণী যেন তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। বেগম তাঁহার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া শ্লেষপূর্ণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন;—

কাসেম! ভয় কচ্ছে তোমার বুঝি? ওঃ! তা হলে দেখ্‌ছি,—আজকাল তুমি নিজের জাতির চেয়ে নিজের জীবনটাকে বেশী দামী ভাব্‌তে আরম্ভ করেছ, তুমি আর সে কাসেম খাঁ নেই! ছিঃ—কাসেম ছিঃ! তুমি যে এতটা কাপুরুষ হয়েছ, আগে তা ধারণাই কত্তে পারিনি! কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন তোমার কাসেম! একদিন এই কাসেম জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য আজিম সাহের বিরুদ্ধে কি বিপুল বিক্রমে যুদ্ধযাত্রা করেছিল!—সেদিন কাসেম ভাব্‌তে শেখে নি,—ইতস্ততঃ কত্তে শেখে নি,—জাতির প্রতিষ্ঠা তখন তার মূলমন্ত্র ছিল। আর আজ?

সেই মুসলমান-শের আজ তার জাতীয়ত্বকে ঠেলে রেখে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বরণ করে নিতে চাইছে! আশ্চর্য্য! ধিক্ সে আত্মপ্রতিষ্ঠায়! আর সে প্রতিষ্ঠাকেও বলিহারি! নিজের কাঙ্ক্ষিত নারী যাকে অপমান করে ফিরিয়ে দেয়, সে কি না সেই নারীর যে প্রণয়াস্পদ, তারই পায়ে মস্তক-বিক্রয় করে গরিমায় ফুলে উঠ্‌তে চায়! বহুৎ-আচ্ছা কাসেম! বেশ! স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি তোমার কাণ্ডজ্ঞান দেখে! একটুও কি ঘৃণাবোধ হয় না,—মনে একটুও কি ধিক্কার আসে না,—তুমি কার পয়জার মাথায় নিয়ে গৌরব বোধ কচ্ছ! যে তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী, তোমার ধর্ম্ম-সমাজ-জাতির মূলোচ্ছেদকারী,—তুমি সেই দুষ্‌মনকে পরম বন্ধু-জ্ঞানে কুর্ণিশ জানাচ্ছ! এই তোমার পুরুষত্ব! না—না,—তবে থাক্,—এ কাজ তোমার দ্বারা হবে না,—তুমি পার্ব্বে না। তবে আর কেন? হিন্দুর বিরুদ্ধে আর সৈন্য পাঠানোই বা কেন? কতলু খাঁ, মুনীম খাঁকে নিরস্ত করো। যাক্,—মুসলমান জাতি গৌড় হতে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাক্—আর হিন্দুর পদলেহনকারী তোমরা ইস্‌লাম-কীর্ত্তির ধ্বংস-স্তূপের উপর বসে ফেরুপালের ন্যায় চীৎকার করো!

কাসেম খাঁ অস্থির হইলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অধিকতর বিস্ফারিত হইল। তিনি নসেরিত-বেগমের পানে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন,—পারিলেন না। নসেরিত-বেগম সেজন্য প্রতীক্ষা না করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ;—

কাসেম! ক্ষুব্ধ হয়েছ,—তা হও,—আমার কোনো ক্ষতি নেই,—কিছুই এসে যাবে না আমার। আমি ত গিয়েই রয়েছি! কিন্তু একদিন বুঝ্‌বে কাসেম!—আজ যা বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না। অনায়াস-লব্ধ জিনিষ অমূল্য হলেও তার কদর থাকে না। একপ্রকার অমনিই ত তোমরা

গৌড় পেয়েছিলে। সেটা আগে হাত-ছাড়া হয়ে যাক্,—আবার হিন্দু নিজমূর্ত্তি ধারণ করে তোমাদের মাথায় চেপে বসুক্,—মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহীর সাহচর্য্যে বিজিত রাজ্য কূট-কৌশলের সহায়তায় তোমাদের গণ্ডে চপেটাঘাত করে কেড়ে নিক্,—তখন বুঝ্‌বে কাসেম!—তখন এই সামান্য নারীর কথা মনে পড়্‌বে। কিন্তু তখন আর কি কর্ব্বে? অনশন-খিন্ন উত্তক্ত সিংহ যেমন রুদ্ধদ্বার পিঞ্জরে বসে নিষ্ফল গর্জ্জন করে,—তখন তোমরা তাও পার্ব্বে কি না সন্দেহ হয়। যাক্,—আমি আর তোমাকে অনর্থক বিরক্ত কর্ব্বো না। যা ভাল বোঝ,—করো, আমি আস্তে আস্তে সরে পড়ি। আমার ত সব শেষ,—মাঝে পড়ে তোমাদের বিঘ্নস্বরূপ হয়ে থাকি কেন? দর্প ত বহুদিন চূর্ণ হয়েছে,—ভিখারিণীর ন্যায় জীবন-যাপনই আমার কর্ত্তব্য ছিলো। এতদিন তা বুঝ্‌তে পারিনি,—ভুল করেছিলাম। যাক্,—তা হলে আসি কাসেম,—তুমি সুখী হও।

এই বলিয়া নসেরিত-বেগম প্রস্থানোদ্যত হইলেন। ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে তাঁহার কণ্ঠস্বর বাষ্প-জড়িত হইয়াছিল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রুমালে চক্ষু মুছিতে মুছিতে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কাসেম খাঁ নিতান্ত নিরুপায় ভাবে তাঁহার পদস্পর্শ করিলেন, বলিলেন;—সন্তানের উপর রাগ করে কোথা যাচ্ছিস্ মা!

নসেরিত-বেগম দাঁড়াইলেন,—উত্তর দিলেন;—কাসেম! আর কেন ও সম্বোধন! আমি চলে যাচ্ছি,—আমাকে আর উপহাস কোরো না।

কাসেম আবার বলিলেন;—মা! কাসেম এখনো তোমার অবাধ্য হয়নি।

নসেরিত-বেগম সেই ভাবে উত্তর দিলেন;—কেন অবাধ্য হবে না কাসেম! আমার আর কি আছে,—যার জন্য তুমি আমার বাধ্য হবে?

যখন ছিলো, তখন ছিলে ;—এখন নেই, বাধ্য থাক্‌তে যাবে কেন ? মৌখিক বাধ্যতা অবাধ্যতার নামান্তর নয় কি ?

কাসেম খাঁ আরও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন,—বলিলেন ;—যথেষ্ট বলেছিস্‌ মা ! আমার খুব শিক্ষা হয়েছে,—আর বল্‌তে হবে না। কাসেম প্রস্তুত। বলো মা,—তোমার তৃপ্তির জন্য,—জাতির মঙ্গলের জন্য,—তার কি কত্তে হবে ?

নসেরিত-বেগম কাসেম খাঁকে চিনিতেন। তিনি তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন,—কাসেম এইবার প্রকৃতিস্থ। তিনি পূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া একটু পরে বলিলেন ;—কাসেম !—পার্‌বে ?

কাসেম খাঁ বলিলেন ;—কাসেম দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না। তোমারই প্রেরণায় সে হিন্দুর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ কচ্ছে ; সে জাতির কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে রাজি আছে। তারও আর কি আছে মা,—আছে মাত্র জাতি। আত্ম-প্রতিষ্ঠা সে চায় না,—তা যদি চাইত তা হলে সে সম্রাটত্ব স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌তো না। মা, কাসেমকে তোর অভিমান করে ভুল বুঝ্‌লি কেন ? বল্‌ তার কি আজ্ঞা পালন কত্তে হবে ?

নসেরিত-বেগম ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে অধিকতর গম্ভীর হইয়া ডাকিলেন ;—কাসেম !

কাসেম উত্তর দিলেন ;—মা !

তবে এই রাত্রিতেই—

কি চাই ?

যদুনারায়ণের ছিন্ন মুণ্ড ! কাসেম, মায়ের তৃপ্তি সাধন করো,—স্বামী

হন্তার সদ্যশ্ছিন্ন মস্তক এনে আমাকে উপঢৌকন দাও। কিছুই ভাব্তে হবে না, আমিই গুপ্তদ্বার দেখিয়ে দেবো। সহজেই প্রাসাদ-শিখরে পৌছুতে পার্ব্বে। স্বহস্তে মস্তকচ্ছেদ কর্ব্বে, —আমি আর কারো হাতে এ ভার দিয়ে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না। তুমিই একমাত্র যোগ্যপাত্র। গিয়ে দেখ্বে,—এতক্ষণ তাদের সঙ্গীত থেমে গেছে,— নিশ্চিন্ত মনে বড় আরামে তারা দুজনে গলাগলি হয়ে ঘুমুচ্ছে,—বড় সুখের ঘুম ঘুমুচ্ছে! এই-ই প্রতিহিংসা-সাধনের উপযুক্ত সময়। এসো,—আমার সঙ্গে এসো,—

এই বলিয়া নসেরিত-বেগম কাসেম খাঁর হস্ত ধারণ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

৪

সহসা সোপানতলে দ্রুত পদশব্দ শ্রুত হইল। দ্বারপথে বেগম ও কাসেম খাঁ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। একজন গুপ্তচর হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া তাঁহাদের উভয়কে কুর্ণিশ করিয়া বলিল ;—

ভয়ানক ব্যাপার খোদাবন্দ্,—বাদসা কেল্লায় এসেছেন !

উভয়েই চমকিয়া ফিরিয়া আসিলেন,—উভয়েই একযোগে বলিয়া উঠিলেন ;—তারপর—তারপর ?

দূত বলিল ;—আমাদের সৈন্য কেল্লা থেকে বেরোবার উদ্যোগ কচ্ছিল। সেনাপতি মুনীম খাঁ ও কতলু খাঁ পূর্ব্ব হতে প্রস্তুত হয়ে এসে রওনার ব্যবস্থা কচ্ছিলেন,—কোত্থেকে বাদসা এসে তথায় উপস্থিত হলেন। ভয়ে সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার আস্তানায় সরে পড়্লো। মুনীম খাঁ সন্তোষজনক কৈফয়ৎ দিতে পার্লেন না,—আর কতলু খাঁ বোবার মত নীরবে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়্লেন।

নসেরিত-পত্নী ও কাসেম খাঁ অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন। উভয়ে পুনরায় একযোগে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—তারপর, বাদসা কি কর্চ্ছেন ?

দূত বলিতে লাগিল ;—বাদসা তাঁদের কাণ্ড দেখে একটু হাস্লেন। হাস্তে হাস্তে বল্লেন ;—আমি বুঝ্তে পেরেছি মুনীম খাঁ,—তবে এত তাড়াতাড়ি যুদ্ধের উদ্যোগ করার দরকার ছিল না ; অন্ততঃ, আপনারা যে এত ব্যগ্র হয়েছেন, সেটা অগ্রে আমাকে জানানো আপনাদের উচিত

ছিল। যাক্,—যা হবার হয়ে গেছে। সৈন্যদের অভয় দিন্,—আর আপনারা উভয়ে বেশ পরিবর্ত্তন করে একটু পরে একবার কাসেম খাঁর কক্ষে আসুন। সকলে মিলে যুক্তি করে আজ এই রাত্রিতেই একটা ব্যবস্থা কর্ব্বো,—আসুন। এই বলে তিনি হিন্দু সেনাবাসের দিকে চলে গেলেন। বোধ হয়, এখনি এখানে আস্‌বেন,—ঐ ঐ—শুনুন,—

ইতিপূর্ব্বে হিন্দু সৈন্যগণের গীত-বাদ্য থামিয়া গিয়াছিল,—কাসেম খাঁ বা বেগম-সাহেবা তাহা লক্ষ্য করেন নাই। দূতের কথাক্রমে শুনিলেন,—দূর হইতে হিন্দু-কণ্ঠোত্থিত সম্রাটের জয়-গাথা নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

দূত প্রস্থান করিল।

কাসেম খাঁ অত্যধিক চিন্তাযুক্ত ভাবে দন্তদ্বারা ওষ্ঠ নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নসেরিত-বেগম যেন দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া উৎফুল্ল ব্যাকুলতার সহিত বলিলেন ;—কাসেম! কি ভাব্‌ছ? এ খোদার করুণা! শিকার অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনা হতেই আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হচ্ছে,—এ সুযোগ হারালে চল্‌বে না। সজ্জিত হও—প্রস্তুত হও কাসেম! এখনি—এই দণ্ডেই শত্রু নিপাত হয়ে যাবে। ওঃ! কি তৃপ্তি কাসেম! আজ স্বামীহন্তার রক্তে আমায় স্নান করিয়ে দে কাসেম! পাঠান-গৌরব বীরপুত্র আমার—

এই বলিয়া নসেরিত-বেগম উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া কাসেম খাঁর হস্তে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন ;—আর কাসেম খাঁ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে নিতান্ত নিরুপায় ভাবে নসেরিত-বেগমের পানে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময় অতি শান্ত পদক্ষেপে এক বিরাট্ সৌম্য মূর্ত্তি কক্ষদ্বারে আবির্ভূত হইল। কাসেম খাঁ ও নসেরিত-বেগম সেই বিরাট্ মূর্ত্তির পানে

দৃষ্টিপাত করিয়া বিমূঢ় ভাবে কয়েক পদ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। কাসেম খাঁর মস্তক যেন কুর্ণিশ করিবার জন্যই আপনা-আপনি নত হইয়া পড়িল,—কিন্তু স্তম্ভিতের জাড্যে হস্তদ্বয় শিথিল অবস্থায় রহিল।

হাস্যস্নিগ্ধ, মধুর, গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল;—খাঁ সাহেব! গৌড়-সম্রাট্ দুর্গে আশ্রয়প্রার্থী,—আপনার অতিথি। এই যে বেগম সাহেবা,—আপনি এখানে! আগে বুঝ্‌তে পারি নি,—গোস্তাকী মাপ কর্ব্বেন।

এই বলিয়া সম্রাট্ নসেরিত-বেগমের উদ্দেশে মস্তক নম্র করিলেন।

সম্রাটের আহ্বানে নসেরিত-বেগমের বিমূঢ়তা দূর হইয়া গেল। কিন্তু সম্রাটের সসম্মান সৌজন্য তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় হইল না। তাঁহার নেত্র-তারকায় শার্দ্দুলীর জিঘাংসা জ্বলিয়া উঠিল। পীন বক্ষঃ অন্তরোত্থিত উদ্দাম ঝটিকায় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন;—

কোনো কথা শুনো না,—কোনো দিকে লক্ষ্য কোরো না,—কাসেম, শয়তানকে শেষ করো বল্‌ছি—

কাসেম নিস্তব্ধ!

নসেরিত-বেগম আবার বলিলেন;—ঘুমিয়ো না কাসেম! মুগ্ধ হয়ো না কাসেম! এখনি শেষ করো—

কাসেম নির্ব্বাক্,—স্থাণুবৎ নিশ্চল!

নসেরিত-বেগম একেবারে ধৈর্য্য হারাইলেন। বলিলেন;—ওঃ! বড় জ্বালা কাসেম! অসহ্য—উঃ! আর না,—আর প্রতীক্ষা কত্তে পারি না! কাসেম! ভীরু কাসেম!—হতভাগ্য কাসেম! পাঠান-শোণিত এত শীতল! ধিক্! না না,—তা হবে না,—আজ আর আমি তোমাকে

ছেড়ে দেবো না। বহুদিন প্রতীক্ষা করেছি,—আজ আর না। যাও,—স্বামীহন্তা ঘৃণিত কুক্কুর,—পাঠান-রমণীর হস্তে জাহান্নমে যাও,—

বলিতে বলিতে চকিতের মধ্যে বক্ষে লুক্কায়িত বিষাক্ত ছুরিকা হস্তে বিক্ষুব্ধা সিংহীর ন্যায় উন্মত্তা বেগম সম্রাটের বর্ম্ম-মণ্ডিত বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই—উঃ! কাসেম। এখনো সতর্ক হও—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সম্রাটের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার দক্ষিণ মণিবন্ধ হইতে শোণিত-প্রবাহ ছুটিয়া কক্ষতল প্লাবিত করিল।

এই অস্বাভাবিক অনর্থপাতে সম্রাটও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিস্থ হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন,—বর্ম্মে প্রতিহত শাণিত ছুরিকার ফলক ভাঙ্গিয়া বেগমের প্রকোষ্ঠে বিদ্ধ হইয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি জানু পাতিয়া বসিলেন ও বেগমের আহত দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া পরীক্ষা করিলেন,—মণিবন্ধের তিনটী মূল শিরা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি অন্য কিছু ভাবিবার অবসর পাইলেন না,—অন্য কাহারও প্রতীক্ষাও করিলেন না,—অতি ক্ষিপ্রতার সহিত নিজেই কক্ষকোণস্থ জলাধারটী আনিয়া নিজ রুমাল সাহায্যে ক্ষতস্থানে ঘন ঘন সলিল-নিষেক করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রক্তস্রাব কথঞ্চিৎ স্তব্ধ হইলেও নসেরিত-বেগমের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল না। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে, প্রতিবিধিৎসায় ব্যর্থকাম নসেরিত-পত্নীর পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে মৃত্যুচ্ছায়া দ্রুতভাবেই ঘনাইয়া আসিল।

বেগমের জীবনাশায় হতাশ হইয়া, গাত্রোত্থান করিতে করিতে সম্রাট্‌ অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে ডাকিলেন ;—কাসেম খাঁ!

আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কাসেম খাঁ উত্তর দিলেন ;—সম্রাট্! আপনি বন্দী।

সম্রাট্ ইতস্ততঃ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন,—দেখিলেন,—কাসেম খাঁর কথাই ঠিক,—তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আটজন সশস্ত্র খোজা সৈন্য অবস্থান করিতেছে এবং কি এক অনির্ব্বচনীয় উত্তেজনার অস্থৈর্য্যে কাসেম খাঁ সেই সৈন্য-বেষ্টনীর বহির্ভাগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হস্তে কোষমুক্ত তরবারি,—চক্ষে স্ফুলিঙ্গ।

মুহূর্ত্তের জন্য সম্রাটের ধমনীতেও উষ্ণ প্রবাহ ছুটিল। তিনি তাঁহার কটী-বন্ধ স্পর্শ করিলেন ;—কোষ শূন্য!

কাসেম খাঁ বিদ্রূপব্যঞ্জক হাস্যের সহিত বলিলেন ;—এটা অন্ততঃ প্রণিধান করা গৌড়-সম্রাটের পক্ষে খুবই উচিত যে, যে গৃহস্বামী তার আশ্রয়-ভিক্ষার্থীকে সুচির অতিথিরূপে রক্ষা কর্ব্বার জন্য, তাকে লৌহময় প্রেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ কত্তে প্রস্তুত হয়েছে, সে তার আয়ত্বের প্রতিবন্ধক কোনো বস্তুই অতিথিটীর কাছে রেখে তার পলায়নের সুবিধা করে দিতে কিছুতেই রাজি নয়। চিন্তিত হবেন না সম্রাট্, খুব নিরাপদ স্থানেই আপনার অবস্থানের ব্যবস্থা হবে।

সম্রাট্ কাসেম খাঁর এই শ্লেষোক্তির উত্তর দিতে যাইতেছিলেন,—এমন সময় উল্কার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী আশমানতারা কক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল এবং এই বিসদৃশ বীভৎস দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

আশমানতারার আকস্মিক আবির্ভাবে কাসেম খাঁ একটু বিচলিত হইলেন, সৈন্য-বেষ্টনীও ঈষৎ চঞ্চল হইল। কিন্তু কাসেম খাঁ তৎক্ষণাৎ নিজেকে সাম্‌লাইয়া সৈন্যগণের প্রতি কি ইঙ্গিত করিলেন,—তাহারা

স্থিরভাবে যথাস্থানে দাঁড়াইল। অনন্তর কাসেম খাঁ আশমানতারাকে পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন ;—সাহজাদি—এসেছ,—বেশ—তা বেশ হয়েছে। অতি উপযুক্ত ক্ষণেই উপস্থিত হয়েছ। ব্যাপার বুঝ্‌তে পারছ না ? একটু অনুধাবন করো—বুঝ্‌বে। আজ গৌড়-সাম্রাজ্যের—তথা তোমার হৃদয়-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর,. নগণ্য—অবহেলিত কাসেম খাঁর কুটীরে আতিথ্যগ্রহণ করেছেন,—সেই আতিথ্যের সংকার আরম্ভ হয়েছে !

আশমান ক্রোধে ফুলিতে লাগিল, সে সম্বোধন করিল ;—সেনাপতি কাসেম খাঁ,—

কাসেম খাঁ সেইভাবে হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন ;—বান্দার প্রতি কি হুকুম সাহজাদি !

আশমানতারা আরও উত্তেজিত হইল। বলিল ;—দিল্লীশ্বর-বিজয়ী পাঠান-বীর কাসেম খাঁর পক্ষে এরূপ ব্যবহার কোনো ক্রমে বাঞ্ছিত নয়। নিজ কক্ষে শরণাগত সম্রাট্‌কে এ ভাবে লাঞ্ছনা তার সে বীরত্ব-গৌরবকে কতটা উজ্জ্বল করে তুলছে, এটা সে বীর-কেশরীর চিন্তা করা খুবই উচিত ছিলো।

কাসেম খাঁ হাসিয়া বলিলেন ;—সে বীরত্বের কি পুরস্কার দিয়েছিলে সাহজাদি ! প্রত্যাখ্যান ত ! মাপ করো, আমি তোমার কাছ থেকে সে গৌরব আখ্যা পেতে আর চাই না। সে বিজয়ের বিনিময়ে আমি পরাজয় ক্রয় করেছি, সুতরাং, আমি সে বীরত্বের বড়াই করি না,—তাকে ব্যর্থতা বলেই ধরে নিয়েছি। তোমার চাটুবাণীতে আজ আর ভুল্‌বে না কাসেম। শোনো সাহজাদি, সম্রাট্‌ যে ভাবে আজ কাসেম খাঁর কক্ষে শরণাগত হতে এসেছেন, কাসেম খাঁও তাঁকে ঠিক সেই ভাবেই অভ্যর্থিত করেছে। তাঁর যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনার জন্য তোমার কিছুই

ভাব্‌তে হবে না, কাসেম খাঁ তার কর্ত্তব্য-পালন কত্তে খুব ভালরূপই জানে।

আশমান বলিল ;—এ ভাবে কর্ত্তব্য-পালনের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। যদি সেই প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ গ্রহণ কর্ব্বার এতই স্পৃহা ছিলো, সেদিন সম্রাটত্ব গ্রহণ করো নি কেন? সম্রাট্‌কে সেই দিনই ত গৌড় থেকে বিতাড়িত কর্ত্তে পার্ত্তে। আমরা না হয়, গৌড় হতে চিরতরে নির্ব্বাসিত হতাম। কিন্তু তা তুমি পারো নি কাসেম খাঁ, আর পার্ব্বেও না। যাক্ সে অতীতের কথা, এখন আমি তোমার কাছ থেকে শুন্‌তে চাই, তুমি সম্রাট্‌কে মুক্তি দেবে কি না?

কাসেম খাঁ হাসিয়া বলিলেন ;—না সাহজাদি, আজকের মুক্তিটা তত সুলভ নয়।

আশমান ধৈর্য্য হারাইল, বলিল ;—কাসেম খাঁ! জান তুমি আজ এ কথা কার সম্মুখে বল্‌ছ?

কাসেম খাঁ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন ;—জানি, খুব ভাল জানি ;—বাদসা সৈফুদ্দিনের পৌত্রী, সাহজাদা আজিম সাহের কন্যা, সম্রাট্ জালালুদ্দিনের সম্রাজ্ঞী আশমানতারার সম্মুখে আজ আমি এ কথা বল্‌ছি। তাতে কি এসে যায় আশমান! কাসেম আজ মরিয়া! সে আজ তোমার ভ্রূকুটিতে ভয় কর্ব্বে না। যে জন্য তার চিন্তা বা ভয়, সে আশা তার চূর্ণ। সে আজ তার জীবনের শেষ মীমাংসা কর্ত্তে বদ্ধপরিকর হয়েছে। সম্রাট্‌কে তুমি আর ফিরে পাবে না। প্রাসাদে ফিরে যাও,—আমি তার সুব্যবস্থা কর্ত্তে প্রস্তুত। আর যদি না যাও, তবে দাঁড়িয়ে দেখো,—প্রত্যাখ্যাত কাসেম খাঁ কি ভাবে তার ব্যর্থ-প্রেমের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

এই বলিয়া কাসেম খাঁ বংশীধ্বনি করিলেন। আর একজন সৈনিক কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল। কাসেম খাঁ বলিলেন ;—শৃঙ্খল।

মুহূর্ত্ত মধ্যেই সৈনিক শৃঙ্খল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

আশমানতারা অধিকতর অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। সে চীৎকার করিয়া বলিল ;—স্থির থাকো, কাসেম খাঁ! সাধ্য কি তোমার, সম্রাটের অঙ্গস্পর্শ কর্বে? আমি নিজেই সম্রাট্‌কে মুক্ত কর্ব্বো। ক্ষমতা হয়,—প্রতিরোধ করো।

এই বলিয়া তেজস্বিনী পাগলিনী আশমান সৈন্য-বেষ্টনীর নিকটবর্ত্তী হইতেই সৈন্যগণ মন্ত্র-চালিতের ন্যায় সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল, আর আশমান ছুটিয়া গিয়া সম্রাটের হস্তধারণ করিল।

সম্রাট্ এতক্ষণ কিছুই বলেন নাই। শুধু কাসেম খাঁ ও আশমান-তারার বাদানুবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ, নসেরিত-বেগমের শোচনীয় মৃত্যু। নিরস্ত্র ও সৈন্য-বেষ্টিত হইয়াও তিনি বিপদের আশঙ্কায় মুহ্যমান্ হন নাই। অধিকন্তু, আশমানতারার আকস্মিক আগমনে সৈন্যগণ ও কাসেম খাঁর অন্যমনস্কতায় তিনি সশস্ত্র ও মুক্ত হইবার বহু অবসর পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভাবের মুক্তি বা আত্মরক্ষা তাঁহার বাঞ্ছনীয় ছিল না। তিনি স্থির চিত্তে এমন একটী সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন যাহা তাঁহাকে গরিমা-মণ্ডিত মুক্তির শৃঙ্খলে মধুর মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ করিবে। আশমানতারা সৈন্য-বেষ্টনী ভেদ করিয়া তাঁহার করস্পর্শ করিতেই তিনি ধীরে ধীরে শান্তস্বরে বলিলেন ;—

তুমি কি এই-ই প্রত্যাশা করো আশমান!—যে গৌড়-সম্রাট্ অধীনস্থ

সেনাপতির হস্তে বন্দী হয়ে নারীর অঞ্চল ধরে মুক্তি নিয়ে চলে যাবে! তা হয় না,—আশমান, তা হতে পারে না। সে মুক্তির মূল্য কি? অতটা আত্মহারা হয়ো না, সম্রাট্-নন্দিনী—সম্রাজ্ঞী তুমি। পূর্ব্ব কথা স্মরণ করো, আমাদের উদ্দেশ্য স্মরণ করো। বন্দীত্বই আমাদের কাম্য, হিন্দু-মুসলমানকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে সেই মধুময় বন্ধনে আমরা চিরবন্দীর সুখ উপভোগ কর্ব্বো, এই-ই আমাদের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সাধন কত্তে এ জীবন না হয় আমাদের বন্ধনেই কেটে যাবে, ক্ষতি কি তাতে আশমান! আমাকে এ ভাবে মুক্ত কোরো না, তাতে আমাদের কত যত্নের—কত আগ্রহের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে; আবার তা জোড়া দিতে অনেক সময় লাগ্‌বে। সরে যাও আশমান, খাঁ-সাহেবকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য কর্ব্বার অবসর দাও। সৈন্যগণ! কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? সেনাপতির আজ্ঞা লঙ্ঘন কোরো না, আমাকে ঘিরে ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়াও। এসো, খাঁ সাহেব! আমাকে শৃঙ্খলিত করো, আমি প্রস্তুত। যে শাস্তি তোমার মনোমত হয়, শীঘ্রই তার ব্যবস্থা করো। এখনি মুনীম খাঁ, কতলু খাঁ, গুণরাম রায়, জীবন রায় প্রভৃতি সবাই এসে পড়্‌বেন, তোমার কর্ত্তব্য-পালনের ব্যাঘাত ঘটে যেতে পারে। সৈন্যদল চঞ্চল হয়ে পড়্‌ছে। আর দেরী কোরো না। সরে যাও আশমান, অনর্থক দেরী হয়ে যাচ্ছে। এস কাসেম খাঁ, এই আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি,—আমাকে বন্ধন করো।

এই বলিয়া সম্রাট্ কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া অতি আগ্রহে কাসেম খাঁর দিকে বাহুযুগ বিস্তার করিয়া দিলেন।

আশমানতারা যেন কেমন হইয়া গেল! সে তাড়াতাড়ি কাসেম খাঁর পদপ্রান্তে নতজানু হইল ও তাহার সলাম-নিন্দিত দুই বাহু-বল্লী উত্থিত করিয়া যুক্ত করে অতি করুণ কণ্ঠে কহিল;—

তবে আমাকেই আগে বন্দী করো কাসেম! আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে সম্রাটের সহিত আমাকেও শৃঙ্খলিত করো কাসেম! সম্রাটের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা কর্ব্বে, আমাকেও সেই শাস্তি দাও কাসেম! অপরাধী আমি—আমিই সকল অনর্থের মূল, শাস্তি আমাকেই আগে দাও। হৃদয়বান্ তুমি,—একদিন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে এই পিতৃহীনা শোকাচ্ছন্নাকে উদারতার পক্ষপুটে, অবমাননা, লাঞ্ছনার আসন্ন ব্যাত্যা থেকে রক্ষা করেছিলে, তুমিই আমার পরাজিত রাজ্যচ্যুত পিতার মৃতদেহ গৌড়ের প্রাসাদ-অঙ্গনে এনে সমাধিস্থ কর্ব্বার ব্যবস্থা করেছিলে। আমি তোমার সে উদারতার কোনো প্রতিদান দিতে পারিনি। ঋণী আমি,—উত্তমর্ণ তুমি;—কিন্তু তুমি আমার নিকট অধমর্ণের ন্যায়—ভিখারীর ন্যায় উপযাচক হয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলে, ব্যর্থকাম হয়ে ক্ষুণ্নমনে ফিরে গিয়েছ। এত উদারতা দেখিয়েছ,—এত ত্যাগ স্বীকার করেছ,—আর একবার শেষ উদারতা দেখাও কাসেম! আমাকেও বন্দিনী করো! সাম্রাজ্য-সুখ রসাতলে যাক্, গৌড় তুমিই শাসন করো,—আমাকে শুধু সম্রাটের সঙ্গিনা থাক্‌বার অধিকার দাও কাসেম! ভাই! একদিন অগ্রজের ন্যায় শোকার্ত্তা বিপন্না ভগিনীর সম্মান রক্ষা করেছিলে, আর আজ সেই ছোট বোন্‌টীর এই শেষ ভিক্ষা,—শেষ কামনা পূর্ণ কর্ব্বে না ভাই!

আর বলিতে হইল না। সম্রাটের নির্ভীকতাপূর্ণ মহত্ত্ব কাসেম খাঁর প্রতিজ্ঞা টলাইয়া দিয়াছিল। এইবার আশমানতারার মিনতিপূর্ণ ভ্রাতৃ-সম্বোধন তাঁহার সমস্ত দৃঢ়তা একেবারে তরল করিয়া দিল। তিনি আশমানের দীননেত্রের পানে চাহিলেন, আর তাঁহার চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া, আশমানের অশ্রু-পরিষিক্ত আরক্তগণ্ডে প্লাবন আনিয়া দিল। তিনি সস্নেহে আশমানের হাত ধরিয়া উঠাইলেন ও নিজ রুমাল দিয়া তাহার

অশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন ;—আশমান, ছোট বোন্‌টী আমার, এতদিন কেন ভাই কাসেম বলে ডাকিস্ নি? তা হলে ত সব গোলমাল মিটে যেত! কাসেম রাজ্য চায় না—ঐশ্বর্য্য চায় না,—প্রতিষ্ঠা চায় না,—আর সে কিছুই চায় না। আজ তুই তাকে যে অমূল্য আহ্বান উপহার দিয়েছিস, জগতের সম্পদ তার তুলনায় কিছুই নয়। তোকে আমি ভালবাসি আশমান,—বড় ভালবাসি তোকে। কিন্তু এতদিন তোকে আমি যে ভাবে ভালবাস্‌তে চেয়েছিলাম, সে ভালবাসায় বড় অশান্তি। সে ভালবাসায় হিংসা আনে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আনে, পিপাসা বাড়িয়ে তোলে, সংশয়ে বুক দুলিয়ে দেয়, মানুষকে নিষ্ঠুর করে ফেলে। আজ আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, সে ভাবে ভালবেসে, আমি তোকে কখনো পাই নি, কখনো পাবোও না। খোদা মেহেরবানি করেছেন,—আমার ভুল ভাঙ্‌বার জন্য তোর মুখ দিয়ে আজ মধুময় ভাই সম্বোধন স্ফুরিত করেছেন। আশমান, প্রাণাধিক প্রিয় বোন্‌টী আমার, আর একবার ভাই কাসেম বলে ডাক্, আমি আমার সমস্ত অভিমান, সমস্ত ক্ষোভ বিস্মৃত হই।

তখন আশমান তাহার বীণা-বিনিন্দী মধুর কণ্ঠে ডাকিল ;—ভাই কাসেম! ভাই!—

কাসেম খাঁও আবেগ-জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন ;—আশমান!—বোন্‌টী আমার! বলিয়াই বিভোর কাসেম খাঁ আশমানতারার কোমল করপুটে একটী চুম্বন দান করিলেন।

তৎপরে তিনি নিজ হস্তে নিজেই শৃঙ্খল পরিধান করিলেন এবং সম্রাটের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার হস্তে তরবারি দিতে দিতে বলিলেন ;—

সম্রাট্, বন্দী আমি,—আমাকে দণ্ড দিন্। আমি বিদ্রোহী, আপনার রাজ্যের শত্রু,—জীবনের শত্রু,—আপনার সাম্য প্রতিষ্ঠার ঘোরতর

শত্রু, আমার কৃত কার্য্যের সুবিচার করুন্। আপনার সমস্ত অন্তরায় দূর হয়ে যাক্,—দ্বৈধ-দ্বন্দ্ব গৌড় হতে চির-বিদায় গ্রহণ করুক্।

অমনি সম্রাটের করোৎক্ষিপ্ত তরবারি কক্ষ-প্রাচীরে আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। সৈন্যগণ বিস্মিতভাবে কক্ষের এক প্রান্তে সরিয়া দাঁড়াইল। সম্রাট্ ছুটিয়া আসিয়া কাসেম খাঁকে শৃঙ্খল-মুক্ত ও আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিলেন ;—কাসেম খাঁ, এই তোমার উপযুক্ত শাস্তি! দ্বৈধ-দ্বেষ ইতি-পূর্ব্বেই অভাগিনীর শোণিত-ধারায় ক্ষালিত হয়েছে। হৃদয়ের যুদ্ধে আজ আমাদের সন্ধি হয়ে গেছে।

তারপর নসেরিত-পত্নীর শবদেহ পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগি-লেন ;—কাসেম-ভাই সাহেব, আমাদের আর এক অনিবার্য্য আশু কর্ত্তব্য সম্মুখে, অতি দুঃখময় কর্ত্তব্য,—বেগমসাহেবার সংকার। হায়! বিয়োগ-বিধুরা আত্মহারা নারি! কিন্তু তোমার দোষ কি? হৃদয়ের উত্তে-জনা,—প্রাণের হাহাকার,—মর্ম্মোত্থিত অগ্নুদগার কয়জন চেপে রাখ্‌তে পারে? স্বামীহত্যাকে কোন্ নারী ক্ষমা কত্তে পারে? তুমি তৃপ্ত হতে চেয়েছিলে, তা'ও কি কখনো হয়? সর্প নিহত হলে কি বিষ-ক্রিয়া শুদ্ধ হয়? তা ত হয় না। কিন্তু এ ভুল, মানুষের চিরকালের ভুল, তোমার দোষ কি?

তারপর তিনি কাসেম খাঁর পানে ফিরিয়া বলিলেন ;—ভাই সাহেব, সঙ্কুচিত কেন? 'উনিই তোমাকে প্ররোচিত করেছিলেন বলে? সে গোল ত সব মিটে গেছে ভাই! আজ তিনি হিংসা-দ্বেষ, প্ররোচনা-কুমন্ত্রণার বাইরে চলে গেছেন। তিনি তোমাকে স্নেহ কত্তেন বলে? সে ত গৌরবের! ভাগ্যবান্ তুমি, তাই তুমি তাঁর স্নেহের রাজ্যে অধিকার পেয়েছিলে। আমি তাঁর শত্রু হয়ে এসেছিলাম, আমার জন্য আশমানও

তাঁর চক্ষুঃশূল হয়েছিল। কিন্তু আজ আমরা তাঁর কাছে সবাই সমান হয়ে গেছি। এসো ভাই সাহেব! এসো আশমান! আপাততঃ আমরা তিন জনে তাঁর দেহ স্থানান্তরিত করি। প্রভাতেই তাঁকে যথাযোগ্য স্থানে সমাহিত কর্ব্বো।

এই বলিয়া সম্রাট্ অগ্রেই নসেরিত-বেগমের পদদেশ ধারণ করিলেন। আর কাসেম খাঁ শুধু,—মহান্ সম্রাট্, আজ হতে কাসেম খাঁ তোমার গোলাম,—এই পর্য্যন্ত বলিয়া বেগমের মধ্যদেশ ধারণ করিলেন। আশমানতারার চিত্তে তাহার বাল্যকালে বেগমের স্নেহের কথা জাগিয়া উঠিল। অনতিপূর্ব্বে সম্রাটের প্রতি বেগমের দানবী-ব্যবহারের বিষয় সে জানিত না। তাহা হইলেও সম্রাটের ক্ষমাপূর্ণ কথাগুলি তাহাকে ঈর্ষ্যাবিষ্ট হইবার অবকাশ দিল না। সে বেগমের জন্য সত্যসত্যই কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মস্তকদেশ বক্ষে ধারণ করিল।

তখন প্রভাত হইবার বেশী বিলম্ব ছিল না। কাসেম খাঁর ইঙ্গিতে সৈন্যগণ তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। সম্মিলিত কণ্ঠে ভগবানের নামোচ্চারণ করিতে করিতে, তাঁহারা বেগম-সাহেবার শবদেহ উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করিবার জন্য লইয়া গেলেন।

৫
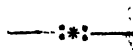
ঠিক সেইদিন প্রত্যূষে এক কিম্ভূত-কিমাকার পুরুষ গৌড়ের রাজ-পথ দিয়া যাইতেছিল।

বহুদিন গৌড়বাসী শিরোমণি মহাশয় শৌচ-ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া, গুন্ গুন্ স্বরে মহিম্ন-স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে এই অদ্ভুত জীবটীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। জীবটীর পরিধানে চিত্র-বিচিত্র লুঙ্গী, স্কন্ধে নামাবলী, মাথায় মুসলমানী টুপি, গলায় উপবীত, পৃষ্ঠদেশে একটী প্রকাণ্ড বোঁচ্‌কা। টুপীর প্রান্ত দিয়া টিকি উঁকি মারিতেছিল। মুখ-মণ্ডল অস্বাভাবিক শ্মশ্রুল; বিশেষতঃ, গুম্ফ গুচ্ছ এত অপর্য্যাপ্ত যে, তাহা গুম্ফধারীর নাসারন্ধ্রে ও মুখ-গহ্বরে অবাধ্যভাবে ঘন ঘন প্রবিষ্ট হইয়া, কণ্ডূয়ন-জনিত বিষম অশান্তি উৎপাদন করিতেছিল। কিন্তু লোকটি অতি সন্তর্পণে সেই দুর্দ্দম্য অত্যাচারীকে হস্ত দিয়া দুই পার্শ্বে মুহুর্মুহুঃ সরাইয়া দিতেছিল আর মাঝে মাঝে হাঁচিতে হাঁচিতে, অবসরক্রমে পঞ্জিকোক্ত একটী শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে চলিয়াছিল।

বিত্তং ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা—হেচ্চ—শক্রে হুতাশে ভয়ং—হেচ্চ—যাম্যামগ্নিভয়ং—হেচ্চ—সুরদ্বিষি—হেচ্চ—কলির্ণভ—সমুদ্রালয়ে—হেচ্চ—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষুৎক্রান্ত ব্যক্তিটী বিশাল নাসাদ্বার চাপিয়া ধরিয়া,

এক দফা শ্লেষ্মা নিষ্কাশনকরত হস্তস্থিত রঙিন্ রুমাল সাহায্যে কফ-লাঞ্ছিত গোঁফ জোড়াটীকে পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল ;—

বলিহারি বাবা শাস্ত্র! কোথা হাঁচি, আর কোথা টিক্‌টিকি,—কিন্তু ফলটী দেবার বেলায় এক! কিন্তু সে ত পরের হাঁচি, এ যে নিজের? তা খাট্‌বে,—খাট্‌বে না কেন? খুব খাট্‌বে—খাটিয়ে নিতে হবে। শাস্ত্রই বল্‌ছে,—আত্মবৎ মন্যতে জগৎ,—ব্যস্,—আমিও যে, পরও সে,—এই ভেবে নিলেই গোল মিটে ফল ফলে গেলো! অতএব, আমি হাঁচ্‌লেও যা,—পরে হাঁচ্‌লেও তাই। আর ভেবে ত নিতেই হবে,—যেহেতু, বিত্তং ব্রহ্মণি! এ হাঁচি ত সাধারণ হাঁচি নয়,—একেবারে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে, বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে বেরুচ্ছে,—আর যায় কোথা! বিত্তলাভ—অব্যর্থ বিত্তলাভ,—সুপ্রভাত, সুপ্রভাত!

এই বলিয়া সে আবার বার কয়েক হাঁচিয়া লইল এবং পরে বলিতে আরম্ভ করিল ;—তোফা জিনিস বাবা—এই গোঁফ! ছাড়া হবে না—এবার গোঁফটা গজিয়ে উঠুক্, বিশেষ যত্নসহকারে তার পরিচর্য্যা কত্তে হবে। নরসুন্দরের মুখ আর দেখ্‌ছি না। এঁঃ! নরসুন্দর! নরা-সুন্দরের অপভ্রংশ। এই দেখোনা, দিচ্ছি বেটাদের অন্ন ঘুচিয়ে। না—না—সন্ধি যখন পাওয়া গেছে, তখন একটা হিসেব করেই চল্‌তে হচ্ছে। এই বোঝ না কেন,—দুমাস না কামালে যদি গামছার দাম উঠে আসে, তা হলে এখন থেকে যদি আমি ক্ষৌর-সম্পর্কে না যাই, তা হলে?—হুঁ-হুঁ—বুঝে নিয়েছি,—ঐ জন্যই ত আমীর-ওমরার অত বড় দাড়ি, আর তারা অত বড় লোক! এবার একটা হোম্‌রা-চোম্‌রা যা হোক কিছু না হয়ে ছাড়্‌ছি না।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া শিরোমণি মহাশয়ের বুঝিতে বিলম্ব হইল না,—পাগল

সর্ব্বানন্দ। সর্ব্বানন্দ কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। তাহার পিতা একজন বড় নৈয়ায়িক ছিলেন। এই গৌড়েই তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। সর্ব্বানন্দ পিতার প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পিতার টোলেই তাহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে পুত্র দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিতেই, পিতা ও মাতা উভয়েই অত্যল্পকাল ব্যবধানে পরলোকগমন করেন। তখন সর্ব্বানন্দের এক পিতৃষ্বসা ব্যতীত কেহই ছিল না। পিতার মৃত্যুর পরই টোলটী উঠিয়া যায়। তাহার দুই এক বৎসর পরে, উপযুক্ত অভিভাবকহীন সর্ব্বানন্দের মাথায় খেয়াল ঢুকিয়া যায়,—সে একজন বৌদ্ধ তান্ত্রিকের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে এবং সহসা একদিন সেই কাপালিকের সহিত কোথায় উধাও হইয়া যায়। ৫।৭ বৎসর তাহার আর কোনও সন্ধান না পাইয়া, বোধ হয়, সেই শোকে তাহার পিসিমাও তাহার উদ্দেশে কোন্ অজানা দেশে প্রস্থান করেন। পিসিমার মৃত্যুর বৎসরাধিক পরে একদিন হঠাৎ সর্ব্বানন্দ গৌড়ে আসিয়া উপনীত হইল। তখন তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—বয়সের সঙ্গে আকারের অবস্থান্তর ত ঘটিয়াছেই, তৎসঙ্গে তাহার মস্তিষ্কেরও এমন একটা অবস্থা হইয়াছে যে, তাহাকে আর ঠিক প্রকৃতিস্থ বলিতে পারা যায় না। গৌড়ে আসিয়া পিসিমার দেহান্তর ঘটিয়াছে শুনিতে পাইয়া, তাহার মাথার গোলমাল আরও বাড়িয়া যায়। তাহার শুভানুধ্যায়ী প্রতিবাসিগণ নানা চেষ্টা করিয়াও, সে বিকৃতি দূর করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম সে নরকঙ্কাল, মৃত গোসাপ, কৃষ্ণকুক্কুরীর জিহ্বা প্রভৃতি লইয়া, নানাপ্রকার তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিল। তাহার পর দিনকতক মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। ক্রমে বয়ো-

বুদ্ধিবশতই হউক, আর গৌড়ের জল-হাওয়ার গুণেই হউক, সে যেন কেমন একটু শান্ত হইল। সেই সময় হইতে তাহার লোক-সমাজের উপর কেমন একটা খেয়াল পড়িয়া যায়। তৎকালীন রুচি ও রীতি-নীতি লইয়া সে প্রায়ই একটা-না-একটা পাগ্‌লামি করিয়া বেড়াইত। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সে এইরূপ পাগলামি করিয়া, গৌড়বাসী হিন্দু-মুসলমান সকলকেই আনন্দ দান করিয়া আসিতেছিল। তাহার কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার সময় সময় অসংলগ্ন ও যুক্তিরহিত হইলেও, মধ্যে মধ্যে তাহাতে টিট্‌কারীর কশা এত কটু-মধুর ও অব্যর্থ হইত যে. তাহাকে উপেক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িত। কিন্তু কেহই তাহার উপর অত্যাচার করিতে ইচ্ছা করিত না। পাগল বলিয়া বালক-বৃদ্ধ সকলেই তাহাকে ভালবাসিত ও তাহাকে ঘেঁটাইয়া তাহার কথা শুনিতে কৌতুক বোধ করিত।

শিরোমণি মহাশয় নিকটবর্ত্তী হইয়া ডাকিলেন;—আরে কে হে! সর্ব্বানন্দ যে! এ আবার কি বেশ সর্ব্বানন্দ! চলেছ কোথা?

আর মশাই,—ও—শিরোমণি দা!—হেঁ-হেঁ—সসেলাম নমস্কার। তা ভাল আছেন,—খোস্ মেজাজ ত? রাম-রহিম—রাম-রহিম। এবার ভোল্ ফিরিয়ে ফেল্লাম দাদা,—বেজায় গোলযোগ! মক্কা যাই, কি কাশী যাই,—তাই ভাব্‌ছি। এই বেশে বেরিয়েছি,—যেটায় সুবিধে হয়,—তা মক্কা গিয়ে অক্কা পাই,—আর কাশীতেই ফাঁসি যাই। আর যদি বেঁচে আসি ত মক্কা আর কাশী পাশাপাশি করে তবে আমার আর কাজ।

তুমি কি বল্‌ছ সর্ব্বানন্দ,—কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!

বুঝ্‌বে না দাদা,—এ কোনো কোরাণে-পুরাণে নেই। বৃহল্লাঙ্গুল-

ত্রিপিটক্ পড়েছিলে? তা যদি পড়্তে ত বুঝ্তে পার্ত্তে। যাক্—বড় ব্যস্ত,—অনেক রাস্তা যেতে হবে।

আরে কোথা যাচ্ছ?

সরে পড়্ছি—এখানে আর থাকা নয়।

কি রকম?—কেন হল কি?

আর হবে কি? পর্দ্দা ফাঁক্! কোন কুল রাখি, তাই ভেবে আকুল হয়েছি দাদা! এখন ত দুকুল রেখে চলেছি,—শেষ রক্ষা কর্ত্তে পাল্লে' হয়।

কি রকম দুকুল রেখেছ?

আরে ভাই, হিন্দু-মুসলমানে মিশ্-খাওয়া-খায়ি হচ্ছে। তা সেটা আর কিছুতে না হোক্, এই পোষাকেই মেরে দিয়েছি। টিকিটা ত পৈতৃক আছেই,—তার উপর টুপি চড়িয়েছি। পৈতেটা আর নামাবলিখানায় রাখ্লাম হিঁদুয়ানী,—আর এক লুঙীতেই রাখ্লাম মুসলমানী! দাদা, হাওয়া বুঝে খাইতে হয়। লুঙী নেও হে লুঙী নেও। হিসেব করে দেখো,—খুব কম খরচ। ধোপা বেটা এবার জব্দ। আর হাওয়া খেলে কি! এই দারুণ গরম,—স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌বে। আমি কষে দেখেছি,—এই লুঙী আর দাড়িতেই ধোপা-নাপিতের অন্ন-লোপ। ওঃ! কি একচেটে পশারটাই না চালিয়েছে! ব্যস,—আর দেখ্তে হবে না,—এবার ওদের দফা রফা,—আর তার সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়ময় আমীর-ওমরা! বিশেষ সুবিধে এই গোঁফ,—ভারি জবর-বেড়া! কোনো পোকা-মাকড, আপদ-বালাই উদরস্থ হবার যোটী নেই,—এই জালে আট্‌কিয়ে একেবারে চিৎ-পটাং! সখও মিট্‌বে,—হাতে দুটো পয়সাও হবে। এই দেখো না,—(হেঁচ্চে)—নস্যি খরচ নেই,—বিনা ব্যয়ে হাঁচি;—মাথা সাফ্,—আহার ওষুধ দুই-ই!

শিরোমণি মহাশয় ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন ;—তা সর্ব্বানন্দ, তুমি বলেছ মন্দ নয়। দেশ-কাল যা,—তাতে দুকুল রাখাই দরকার হয়ে পড়েছে। জাত-কুল রাখা বড়ই সমস্যার কথা। কি করি,—কোথা যাই, কিছুই ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছি না। নাকি লড়াই বাধ্‌ছে,—হিন্দু-সৈন্য নাকি গৌড় আক্রমণ কচ্ছে। বাদসার ফৌজও নাকি সেজে গুজে বেরোচ্ছে। রাজা-রাজড়ায় লড়াই হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়। এদিকে বাদসা অন্নদাতা,—ওদিকে রাণী আর হিঁন্দুয়ানী। যাক্-গে, সে সব কথায় কাজ নেই,—যা ভাগ্যে থাকে তাই হবে। কি বলো হে ?

কাজ নেই কেন দাদা,—আমাদেরই ত কাজ! রাজা উজির মার্ত্তে আমরাই ত মারি,—হুজুগ কর্ত্তে আমরাই ত করি! সোজা পথ ধরো, আমার মত করো,—দিব্যি পালাতে পার্ব্বে। এই দেখোনা,—টুপীতে টিকিটা ঢাক্‌লাম,—পৈতেটা ঘুন্‌সী করে নিলাম,—আর নামাবলীখানা গুঁজ্‌লাম বোঁচ্‌কায়,—ব্যস্ একেবারে সফরজন্দ খাঁ ;—আবার এই টুপীটা, গোঁফ-দাঁড়িটা আর লুঙীটা বোঁচ্‌কায় ঢোকালাম ত একেবারে কৌপীন-ধারী সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য! যখন যেমন, তখন তেমন। হিন্দু-মুসলমান শুধু পোষাকের মারপেঁচ বই ত নয়! সেইটেয় ধরা না পড়্‌লে হল। আজকালের বাজারে যত গোঁজামিল দেবে,—ততই লাভ।

শিরোমণি মহাশয় পূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলেন ;—তাইত সর্ব্বানন্দ, গতিক ভাল বুঝ্‌ছি না,—গৌড়ে থাকা আর নিরাপদ নয়। কিন্তু যাই কি করে ? তোমার বধূঠাকুরাণী রয়েছেন, তাঁকে নিয়েই বা কি করে সরি ?– সে ত আর বোঁচ্‌কায় চল্‌বে না!

বিলক্ষণ,—এই দেখোনা ঘেরাটোপ্‌!

এই বলিয়া সর্ব্বানন্দ বোঁচ্‌কা হইতে একটা বোর্‌খা টানিয়া বাহির

করিল। বলিল ;—বেগতিক দেখ্‌লেই এই ঘেরাটোপে ঠাকৃরুণকে পূরে ফেলা। নেও চলো,—চলো,—তোমাদের পগার পার করে দিয়ে আসি।

শিরোমণি মহাশয় একটু ইতস্ততর ভাণ করিয়া বলিলেন ;—কিন্তু দেখো সর্ব্বানন্দ, বল্‌ছ বটে,—কিন্তু—কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে!

ঐ ত তোমাদের দোষ দাদা,—বাধ-বাধ ঠেকেই তোমাদের মাটী। তোমরা তোমাদের সেই অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহর পোকায়-খেগো নামাবলী-খানা গায়ে দিয়ে শীতে হি-হি কর্ব্বে,—সো-বি আচ্ছা,—তবু একটা আঙ্‌রাখা গায় দেবে না,—তোমাদের নাকি জাত যাবে! তোমার দেশের জাত গিয়েছে,—তুমি তোমার নিজের জাত বাঁচাচ্ছ! বৃদ্ধ বেশ্যার নিষ্ঠাটা একটু বেশী হয় কি না!

শিরোমণি-ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—ঠিক বলেছ সর্ব্বানন্দ,—বৃদ্ধ বেশ্যার নিষ্ঠাটা একটু বেশী হয় বটে। কিন্তু কি করি বল্‌ত,—তোর মত আপনি আর কোপ্‌নী হয়, ডেরাডাণ্ডা তুল্‌লাম, ব্যস্‌—রওনা। এ ত আর তা নয়,—একটা সংসার। শাস্ত্রে বল্‌ছে,—পথে নারী বিবর্জ্জিতা। শেষে আবার সীতা-হরণ হয়ে যাবে!

সর্ব্বানন্দ বলিল ;—জাত-জাত কচ্ছ, জাত কি ধুয়ে খাবে দাদা!—বাঙ্গালীর আবার জাত! সে ত সেই লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে সঙ্গে পটোল তুলেছে, এখন ত তোমরা গড্ডলিকা-প্রবাহে গা-ভাসান দিয়ে চলেছ! আজ আমি না হয়, সব্বা-পাগলা, লুঙী পরে বেরিয়েছি বলে পাগল বলে উড়িয়ে দিচ্ছ, কাল তুমি যখন এই লুঙী পরে রাস্তায় আনাগোনা কর্ব্বে, লোকে বলবে, ও একটা কায়দা, তখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব শিয়ালের এক ডাক হয়ে যাবে। সংসার তোমরাই কর্চ্ছ, আর ত

কেউ করে না! কাঁহা মুল্লুক থেকে মুসলমান বাঙলায় এসে দিব্যি সংসার পাতিয়ে বসতে পাল্লে, তাদের পথে নারী বিবর্জ্জিতা হল না,—হল তোমাদের কাছে! তা ত হবেই, তোমাদের শালগ্রাম যে মুসলমানের লাঙলের গুঁতো খেয়ে তোমাদের স্বপ্নে দেখায়,—আমায় এই মাঠ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা করিস্ ত ভাল, নচেৎ তোকে ছায়ে-মায়ে এক-গড় কর্ব্বো। হাঁ হাঁ তা হবে না? এক গাঁয়ে ঢেঁকী পড়ে, অন্য গাঁয়ের মাথা ব্যথা ত হয়েই থাকে!

শিরোমণি মহাশয় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—সর্ব্বানন্দ, তোমাকে পাগল বলে কে?

সর্ব্বানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল;—আজকালের বাজারে পাগলই ভাল; পাগলের মাপ আছে, মাথা-গোলের তা নেই।

শিরোমণি মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—তা এখন যাচ্ছ কোথা সর্ব্বানন্দ!

এই একটু ঘুরে ফিরে আসি।

ফির্‌বে ত?

ফির্‌বো না ত যাব কোথা সহর ছেড়ে?

এই যে বল্লে গৌড় ছেড়ে যাবে?

গৌড় ছেড়ে কজন যাচ্ছে, তাই দেখ্‌তে যাচ্ছি।

গৌড় ছেড়ে কোথায় যাচ্ছে তারা?

ছেলেয় ছেড়ে মায়ের দলে।

মা ত আস্‌ছেন?

সে ত আর ছেলের সাথে মোলাকাৎ কর্ত্তে নয়! তারা মায়ের মন রাখ্‌তে যাচ্ছে।

ধন্য মা বটে !

হবেই বা না কেন ? তোমরাই ত ধন্য কল্লে !

কি রকম ?

এমনি রাশ্ টান্‌লে আর কি !

তাই বলে শাস্ত্র ত আর অগ্রাহ্য করা চলে না !

দুত্তোর তোমাদের শাস্তর ! একটা লোকের দশটা উপপত্নী থাক্‌তেও তার জাত যায় না, জাত যায় মুসলমান বিয়ে কল্লে ! নোনা জলের বান ডেকেছে, তোমরা খানা কেটে বাঁধ দিয়ে কতদিন রাখ্‌বে শুনি ? এমন একটা লোককে তোমরা হাতছাড়া কল্লে, তোমাদের জাতের আবার ভাল হবে ! এই বলে রাখ্‌ছি—দেখো, তোমাদের বজ্র-আঁটুনি ফস্কা-গাঁটের চোটে জাল থেকে সব রুই-কাৎলা এক এক করে পালিয়ে যাবে।

সর্ব্বানন্দ চুপ করিল। শিরোমণি ঠাকুরও কি ভাবিয়া একটু পরে বলিলেন ;—যাই হোক্, লড়াই ত বাধ্‌লো, দেখা যাক্ কি হয়।

সর্ব্বানন্দ উত্তর দিল ;—কি আর হবে ? তোমাদের একটা রগড় দেখা হবে, এই পর্য্যন্ত। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ;—যা হয়ে থাকে তাই। মায়ে-ছেলেয় লড়াই হয় না। যদি হয়, সে ছেলে তার বাপের নয়।

দূর পাগল, লড়াই হল,—আর বলে হবে না !

দেখো তাই।

এই বলিয়া সর্ব্বানন্দ পথ বাহিয়া চলিল। শিরোমণি মহাশয় তাঁহার কুটীর-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। তখন অরুণচ্ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় রাজপথে দামামা-ধ্বনির সহিত নগরঘোষ ঘোষণা করিতে করিতে চলিল :—

এক সপ্তাহের মধ্যে গৌড়ের ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি মহারাজ গণেশ-নারায়ণ শর্ম্মখাঁ বাহাদুরের বিধবা পত্নী, গৌড়ের বর্ত্তমান সম্রাটের মহিমময়ী জননী গৌড়ে পদার্পণ কচ্ছেন,—তাঁকে যথাযোগ্য অনুষ্ঠানে সম্মানিত কর্ত্তে হবে। গৌড়ের প্রতি রাজপথে তোরণ, প্রতি তোরণে নহবৎ বস্‌বে। ধনীর প্রাসাদ ও দরিদ্রের কুটীর পুষ্প-পল্লবে, দীপমালায় ও হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় পতাকায় সজ্জিত হবে। হিন্দু-মুসলমান নরনারী নব নব বসন-ভূষণ পরিধান করে রাজমাতার আগমন প্রতীক্ষা কর্ব্বে। ধূনা-গুগ্‌গুল, কর্পূর, চন্দন, লোবান, গোলাপ ও মৃগনাভি প্রভৃতির মিশ্রগন্ধে গৌড়ের বাতাস সুরভিত হবে। মায়ের প্রবেশ-পথে লাজাঞ্জলি ও পুষ্পরাশি বর্ষিত হবে। উৎসব সপ্তাহব্যাপী হবে। গৃহে গৃহে, কক্ষে কক্ষে আনন্দ-কোলাহল, নির্ম্মল আমোদ-প্রমোদ, নৃত্য-গীত চল্‌বে। সাত-সাত দিন ধরে, দেশ-দেশান্তরের কাঙ্গাল-ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী-ফকির, অতিথি-আতুর সকলের অবিশ্রান্ত সেবা-কার্য্য চল্‌বে। গৌড়ের নগরবাসী ও উপকণ্ঠস্থ অধিবাসিগণ রাজমাতার অভ্যর্থনার জন্য, নিজ নিজ গৃহদ্বার সেদিন দিবারাত্র উন্মুক্ত রাখ্‌বেন। বাদসাহের আদেশ পালনের জন্য সকলেরই পূর্ব্ব হতে প্রস্তুত হতে হবে,—সেইজন্য এই ঘোষণা।—উপেক্ষায় দণ্ডনীয় হতে হবে। অনুষ্ঠানের জন্য অর্থের অভাব রাজকোষে জানালেই তা পূরণ করা হবে।

দেখিতে দেখিতে রাজপথ লোকারণ্য হইল। সর্ব্বানন্দ সেই ভিড় ঠেলিয়া ফিরিতেছিল। শিরোমণি ঠাকুর প্রাঙ্গণেই দাঁড়াইয়াছিলেন,—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

কি হে সর্ব্বানন্দ,—ফির্‌লে যে ?

আর যেতে হল না,—সে গুড়ে বালি!—বলিয়া সর্ব্বানন্দ হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

সর্ব্বানন্দের সে বেশ তখন আর নাই।

৬

আজ পাঁচ দিন রাণী ত্রিপুরাদেবী গৌড়ে আসিয়াছেন,—পাঁচ দিন ধরিয়া অহোরাত্র অবিশ্রান্ত মহোৎসবে গৌড়-নগরী তোলপাড হইতেছে। অন্নদান, বস্ত্রদান, অর্থদান, নৃত্য-গীত, আনন্দোল্লাস, আলোক-সজ্জা, অগ্নি-ক্রীড়া প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানে সমগ্র গৌড় ব্যাপিয়া প্রীতির প্লাবন ছুটিয়াছে। এই অপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত মিলন-ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সমভাবে যোগদান করিয়া বহুদিনাভ্যস্ত জাতিগত দ্বৈধ-দ্বেষ বিস্মৃত হইয়া, এক দেশ-মাতৃকার স্তন্যপুষ্ট দুইটী সন্তান এক অভিনব প্রশান্তি লাভ করিয়া আজ যেন সেই ক্রীড়াজনিত ক্লান্তিতেই তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আজ তাহাদের সে অবসাদেও সুখ-বিমিশ্র উদ্যমের চিহ্ন প্রতি ব্যক্তির স্বেদ-জড়িত ফুল্লারক্ত মুখমণ্ডলে পূর্ণভাবে বিদ্যমান।

আজ গৌড়ে রাণী ত্রিপুরাদেবীর দরবার বসিয়াছে। রাণী গৌড়ীয় রাজপুরুষ আমীর-ওমরাহ-প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় প্রতি ব্যক্তি ও অপরাপর জনসাধারণকে সেই দরবারে উপস্থিত থাকিবার জন্য তাঁহার অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং সকলেই অতি আগ্রহের সহিত সেই সাদরাহ্বান গ্রহণ করিয়াছেন। আজ প্রভাত হইতে জন-স্রোত প্রাসাদাভিমুখে অবিরাম ছুটিয়াছে।

সম্রাটের সভামণ্ডপে রাণী-দরবার বসিয়াছে। সম্রাটের অভিমতানুযায়ী

সে দরবারে আদব-কায়দার কোনও ত্রুটী হয় নাই। বরং, কোনও কোনও ব্যবস্থা বিশেষত্ব-জ্ঞাপক হইয়াছে। সভাতলের একপার্শ্বে গৌড়পক্ষের, অন্য পার্শ্বে ত্রিপুরাদেবীর পক্ষীয় ব্যক্তিগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উভয় দলস্থ সৈন্যগণ দরবারে শান্তিরক্ষা করিতেছে। সম্রাটের সিংহাসন শূন্য, তৎপার্শ্বে তিনখানি হস্তিদন্তবিনির্ম্মিত সিংহাসন স্থাপিত এবং তদুপরি তিনখানি মৃগচর্ম্ম আস্তৃত হইয়াছে। সিংহাসনের একখানিতে রাণী, পার্শ্বে একদিকে পুরোহিত কালীকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও অন্য দিকে বৃদ্ধরাজা অবনীনাথ উপবিষ্ট হইয়াছেন। সেই পূতস্নান, গৈরিকবাস-পরিহিত, নামাবলী-চিহ্নিত ত্রিমূর্ত্তির পানে সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির কৌতূহল-দৃষ্টি ঘন ঘন নিপতিত হইতেছিল।

আজও প্রথমে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন;—গৌড়ীয় রাজপুরুষগণ, সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলি ও সাধারণ প্রজাপুঞ্জ, আপনাদের নিকট থেকে আমরা সত্য সত্যই অতি অপ্রত্যাশিতভাবে আপ্যায়ন লাভ করেছি, সে জন্য রাণী-মা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন ও আপনাদিগকে তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ দান কর্চ্ছেন। জগতে বোধ হয়, কোথাও কোনো কালে এভাবে কোনো যুদ্ধের অবসান হয় নি। হিন্দু-মুসলমানের এরূপ একটা দুর্নিবার্য্য আসন্ন সংঘর্ষ যে আজ এমন মধুর মিলনের সংস্পর্শে স্তব্ধ হয়েছে, এ একমাত্র ভগবানেরই অপার করুণা বল্‌তে হবে। প্রার্থনা, তিনি যেন এই অপূর্ব্ব মিলন অক্ষুণ্ণ রাখেন। দুইটী হৃদয় তাঁরই অনুগ্রহে আজ যুক্ত হতে চলেছে, আর যেন মুক্ত না হয়, প্রীতির গ্রন্থি যেন ক্রমশঃ দৃঢ়তর ও মধুরতরই হয়। আজ এ-হেন সন্ধিক্ষণে আমাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান অতি সরলতার সহিত সমাহিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরস্পরের মনোভাব অকপটে পরস্পরের সম্মুখে প্রকা-

শিত হয়ে, যাতে অবশিষ্ট সমস্ত সংশয় সুন্দরভাবে মীমাংসিত হয়, সেজন্য আমাদের সমবেত চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই জন্যই আজ এই সভার আহ্বান। রাণী-মার প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সন্নিকট হয়ে আসছে, সুতরাং, অবিলম্বে আমাদের অসম্পূর্ণ ও অবশ্য কর্ত্তব্যে হস্তক্ষেপ ও তা সমাধা কত্তে হচ্ছে। আশা করি, আপনারা সকলেই আমাদের বক্তব্য স্থিরভাবে শুনবেন ও নিজ নিজ মতামত অকপটে ব্যক্ত করে উপযুক্ত যুক্তিদান কত্তে কৃপণতা কর্ব্বেন না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপবেশন করিলে উজীর সাহেব বলিলেন ;—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা খুবই ঠিক। আমাদের মধ্যে এই যে মিলন, এই যে অতি সহজ সরলভাবে একটা প্রবল ঝঞ্ঝার নিবৃত্তি, এ একটা স্বপ্নাতীত দৈব ব্যাপারই বটে। আমরা এই কয়টী পলিতকেশ এখানে উপস্থিত আছি, অনেক দেখেছি—অনেক দিন থেকে আমরা উভয় জাতির সংস্পর্শে নানা ব্যবহারে লিপ্ত হয়েছি, কিন্তু এমনভাবে হৃদয়ের আদান-প্রদান কখনো হয় নি। সুতরাং, আজ যে আমরা এই নূতন আলোকের সন্ধান পেয়েছি,—যাতে তা থেকে আমরা দূরে সরে না পড়ি, সর্ব্বপ্রযত্নে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী আমাদের বাদসার মতও তাই। এই অবস্থায় আমাদের অবক্তব্য কিছুই থাকতে পারে না। বিশেষতঃ, সম্রাট্-জননীর সম্মুখে আমাদের মনোভাব অকপটেই ব্যক্ত হবে।

এই সময় রাণী ত্রিপুরাদেবীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। সভাস্থ সকলে আগ্রহপূর্ণ চিত্তে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন ;—

উজির সাহেব! তোমাদের উদার ব্যবহারে আমি প্রীত হয়েছি বটে, কিন্তু জানবেন,—সে প্রীতি আমি অনুভব করেছি আমার স্বর্গগত স্বামীর

দিক্ দিয়ে,—অন্য কোনো দিক্ দিয়ে নয়। আমি অতি কাতরভাবে জানাচ্ছি, স্বামী-সম্পর্কে আমি তোমাদের কাছ থেকে যে অভিধান পেতে পারি, আমাকে সেই অভিধানে অভিহিত কর্ব্বে। হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য-স্থাপন আমার স্বামীর একান্ত ইচ্ছা ছিলো, আমারো সেই একই ইচ্ছা এটা নিশ্চয় জান্‌বে। তবু আমি কেন যে হিন্দুসৈন্য সজ্জিত করে গৌড়ে এসে উপস্থিত হয়েছি, সেটাকে তোমরা একটু ভেবে দেখ্‌বে। আমরা যুদ্ধের জন্যই এসেছিলাম,—আপ্যায়নের প্রত্যাশা করে আসিনি। অবশ্য তোমরা অযাচিতভাবে উদারতা দেখিয়ে আমাদিগকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করেছ। তা হলেও, এটা তোমাদের বুঝ্‌তে হবে,—শুধু আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে ফিরে যেতে হিন্দুসৈন্য গৌড়-অভিযান করেনি।

রাণীর উক্তিতে উজির সাহেব একটু লজ্জিত হইলেন। অন্যান্য সকলের মধ্যেও একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। তখন দেওয়ান জীবনরায় মহাশয় বলিতে লাগিলেন ;—

উজির সাহেব ও আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ, রাণী-মা যে অভিমত প্রকাশ কর্লেন, তাতে আপনারা ক্ষুণ্ণ হবেন না। বর্ত্তমানে তিনি মনের যে অবস্থা নিয়ে গৌড়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাতে তাঁর মুখ দিয়ে এইরূপ অভিমানপূর্ণ উক্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেজন্য আমাদের সম্রাটের বিশেষ অনুরোধ,—রাণী-মা যাতে প্রীত থাকেন, আমাদের সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে সব বিষয়ের অবতারণা ও মীমাংসা কর্ত্তে হবে। ভাদুড়ীচক্র ও সাঁতোড়ের সহিত আমার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আপনারা বোধ হয়, সকলে জানেন না,—সম্পর্কে রাণী-মা আমার মাসিমাতা ও রাজা অবনীনাথ আমার পিসামহাশয়। এদিকে গৌড়-মসনদের নিকট আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। সুতরাং, আমাকে সব দিক রক্ষা করে যেতে হবে এবং যাতে

এই বিপর্য্যয় উপলক্ষ্য করে, হিন্দু বা মুসলমান কারো কিছু ক্ষতি না হয়, সাধ্যপক্ষে আমার সে চেষ্টা কত্তে হবে। আশা করি, সম্রাটের উপদেশ-মতে আপনারা সকলে রাণী-মার অভিমানব্যঞ্জক কোনো উক্তিতে বিচলিত হয়ে মূল বিষয়ের মীমাংসায় উদাসীন হবেন না। আসুন,—আমরা অবহিতচিত্তে তাঁর মূল মন্তব্য শ্রবণ করি। এইটীই আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখ্‌তে হবে,—যে ভাবে আমরা তাঁদের সম্বর্দ্ধনা করেছি,—ঠিক সেই ভাবেই আমরা তাঁদের বিদায় দান কর্ব্বো।

তখন রাজা অবনীনাথ বলিতে লাগিলেন ;—সম্বর্দ্ধনার কথা বল্‌ছ জীবন,—কিন্তু বাহ্যতই সেটা খুব চমকপ্রদ,—অন্তরে তার অনেক গলদ। সত্য কথা বল্‌তে কি, এর চেয়ে যুদ্ধই আমাদের পক্ষে ভাল ছিলো! তোমরা ত ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, রোশনাই করে গৌড়ময় একটা চম্‌চমা লাগিয়ে দিয়েছ,—এক বিরাট্ কীর্ত্তি করে ফেল্লে বলে ; কিন্তু আমরা কি ভাব্‌লাম জানো? আমরা ভাব্‌লাম,—এ আমাদের সম্বর্দ্ধনা নয়,—আমাদের আত্মশ্রাদ্ধ! তোমাদের নহবতে আমাদের শ্রাদ্ধের ঢাকই বেজেছে,—তোমাদের অতিথ-ব্যথিতের সেবা যেন আমাদের শ্রাদ্ধের কাঙ্গালী-বিদায়ই বলে বোধ হয়েছে! জীবন, আমাদের জীবিতাবস্থাতেই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে ফেল্লে! যাহোক্, নিমন্ত্রিতের আর ক্ষোভের কারণ রইলো না,—যাদের শ্রাদ্ধ তারা সশরীরে বর্ত্তমান! কিন্তু একটা বড় অভাব দেখ্‌ছি বাপু!—যিনি এই অভাবনীয় ঔর্দ্ধদৈহিকের কর্ত্তা, তাঁকে ত একদমই নয়নগোচর হচ্ছে না! এ তোমাদের কিরূপ আজগুবি ব্যবস্থা জীবন! আজ না হয় দুদিন গৌড়ের সহিত সাঁতোড়ের সম্বন্ধ-লোপ ঘটেছে, কিন্তু এক সময় ত গৌড় আর সাঁতোড় রাজবংশের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিলো,—তখন ত মুসলমানী আদব-কায়দায় অভ্যর্থিত ও অভ্যর্থকে দেখা-সাক্ষাৎ

হবে না, এ ভাবের কোনো ব্যবস্থাই ছিলো না! তোমরা আমাদের সম্মান কর্চ্ছ কি অপমান কর্চ্ছ,—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! বিদায়ও বোধ হয়, ঐরূপ একটা কিছু হবে? কেমন জীবন! তা বেশ—ভাল!

দেওয়ান মহাশয় এই সময় কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া সেনাপতি কাসেম খাঁ বলিতে লাগিলেন;—সাঁতোড়রাজ আজ শোকাচ্ছন্ন;—এ তাঁর মর্ম্মবেদনার অভিব্যক্তি। সুতরাং, এর কোনো সন্তোষজনক উত্তর বোধ হয়, আমরা দিতে পার্ব্বো না। এক ত পূর্ব্ব হতে গৌড়ের প্রতি সাঁতোড়ের বিরাগ, তার উপর এই বিপর্য্যয়;—এতটা অসদ্ভাবের মধ্যে আমরা গৌড়ের বা গৌড়-সম্রাটের পক্ষ থেকে যা বল্‌তে যাই না কেন,—কিছুই তাঁর প্রীতিকর হবে না। সুতরাং, সে বিষয়ে আমরা তাঁর মার্জ্জনা ভিক্ষা কচ্ছি এবং তাঁদের প্রধান বক্তব্য শুন্‌বার জন্য বিশেষ আগ্রহ জানাচ্ছি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন;—আপনি সঙ্গত কথাই বলেছেন,—এখন অবান্তর আলোচনার প্রয়োজন কি? আর আমরা যখন সে আপ্যায়ন গ্রহণই করেছি, তখন তার সমালোচনা করে লাভ নেই। এখন আমাদের অতীতকে ছেড়ে দিয়ে বর্ত্তমানের উপর সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়্‌তে হবে। আমরা আপনাদের সম্রাট্‌কে চাই না,—চাই আপনাদের সবাইকে। আপনারাই আমাদের অভ্যর্থনা করেছেন,—সেজন্য দ্বিরুক্তি না করে আমরা অতি শান্তভাবে গৌড়ে প্রবেশ করেছি। রাণী-মা স্পষ্টই বলেছেন,—তিনি তাঁর স্বর্গত স্বামী মহারাজ গণেশনারায়ণের বিধবা পত্নীরূপেই আপনাদের সাদর আহ্বান গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, আপনাদের বর্ত্তমান সম্রাটের অনুপস্থিতি বরং উপযুক্তই হয়েছে। আর এখন আমরা যে বিষয়ের অবতারণা কর্ব্বো,

সে সম্পর্কেও তাঁর এ স্থলে উপস্থিতি আমরা প্রয়োজন বোধ করি না। আমাদের বক্তব্য,—গৌড় হিন্দুর,—মুসলমানের নয়—

এইটুকু বলিতেই দরবার-কক্ষে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কিন্তু তাহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন;—আমাদের বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, এই থেকেই আপনারা সিদ্ধান্ত করে নেবেন না,—আমরা মুসলমানকে গৌড় থেকে নিষ্কাশিত কর্ত্তে চাই। আমরা এইমাত্র বল্‌ছি,—গৌড়ের উপর মুসলমানের যা দাবি, হিন্দুর দাবি তার চেয়ে ঢের বেশী। যতদিন গৌড় ততদিন হিন্দু,—হিন্দু হতেই গৌড়-সাম্রাজ্য। মুসলমান ত সেদিনের। তাঁরা হিন্দুর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শাসন-পদ্ধতি কিছুই জানেন না। তাদের দ্বারা রাজ্য শাসিত হয়ে, আজ হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম জাতীয়ত্ব বা বৈশিষ্ট্য সব লোপ পেতে বসেছে। আমরা সেজন্য গৌড়ে হিন্দুরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠ কর্ত্তে চাই এবং যাতে স্বেচ্ছাচার স্বধর্ম্মত্যাগ ও ম্লেচ্ছত্ব আমাদের ঋষি-প্রণীত চিরপূত ধর্ম্ম বা সমাজে প্রশ্রয় লাভ না করে, এখন থেকে তার প্রতীকার ইচ্ছা করি। মুসলমান আমাদের নিকট নবাগত অতিথি। সুতরাং, আদরের বস্তু বটে, কিন্তু তাঁরা কর্ত্তৃস্থানীয় হতে পারেন না। তাঁরা আমাদের আশ্রয়ে জীবনযাপন কর্বেন,—আমাদের জাতীয়ত্বের ছায়াতলে শান্তভাবে দিনপাত কর্বেন, নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষভাবে আমরা তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা কর্বো, তাঁদের কোনো চিন্তা বা উদ্বেগ ভোগ কর্ত্তে হবে না। এই আমাদের মন্তব্য।

তদুত্তরে উজির সাহেব বলিলেন;—ভট্টাচার্য্য মহাশয় যা বল্লেন, তার সমস্তটাই যে অযৌক্তিক, তা বল্‌তে পারি না। গৌড় হিন্দুরই

প্রতিষ্ঠিত,—মুসলমান অতি অল্পদিনের ; সংখ্যায়ও মুসলমান মুষ্টিমেয়,—হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। কিন্তু সাম্রাজ্যে অধিকার কোনো জাতিরই চিরদিনের নয়। প্রতিষ্ঠাতা বা উপভোক্তা বলে সাম্রাজ্যের দাবি চলে না ;—তা হলে, জগতের আদিযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত যেখানে যত প্রাচীনতম জাতি আছে বা ছিলো, তারাই অপ্রতিহতভাবে উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজ্য চালনা করে যেত ;—তাহলে, এত সংঘর্ষও হত না বা এক জাতির উত্থান বা পতন ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত কর্ত্ত না। মুসলমান দুদিনের বলে, তার দাবি হিন্দুর অপেক্ষা কম,—তা যদি হয়,—তাহলে পৈতৃক সম্পত্তিতে বড় ভাই অপেক্ষা ছোট ভাইয়ের দাবি কম,—এই অসঙ্গতিকেও পোষণ কত্তে হয়। আর তাই-হ যদি হত, তাহলে, ন্যায়বান মহারাজ গণেশনারায়ণ অনায়াসে প্রকাশ্যভাবে গৌড়ের মসনদ অধিকার করে বস্‌তে পার্ত্তেন। তিনি ত বাদসাহের সমস্ত ক্ষমতাই প্রায় চালনা করে গেছেন,—তবে তিনি নিজ নামে রাজ্য-শাসন বা মুদ্রা-প্রচলন করেন নি কেন ? তারপর,—আমরা হিন্দুর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সম্যক্ অবগত নই,—এটা ঠিক—এবং সেজন্য আমাদের রাজ্য-শাসনে ত্রুটী হতেও পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দুর সে ভয় কর্ব্বার কোনো হেতু দেখ্‌তে পাচ্ছি না,—যখন সেই হিন্দুই আজ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে গৌড় মসনদে উপবিষ্ট হয়েছেন।

তখন রাণী স্বয়ং উজির সাহেবের কথার উত্তর দিয়া বলিতে লাগিলেন ;—উজির সাহেব, তোমার স্পষ্টবাদিতায় আমি খুবই খুসী হয়েছি। সাম্রাজ্য কোনো জাতিরই চিরস্থায়ী সম্পত্তি নয়,—এটা খুব ঠিক কথা। বিজয়-লক্ষ্মী যখন যে জাতির অঙ্কশায়িনী হন, তখন সেই

জাতিই বিজিত সাম্রাজ্যের দাবি রাখে। আমরা ত সেই জন্যই সমর-সজ্জা করে এসেছিলাম,—তোমাদের আমন্ত্রণ রক্ষা কত্তে ত আমরা গৌড়ে আসিনি! তোমরাই ত সন্ধির পতাকা উড্ডীন্ করে ভীরুর ন্যায় নিরস্ত্র অবস্থায় আমাদের আহ্বান করে আন্‌তে অর্দ্ধপথ অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলে! আজ এই পাঁচ-পাঁচ দিন ধরে তোমরাই ত আমাদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা কর্চ্ছ! এ সব ত তোমাদের কোনো প্রয়োজন ছিলো না,—অনায়াসেই অস্ত্রধারণ করে অগ্রসর হতে পার্ত্তে;—না হয়, তাতেই স্থির হয়ে যেত,—গৌড় হিন্দুর কি মুসলমানের! তা যখন পারোনি,—তখন কেন আমরা সাম্রাজ্যের দাবি কর্ব্বো না? মহারাজের নজীর দেখাচ্ছ? তাঁকে আমরা পুনঃপুনঃ বলেছি,—পুনঃপুনঃ তাঁকে সতর্ক করেছি। তিনি তা কত্তে পারেন নি,—সে ত তাঁর দুর্ব্বলতা,—তিনি ভুল বুঝেছিলেন। আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন, তাহলে বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌তে পার্ত্তেন,—তাঁর সে ভুলের কি বিষময় ফল ফল্‌তে আরম্ভ করেছে। যাক্,—তিনি স্বর্গে গিয়েছেন, কি পাপে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছি আর সেই বিষময় ফলের আস্বাদ নিয়ে জর্জ্জরিত হচ্ছি, আর মাত্রা বাড়াতে চাই নে। কিন্তু উজির সাহেব, তোমরা যদি একটু ভাল করে ভেবে দেখো, তা হলে বুঝ্‌বে—প্রচ্ছন্ন ভাবে তিনি গৌড়ের সম্রাট্ই হয়েছিলেন। তোমরা যদি তাঁর সম্রাটের পূর্ণশক্তিসম্পন্ন প্রতিনিধিত্ব স্বীকার না কর্ত্তে, তা হলে দেখ্‌তে,—তাঁর প্রকৃত মূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ কর্ত্ত কি না। আজ তাঁর অবর্ত্তমানে হিন্দু-শক্তিকে অক্ষম বুঝে তোমরা আস্ফালন কচ্ছ; হিন্দুর প্রভুত্বকে ঠেলে দিয়ে মুসলমান সম্রাট্ সৃষ্টি করে গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়েছ। কিন্তু ঠিক জেনো,—হিন্দু এখনো ততটা হীনবল হয় নি! তোমরা যদি হিন্দুর

প্রাধান্য স্বীকার কর্ত্তে রাজি না হও, হিন্দুই বা তোমাদের প্রাধান্য মেনে নিতে চাইবে কেন? তারপর গৌড়ের উপর একটাকিয়া রাজবংশের যে দাবি, সে দাবিও আজ তোমরা অগ্রাহ্য কর্চ্ছ,—আমরাই বা তা সহ্য কর্ব্বো কেন? সে দাবি আমরা পূর্ণভাবে আদায় কর্ত্তে চাই,—তোমাদের কোনো কথা শুনবো না। শোনো উজির সাহেব! তোমাদের বর্ত্তমান গৌড়-সম্রাটের সহিত ভাদুড়ীচক্রের আর কোনো সম্পর্ক নেই। হিন্দু-শাস্ত্রমতে জাতিত্যাগ আর অপমৃত্যু এক। আজ গৌড়ের মসনদে যিনি উপবিষ্ট, তিনি ভাদুড়ী-বংশধরের প্রেতাত্মা। প্রেতাত্মার সাম্রাজ্যে অধিকার নেই। ভাদুড়ীচক্রের বর্ত্তমান বংশধর কুমার অনুপনারায়ণই গৌড়ের প্রকৃত অধিকারী,—আমরা তাকেই গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে এসেছি। হিন্দু মুসলমান হয়ে গৌড়-মসনদে বসেছে, তবে আর হিন্দুর ক্ষোভের কি আছে?—এরূপ কথা বয়ঃপ্রবীণ তুমি,—তোমার মুখ দিয়ে এরূপ একদেশদর্শী প্রশ্ন শোভন নয়। উজির সাহেব! তুমি কি জানো না, ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ কতটা ভয়ানক! বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে পরধর্ম্ম আশ্রয় কতকটা মার্জ্জনীয় হতে পারে, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায়, শুধু খেয়ালের খাতিরে, শুধু সাম্রাজ্যের লালসায়, স্বধর্ম্ম-বর্জ্জন কোনো প্রকারে মার্জ্জনীয় নয়। তোমরা সেই অমার্জ্জনীয় ত্রুটীকে অনায়াসে প্রশ্রয় দিয়েছ। যে একটাকিয়ার অনুগ্রহে গৌড়-মসনদ অস্তিত্ব রক্ষা কর্ত্তে সমর্থ হয়েছে, যে একটাকিয়ার রাজ-কার্য্য-পরিচালনায় গৌড়-মসনদ দিল্লীশ্বরের আক্রমণকে পরাঙ্মুখ করে সগর্ব্বে এখনো দণ্ডায়মান রয়েছে, সেই ভারত-বিদিত একটাকিয়া রাজবংশের সন্তান কুল-গরিমাকে একেবারে নিষ্প্রভ—এত বড় একটা সংসারকে একেবারে ছারখার করে চলে এলো,—তোমরা কি না সেই কুলগ্লানিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত কর্ত্তে এতটুকু কুণ্ঠিত

হলে না! উজির সাহেব! মুসলমান যে এত স্বার্থপর, এত কাণ্ডজ্ঞান-রহিত অকৃতজ্ঞ. তা আমি যেন বুঝ্‌তে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি!

রাজা জীবন রায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন :—রাণী-মার এ কথার উত্তর মুসলমান পক্ষ থেকে আমিই দিচ্ছি। মুসলমান স্বার্থপর, মুসলমান কাণ্ডজ্ঞান-রহিত অকৃতজ্ঞ, সে ত মাসিমা, আগে জেনেই গৌড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছ, তবে কেন ভাতুড়ীচক্র-রক্ষার ভার মুসলমানের হস্তে ন্যস্ত করে এসেছ? তোমার একমাত্র সান্ত্বনার ধন অনুপ—তোমার সর্ব্বস্ব যাদের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আসতে পেরেছ, তাদের ত তুমি অবিশ্বাস কর্ত্তে পার না! তারাও তোমাকে অবিশ্বাস করে না। মুসলমান দুনিয়াকে অবিশ্বাস কর্ত্তে পারে, তবু একটাকিয়াকে অবিশ্বাস কর্ব্বে না,—অন্ততঃ, মহাত্মা গণেশনারায়ণের সহধর্ম্মিণী তুমি বর্ত্তমান থাকতে। তাই যদি কর্ত্ত, তা হলে তারা কখনই তোমাকে গৌড় প্রাসাদে বরণ করে আন্‌ত না। তারা তোমার মহিমময়ী মূর্ত্তির সম্মুখে নত হয়েছে বলে তারা ভীরু নয়। তারা মহত্ত্বের সম্মান জানে, তাই তারা তোমার শরণাগত হয়ে তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা কচ্ছে। যদুনারায়ণ মুসলমানধর্ম্ম-গ্রহণ করেছে, তার জন্য মুসলমান দায়ী নয়। সে ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুসলমান হয়েছে। বরং, তারা তার ধর্ম্মান্তরগ্রহণে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। যদি বলো, তারা তাকে আশ্রয় দিলে কেন? তারা তাকে সম্রাটত্ব দিয়ে সম্মানিত কল্লে কেন? স্পষ্ট বল্‌তে কি, সেও তাদের উদারতা। তারা মানুষের মূল্য জানে। মহারাজ নিজেই স্থির করে গিয়েছিলেন,—আজিমসাহের কন্যা আশমানতারার গর্ভজাত সন্তান গৌড়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আশমানতারাই যদুকে পতিত্বে বরণ করেছে। যদু

তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল, এ ভুল কথা। সে সময় প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গোলমাল বাধে। যদু পিতৃবাক্য ও প্রতিনিধিত্ব বা হিন্দুর প্রতিষ্ঠাকে বজায় রাখ্‌বার জন্যই আশমানতারাকে হিন্দুমতে গ্রহণ কত্তে চেষ্টিত হয়। কিন্তু আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে সে ভাবের কোনো বিধান না থাকায় অগত্যা সে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে,—এই হচ্ছে মূল কথা। তোমরা আগে থেকেই মুসলমানকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছ। মহারাজের সময়ে হিন্দু-মুসলমানে জাতিগত পার্থক্য ত প্রায় ছিলো না বল্‌লেই হয়। তিনি ত গৌড়ে মুসলমান, আর পাণ্ডুয়াতে হিন্দুর চাল-চলনে থাক্‌তেন। বাদসা-পরিবারে তোমাদের ঘনিষ্ঠতা কত দূর অগ্রসর হয়েছিল, সে ত তোমার অবিদিত নেই মাসিমা! সুতরাং, এত দিন সব বিষয়ে উদারতা দেখিয়ে, আজ শুধু একটা সমাজের গণ্ডী দিয়ে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে গেলে চল্‌বে কেন? পরস্পরের সংশ্রব-জনিত আদান-প্রদানে হৃদয় যখন হৃদয়ের উপর ঢলে পড়ে, তখন তাকে সামাল্‌ রাখা কত কষ্টকর বলো দেখি? আমরা ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিয়ে সহসা তার রাশ্‌ ধরে এমনি টান টান্‌লাম যে, রাশ্‌ ত ছিঁড়ে গেলোই, ঘোড়াও ছুটে পলায়ন কর্ল্লে! অপরাধের মধ্যে মুসলমান সেই তেজী ঘোড়াটাকে ধরেছে,—যদুকে তারা আশ্রয় দিয়েছে,—আটক করেছে। তা যদি না কর্ত্ত,—তা হলে যদুনারায়ণ,—স্বধর্ম্মত্যাগী, মুসলমানকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দুর্দ্ধর্ষ যদুনারায়ণ কতটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠ্‌ত, তা জানো? আজ এখনো সে সাম্যের উপাসক, কিন্তু উভয় জাতিকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে, সে দারুণ বৈষম্যের করাল মূর্ত্তি ধরে কি অনর্থের সৃষ্টি কর্ত্ত! মুসলমান একটাকিয়াকে অসম্মান করেনি,—সে তার সম্মান-রক্ষাই করেছে। সে শুধু তার বংশধরকে কোলে তুলে নেয়নি,—তাকে মাথার উপর বসিয়েছে!

রাজা অবনীনাথ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ;—বলিহারি জীবন,—বাঃ! তুমিই মুসলমানের নুন সার্থক খাচ্ছ বটে! মুসলমান একটাকিয়ার সম্মান যথার্থই রেখেছে! আর এখন থেকে এই ভাবেই ত তারা হিন্দুর সম্মান রক্ষা কর্বে! জাতি ত এই করেই উৎসন্ন যায়! নিজের বুকে হাত দিয়ে কথা বল্‌তে হয় জীবন! একটাকিয়া সাঁতোড় তোমার পর নয়, তাদের সর্ব্বনাশের কথা একবার স্মরণ করো। জাতীয় মর্য্যাদা ভুলো না জীবন! মুসলমান আজ তোমাদের আভিজাত্যে আঘাত কচ্চে, আর তুমি অবলীলা-ক্রমে সেই মুসলমানকে সমর্থন কচ্ছ! রাণি! মূর্খ আমি, তাই আবার তোমার সাথে গৌড়ে এসেছি। এখনো ফিরে চলো, নচেৎ বৃদ্ধকে বিদায় দেও,—আমি এখানে এই মুসলমান-পদলেহী হিন্দু কুলাঙ্গারদের সংশ্রবে থাক্‌তে চাই না। কাদের কাছে তুমি সুমীমাংসার প্রত্যাশা কচ্ছ রাণি! কোথায় হিন্দুত্বের দাবি কত্তে এসেছ? সেই দিনই বলেছিলাম রাণি! এদের আপ্যায়নে আত্মসমর্পণ কোরো না; আমরা সৈন্য নিয়ে এসেছি যুদ্ধ কর্ত্তে,—আপ্যায়ন নিতে নয়। এরা ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের হস্তগত কত্তে চায়। শেষে এমন ফাঁদে ফেল্‌বে যে, আর রক্ষার উপায় থাকবে না। যা বলেছিলাম, তাই ফল্‌তে চলেছে। সাঁতোড় অনেকদিন থেকে মুসলমানকে চিনেছিল। তুমি ত আমার কথা শুনলে না! এই দেখো, জীবন অবধি বিষাক্ত হয়ে গেছে! তাকে খুব বেশী ভরসা করেছিলে কি না! আর কেন রাণি, পথ দেখো,—ফিরে চলো। বিস্তর সম্মান পেয়েছ, সেই সম্মানের ভরা বোঝাই করে চলন পার হই চলো। সে সম্রাট্ হয়েছে,—মুসলমানের খুব পিয়ারের বাদসা হয়েছে,—জীবন রায়ের মত কত সুন্দর হিন্দুর সহানুভূতি পেয়েছে,—তাকে তুমি কি করে জব্দ কর্ব্বে

রাণি! এখন বাদসা-দত্ত শিরোপা নিয়ে কাঁদ্‌বে চলো রাণি!—তা—ম:
আমার ·

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাজা অবনীনাথ আর বলিতে পারিলেন না, তিনি একটী গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপ্‌ করিলেন। তখন কালীকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতে লাগিলেন ;—

রাজা, অত অস্থির হলে চল্‌বে কেন? এখানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে ত আমরা আসিনি,—আমরা এসেছি, অতীতকে বিসর্জ্জন দিয়ে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটা মীমাংসা কত্তে। সুতরাং প্রতি মন্তব্য আমাদের অতি সংযতভাবে শুনতে হবে। আর কিশোরীর জন্য অত চিন্তা কেন রাজা! সে যে হিন্দুর সাধ্বী মেয়ে! যে হিন্দুর সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী পতিকে উপলক্ষ্য করে নানা প্রকারে পরীক্ষিতা,—সেই হিন্দুর পূত বংশের যে নারী, তার জন্য ভাবনা কি রাজা! এইখানেই তার নারীত্বের বিকাশ, এই তার পরীক্ষা। সে নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হবে,—সাঁতোড় ও ভাদুড়ীচক্রের বংশ-গরিমা আরো উজ্জ্বল করে তুল্‌বে,—কিছুই ভাব্‌তে হবে না। কিন্তু জীবন, এ তোমার কেমন কথা বাপু! মুসলমানকে ভালবাসলে, মুসলমানের সহিত মিশ্‌লে মুসলমান হতে হবে, তার অর্থ কি? যাই করিনা কেন, বৈশিষ্ট্য হারাবো কেন জীবন! তবে কি তুমি বলতে চাও, হিন্দুর বৈশিষ্ট্য কুসংস্কার-সংকীর্ণ অতি অসার একটা কিছু? কত যুগ-যুগান্তর ধরে কত শত তত্ত্বদর্শীর বিচক্ষণতায়, কত শত ভগবদ্ভক্তের একনিষ্ঠ সাধনায়, যে ধর্ম্ম সমাজ বা জাতি জগতের শীর্ষস্থানীয় হয়েছিল, তার সমস্তটাই শুধু অপরিণামদর্শীর খেয়ালে পূর্ণ! তা নয় জীবন?—তা হলে ভুল বুঝেছ তুমি—ও ধারণা ছেড়ে দেও। হিন্দু—হিন্দুই থাকো,—তা তাতে অনুদার যা থাকুক্ না কেন। হিন্দু থেকে হিন্দুত্বের সংস্কার করো। পরধর্ম্মে

আত্মহারা হয়ো না। এইটুকু মনে রেখো,—জগতে সম্পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্ববাদিসম্মত কিছুই নেই,—দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নানা মুনির নানা মত। যে মতে আবাল্য-পরিপুষ্ট, সে মতটাকে সহসা অসমীচীন ভেবে অন্য একটা অসম্যগ্-পরিচিত মতে ভেসে যেয়ো না। তাতে বড় অমঙ্গল হবে। তোমরাই বর্ত্তমান সমাজের আদর্শ,—তোমাদের দেখাদেখি, সেই স্রোতে অনেকেই ভেসে যাবে। এতে শেষ কি দাঁড়াবে জানো জীবন,—একদিন নাস্তিকে দেশ ছারখার দেবে। যাক্,—ও বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সময় এ নয়। এখন আমাদের কথা হচ্ছে—হিন্দুর বৈশিষ্ট্য রক্ষা। যা হওয়ার তা ত হয়েই গেছে। এখন আমরা যে জন্য চিন্তিত হয়েছি, তারই প্রতীকার চাই। হিন্দুর সন্তান হিন্দুর শত্রু,—চিন্তার নয় কি? আমরা হিন্দুর শত্রুকে দমন কত্তে যুদ্ধযাত্রা করেছিলাম। মুসলমানকে বিধ্বস্ত কত্তে আসিনি, আমরা বিধ্বস্ত কত্তে এসেছি তাকে, যে মহোচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করে মুসলমান,—হিন্দুধর্ম্মত্যাগী মুসলমান। আজ যে হিন্দু-সমাজের শত্রু,—কাল সে হিন্দুধর্ম্মের শত্রু হতে পারে। মামুদ সোমনাথ ধ্বংস করেছিল, আলাউদ্দিন আমাদের মাতৃজাতির উপর আক্রমণ করেছিল,—তার তবু সান্ত্বনা আছে,—কেননা, তারা মুসলমান-সন্তান। কিন্তু একি! হিন্দুর সন্তান হিন্দুর মুষলস্বরূপ হবে! এর যে কোনো সান্ত্বনা নেই জীবন! আমরা তা হলে কি চাই এখন বুঝ্‌তে পেরেছ? মা ছেলের বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন, ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু-রমণী সন্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন,—কেন তা বুঝ্‌তে পেরেছ?

অতঃপর তিনি রাণী ত্রিপুরা দেবীকে বলিলেন;—মা! অনর্থক বাক্-বিতণ্ডায় আর প্রয়োজন নেই।

রাণী অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন;—মুসলমানগুলি! আমি

তোমাদের কাছ থেকে শেষ কথা শুন্‌তে চাই। আমি তোমাদের বর্ত্তমান বাদসাকে চাই, তোমরা তাকে আমার হস্তে সমর্পণ কর্ব্বে কি না?

এই তেজঃপূর্ণ উক্তিতে দরবার-গৃহ ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেও, সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে অস্থৈর্য্যের সাড়া পাওয়া যাইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ সেনাপতি কাসেম খাঁ গাত্রোত্থান করিয়া রাণীর সমীপস্থ হইলেন ও অতি বিনম্র বচনে বলিলেন;—মা! সম্রাট্ বর্ত্তমানে এই দাসেরই অতিথি, তিনি দুর্গে আশ্রয়-গ্রহণ করেছেন। আমি কি প্রকারে আশ্রিতের অসম্মান কর্ব্বো? সেনাপতি কাসেম খাঁ আমিও ত আপনার এক অবাধ্য সন্তান, আমি আপনার নিকট আত্মসমর্পণ কর্চ্ছি,—শাস্তি আমাকেই দিন্।

সকলের নেত্র কাসেম খাঁর উপর পতিত হইল। রাণীও আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু তথাপি তিনি বিচলিত হইলেন না, বরং, বিদ্রূপ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন;—সেনাপতি কাসেম খাঁ, এ আজ নূতন শুন্‌লাম যে, গৌড়ের সম্রাট্ আবার তাঁর সেনাপতির আশ্রিত!

কাসেম খাঁ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন;—নূতন সবি ত মা! মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-সম্রাট্ নূতন নয় কি মা? কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের বিরুদ্ধে তেজস্বিনী জননীর অভিযান নূতন নয় কি মা? সুতরাং, সন্ত্রস্ত সম্রাটের দুর্গে সেনাপতির আশ্রয়-গ্রহণ নূতন হবেই বা না কেন?

রাণী বিস্ময়-সূচক কণ্ঠে কহিলেন;—সন্ত্রস্ত সম্রাট্! সহসা এত ত্রাসের হেতু?

কাসেম খাঁ উত্তর দিলেন;—মাতৃরোষ! সম্রাট্ মাতার অভিযানে ভীত হয়েছেন।

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন;—তোমরা এত মহারথী থাকৃতে তাঁর সে ভীতি দূর কর্ত্তে পার্লে না!

পরে একটু হাসিয়া বলিলেন ;—ভীতিরও ত নূতনত্ব দেখ্‌ছি !

কাসেম খাঁ বলিলেন ;—নূতনত্ব কি মা ! যে যথার্থ পুত্র, সে মায়ের ভ্রূকুটীতেই কম্পিত হয়। মায়ের কোশ-কটাক্ষে তার রাজনীতি, রণনীতি সমস্তই ওলোট-পালোট হয়ে যায়। গৌড় হীনবীর্য্য নয়, কাসেম খাঁও দিল্লীশ্বরের আক্রমণ ব্যর্থ কত্তে শক্তিহীন হয়ে পড়েনি আর সেই কাসেম-বিজয়ী অদ্বিতীয় বীর সম্রাট্‌ও অক্ষুণ্ণ-শৌর্য্যই আছেন। কিন্তু মাতার বিরুদ্ধে তাঁর আসৈনিক সমস্ত শক্তি যে পঙ্গুত্ব-প্রাপ্ত হয়েছে ! তাই আজ দুর্জ্জেয় গৌড় আপনার পদতলে হস্ত-স্খলিত-অসি,—আপনার শরণাগত !

রাণী হাসিয়া বলিলেন ;—প্রহেলিকার মত কথা বল্‌ছ কাসেম !

কাসেম খাঁ উত্তর দিলেন ;—প্রহেলিকাই ত মা ! সমস্তই প্রহেলিকা। মাতার স্নেহ-প্রপঞ্চ প্রকাণ্ড প্রহেলিকা। নিতান্ত অবোধ শিশু মাতার স্তন-বৃন্তে কি অমোঘ মন্ত্রপূত মহৌষধি পান করে, মাতার করুণা-মাখানো মুখচ্ছবিতে কি অনির্ব্বচনীয় ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হয় যে, জগতের আর কোনো অনুভূতি তাকে তেমন অভিভূত কত্তে পারে না ! সেই যে সে তার জীবনের আদিযুগ থেকে মাকে আগে চেনে,—মাকেই আগে ডেকে, মাকেই আগে তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরম বস্তু ভেবে নিয়ে বসে, আর কিছুতেই তার সে সংস্কার ত দূর হয় না ! হবে কি করে ? মাতার রক্তে সে দেহের উদ্ভব, মাতার স্তন্যে সে দেহের পুষ্টি, তার প্রতি শিরায় যে মাতৃ-মমত্বের নিত্য-প্রবাহ !

রাণী বলিলেন ;—কাসেম ! সে এক যুগে ছিলো, এ যুগে তার ব্যতিক্রম ঘট্‌তে আরম্ভ হয়েছে।

কাসেম খাঁ বলিলেন ;—চির যুগ থাকবে মা ! যেখানেই না করুণা-

ময়ী, সন্তানকে বুকে করে সার্থক স্তন্যদান করেন, সেখানেই সন্তানের চির-কৃতজ্ঞতার অসদ্ভাব হয় না।

রাণী আবার গম্ভীর হইলেন। বলিলেন ;—কাসেম খাঁ! জানো তুমি কাকে কি বল্‌ছ?

কাসেম খাঁ বলিলেন ;—জানি—জানি বলেই বল্‌ছি। মা! কাসেম খাঁ তোমাকে ভয় করে না,—সে যে আত্মসমর্পণ করে শাস্তি গ্রহণ কত্তে প্রস্তুত হয়েছে! সে আজ নির্ভয়ে সমস্ত কথা খুলে বল্‌বে। মা! অসাধারণ পুত্র তোমার,—যোগ্য মায়ের যোগ্য পুত্র।

রাণী চঞ্চল হইলেন।

কাসেম খাঁ বলিয়া যাইতে লাগিলেন ;—প্রবৃত্তির দাস নয়,—কর্ত্তব্যের ক্রীতদাস ; কর্ত্তব্যের আহ্বানে শত বন্ধন ছিন্ন করে, মায়ের কোল ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। চঞ্চল হয়ো না মা! শুধু নামের পরিবর্ত্তন হয়েছে মাত্র, প্রাণ ঠিক তেমনি আছে। বরং, সে প্রাণ আরো বিশাল হয়ে পড়েছে। কাসেম—এই পাষণ্ড কাসেম একদিন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো। আশমানতারা এই কাসেম খাঁরই কাঙ্ক্ষিত ছিলো,—বুঝে দেখো, কত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সে আমার। কিন্তু পুত্র তোমার সে দ্বন্দ্বিতার মীমাংসা কি করে কল্লে জান?—শত্রু কাসেমের নিকট বন্দীত্ব স্বীকার করে! প্রেমের যাদুকর পুত্র তোমার মা,—তাকে সামান্য ভেবো না।

রাণী আবার ব্যঙ্গের সহিত বলিলেন ;—মুসলমানের স্বজাতি-প্রীতি প্রশংসনীয়,—কিন্তু এ ভাবের পক্ষপাতিত্ব অতিরঞ্জিত হয়ে পড়েছে। এতটা অন্ধ হওয়া ভাল নয় কাসেম খাঁ!

কাসেম খাঁ বলিলেন ;—এর সহিত স্বজাতি-প্রীতিতে অন্ধ হওয়ার কোনো সম্পর্কই নেই মা! আমি কিছুই অতিশয়োক্তি কচ্ছি না,—যা

সত্য তাই বল্‌ছি। মুসলমান তাঁকে মসনদ দিয়ে একটুও নিশ্চিন্ত হতে পারে নি! আপনার অভিযান উপলক্ষ্য করে তারা সম্রাটের উপর বিশ্বাস একেবারে হারিয়ে বসেছিল। গৌড়ের মুসলমান-সৈন্য তাঁর অজ্ঞাতে সজ্জিত হয়ে তোমার গতিরোধ কত্তে উদ্যত হয়েছিল। এমন কি, সম্রাট্ ছদ্মবেশী হিন্দু, এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা পর্য্যন্ত করেছিল। কিন্তু কি অদ্ভুত আত্মরক্ষা! কি অভাবনীয় আত্মবিসর্জ্জন! সব ষড়যন্ত্র ভেসে গেলো,—উত্তেজিত বিদ্রোহী মন্ত্রস্পৃষ্ট সর্পের ন্যায় বশীভূত হলো,—অস্ত্র প্রতিহত হলো,—লৌহ-শৃঙ্খল পুষ্প-মালো পরিণত হলো! মা! সম্রাট্‌ই তোমার গৌরব রক্ষা করেছেন,—তাঁরই অনুজ্ঞায় তোমাকে সম্বর্দ্ধনা কর্ব্বার এ অপূর্ব্ব বন্দোবস্ত হয়েছে, তিনিই তোমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন কর্ব্বার জন্য সমস্ত গৌড়কে তোমার অনুগ্রহের পদতলে উপঢৌকন দিয়েছেন। মুসলমান ত শুধু তাঁর প্রতিভোজ্জ্বল প্রীতির দীপ-বর্ত্তিকা অনুসরণ করে চলেছে মাত্র! তোমাকে তিনি তাঁর সমস্ত অধিকার বিনাযুদ্ধে ত্যাগ করে, তোমার রোষাগ্নি-নিবৃত্তির জন্যই আজ দুর্গে পলায়িত। মা! সমস্ত গৌড় আজ তোমার শরণাগত। তারা তাদের সম্রাট্‌কে ভিক্ষা চাইছে, শুধু সম্রাটের জন্য সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে তোমার ক্ষমাই আজ তাদের একমাত্র আকিঞ্চন।

রাণী নির্ব্বাক্। রাজা অবনীনাথের হৃদয়ও যেন কতকটা প্রসন্ন বলিয়া বোধ হইল। ক্ষণকাল সভাতল একেবারে নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—বুঝ্‌তে পেরেছি,—স্নেহের রাজ্যে লুণ্ঠন আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু বল্‌তে পারো কাসেম খাঁ,—এই ক্ষমার বিনিময়ে হিন্দুর প্রাপ্য কি?

কাসেম খাঁ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন;—হিন্দুর প্রাপ্য?—মুসলমানের

জান্ !! আজ আমি শপথ করে বল্‌ছি,—যদি বাদসা জালালুদ্দিনের রাজত্ব-কালে সেনাপতি কাসেম খাঁ জীবিত থাকতে হিন্দু জাতি ধর্ম্ম বা সমাজের উপর মুসলমানকর্ত্তৃক কোনো অযথা নির্য্যাতন হয়,—কাসেম খাঁ তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। আপনারা নিশ্চিত হোন্,—এ রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই, এর কোনো অন্যথা হবে না।

তাহার পর তিনি রাজা জীবন রায়কে ডাকিয়া বলিলেন;—দেওয়ানজী, আসুন, আপনি হিন্দু, সাঁতোড় ও একটাকিয়ার নিকট আত্মীয়, আপনিই এ সন্ধিপত্র পাঠ করুন্। সম্রাট্ স্বহস্তে এই সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করে, আর—আর নিজ বুকের রক্তে পাঞ্জাদ্বারা এই অভিনব সন্ধিপত্র চিহ্নিত করে আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন,—এই নিন—

এই বলিয়া কাসেমখাঁ তাঁহার পরিচ্ছদের অভ্যন্তর হইতে সন্ধিপত্র বাহির করিয়া সমীপাগত রাজা জীবনরায়ের হস্তে দিলেন। রাজা পাঠ করিলেন;—

আমার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ হিন্দু-মুসলমানে সাম্য-প্রতিষ্ঠার জন্য,—সাম্য-প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি গৌড়ের শাসন-দণ্ড নিজ হস্তে ধারণ করিয়াছি। মহিমময়ী জননীর স্নেহাঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কুলপতি শ্বশুর মহাশয়কে নিদারুণভাবে মনঃক্ষুণ্ণ করিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীর অমূল্য আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, পতিগত-প্রাণা সতীর বুকে শেলবিদ্ধ করিয়া ও একমাত্র পুত্রকে অঙ্ক হইতে দূরে ফেলিয়া, আমি এই বিঘ্ন-বহুল কর্ত্তব্য-কঠোর দায়িত্ব-ভার স্কন্ধে লইয়াছি। উদ্দেশ্য জাতি-বিদ্বেষের সমাধান, হিন্দু-মুসলমানের একপ্রাণতা-সাধন, হিন্দু-মুসলমানের মিলন। হিন্দুর রক্তে আমার জন্ম, সুতরাং আমি হিন্দু; মুসলমান-ধর্ম্মে আমি দীক্ষিত, সুতরাং আমি মুসলমান। কোনও জাতি আমার পর নয় এবং

যতদিন জীবনধারণ করিব, ততদিন কোনও জাতি আমার পর হইবে না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।

আমার অবাধ্যতায়, ধর্ম্মপ্রাণা তেজস্বিনী অভিমানিনী জননী আমার গৌড়-অভিযান করিয়াছেন। তাঁহার অভিমান প্রশান্তির উদ্দেশ্যে, আমি হতভাগ্য সন্তান, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যাহা কিছু কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি, তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সমগ্র গৌড়কে আমি তাঁহার প্রসন্নতা-ভিক্ষার জন্য একযোগে নিয়োজিত করিয়াছি, সমগ্র গৌড়ও আমার প্রতিভূ-স্বরূপ তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আমাকে দুশ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছে। আমাকে তাঁহার রুচি-বিগর্হিত অবস্থায় দর্শন করিয়া, যদি তাঁহার হৃদয় আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, পাছে তাঁহার অভিমান প্রশমিত না হইয়া, অধিকতর অনর্থপাতের সৃষ্টি করে, এই ভয়ে আমি তাঁহার অতি হতভাগ্য সন্তান, তাহার পদলগ্ন হইতে সাহসী হইলাম না। দূর হইতে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়া, অতি কাতর চিত্তে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতেছি।

সন্তানের উপর মাতার জন্ম শাশ্বত, স্বতঃসিদ্ধ, সর্ব্ববাদিসম্মত। তাহা হইলেও, মাতার এই গৌড়-অভিযান উপলক্ষ্য করিয়া, আমার একটী স্বীকারোক্তি প্রয়োজন হইয়াছে। আমার স্নেহের অনুপনারায়ণের জন্যই আমার এই স্বীকারোক্তি। ধর্ম্মান্তর গ্রহণে হিন্দু-শাস্ত্রমতে ভাদুড়ীচক্রের উপর আমার কোনও স্বত্ব নাই, ভাদুড়ীচক্র এখন অনুপের। আজ হইতে আমি ভাদুড়ীচক্রের স্বাধীনতা স্বীকার করিলাম। আমার মাতৃদেবীর পদ-প্রান্তে নিবেদন,—তিনি সপ্তদুর্গায় প্রত্যাবর্ত্তন করুন্। তাঁহার বিজয়-চিহ্ন-স্বরূপ গৌড়ের রাজকোষ উন্মুক্ত রহিল, তিনি তাহা হইতে যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া ভাদুড়ীচক্রের সমৃদ্ধি-সাধন করুন্ এবং অবিলম্বে ভাদুড়ীচক্রের

রাজগদীতে অনুপকে বসাইয়া সান্ত্বনা লাভ করুন্। আর আশীর্ব্বাদ করুন,—যেন আমার উদ্দেশ্য সার্থক হয়, যেন আমার এই সাম্যের সাধনায় আর কোনও প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত না হয়।

আমার মাতা-পত্নি-পুত্র, আমার শশুর ও পুরোহিত মহাশয় এবং আমার স্বজাতি সমস্ত হিন্দু প্রত্যেকের নিকট আমার এই শেষ অনুরোধ,—তাঁহারা যেন একদণ্ডের জন্যও না ভাবেন,—যদুনারায়ণ তাঁহাদের আর নাই,—যদুনারায়ণ মরিয়াছে, ভাবিবেন,—**যদুনারায়ণই জালালুদ্দিন এবং জালালুদ্দিনই যদুনারায়ণ।**

পাঠ সমাপ্ত হইল। কক্ষতল নিস্তব্ধ। রাণীর চক্ষে অশ্রু। ভট্টাচার্য্য মহাশয় করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া মৌন রহিলেন। রাজা অবনীনাথ একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

দরবার ভঙ্গ হইল।

উপসংহার।

১

অনেক দিনের পর সপ্তদুর্গায় আবার উৎসবের বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। একযোগে দুই উৎসব,—অনুপনারায়ণের রাজ্যাভিষেক ও বিবাহ। রাণী ত্রিপুরাদেবীর বহুদিনের আশা আজ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। তিনি আজ যেন জোর করিয়া যদুনারায়ণের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, প্রাণাধিক অনুপকে তাঁহার সর্ব্ব-সুখ-সান্ত্বনার নিদান করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্নেহ-রাজ্যে অনুপের একচ্ছত্র অধিপতিত্ব, যদুনারায়ণের জন্য আর এক সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও অবশিষ্ট নাই! রাণী বড় ব্যস্ত;—তাঁহার অন্য চিন্তার অবসর প্রায় নাই;—এমন কি, স্নানাহ্নিক, আহার, নিদ্রা প্রভৃতিতেও তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিতার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে।

উৎসবের মাসাধিক পূর্ব্ব হইতে সপ্তদুর্গায় দেশ-দেশান্তরের নানা যানসাহায্যে বিবিধ দ্রব্যসম্ভার, আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, শিল্পি-সূত্রধর-ভাস্কর, দাস-দাসী, অতিথি-অভ্যাগত, কাঙ্গাল-ভিক্ষুক প্রভৃতি আসিয়া, ভাদুড়ীবংশের বিশাল সৌধ ও তদুপকণ্ঠস্থ নবনির্ম্মিত অধিষ্ঠান-গৃহ পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সপ্তদুর্গার ও তৎসান্নিধ্যের অধিবাসিগণ মাসাধিক পূর্ব্ব হইতেই রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রিত

হইয়াছে। মুসলমানগণ স্বতন্ত্র স্থানে যথোপযোগী আহার্য্যে পরিতুষ্ট হইতেছে। দিবারাত্র পুণ্যানুষ্ঠান চলিয়াছে। কুমারের মঙ্গলকামনায় মন্দিরে ও মসজিদে নানাবিধ উপচারে পূজা ও বন্দনাদির নিত্য ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের সমস্ত অধ্যাপক ও পণ্ডিত-মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়াছেন,—সমস্ত স্বাধীন নরপতিকেও যথাযোগ্য সম্মানের সহিত নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরিত হইয়াছে।

পুত্র অনুপের রাজ্যাভিষেক,—একমাত্র বংশদুলালের বিবাহ,—আজ জননী নবকিশোরীর কত আনন্দের দিন! কিন্তু সে আনন্দ কোথায়? এ যে হরিষে বিষাদ,—অথবা এ যে বিষাদের আনন্দ! এ আনন্দে কিশোরীর কোনও সুখ নাই,—আছে অশান্তি,—দারুণ অশান্তি। অতি-কৃশা, লাবণ্যের ভগ্নাবশেষ-স্বরূপিণী বিষাদিনী আজ রাজমাতা হইতে চলিয়াছে,—জোর করিয়া আজ তাহাকে হাসিতে হইবে,—চক্ষের জল চক্ষে লুকাইয়া, আজ তাহাকে এই আনন্দে বিশেষভাবে যোগদান করিতে হইবে। যে-সে কর্ত্তব্য নয়,—মাতার কর্ত্তব্য। সে নীরবে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতেছে বটে, কিন্তু অব্যক্ত মর্ম্ম-যাতনায় তাহার ক্ষীণ দেহখানি অত্যধিক আকর্ষণে ধনুর ন্যায়ই ক্রমশঃ নুইয়া পড়িতেছে। আজ কয়দিন তাহার জ্বর-বোধ হইতেছে,—সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই;—কাহারও বুঝি পূর্ণ লক্ষ্য নাই! কে আর লক্ষ্য করিবে? একমাত্র কন্যার অস্বাভাবিক বৈধব্যে মর্ম্মাহত রাজা অবনীনাথ আজ বৎসরাধিক কাল ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। রাণী ত্রিপুরাদেবী,—তাহার শ্বশ্রূমাতা, বার্দ্ধক্যেও রাজকার্য্যে লিপ্তা,—অনুপের জন্য তাঁহাকে পরকালের চিন্তা অবধি দূরে ঠেলিয়া রাখিতে হইয়াছে,—অন্যপক্ষে কা কথা!

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অরুন্তুদ মনঃকষ্টে কিশোরীর শরীর আজ যেন আরও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আজ যেন জ্বরের প্রকোপ একটু বেশী বলিয়া বোধ হইতেছে। দ্বিপ্রহরের খর-রৌদ্রে জগৎ ঝল্‌সাইয়া যাইতেছিল,—সূর্য্যদেব যেন অগ্ন্যুৎসব আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই দারুণ গ্রীষ্মে গাত্রদাহে ও অন্তর্দ্দাহে কিশোরী তাহার প্রকোষ্ঠতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। অনুপ কাছে নাই,—রাণী স্বীয় বিশ্রাম-কক্ষে কিছুক্ষণের জন্য ক্লান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে শায়িতা ছিলেন। দুইজন দাসী কিশোরীর পরিচর্য্যা করিতেছিল। কিন্তু আজ তাহাদের পরিচর্য্যা তাহার একেবারেই ভাল লাগিতেছিল না,—কিশোরী তাহাদিগকে বিশ্রাম-লাভের জন্য বিদায় দিয়াছিল। কক্ষ নির্জ্জন,—শব্দশূন্য, কিন্তু তাহার দেহ-মন সৈন্য-সামন্ত লইয়া দিকে দিকে বিদ্রোহ বাণী প্রচার করিতেছিল।

যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কিশোরী বলিতেছিল ;—ছার দেহ,—ছাই হয়ে গেলে বাঁচি,—ক্ষয় যেন হয়েও হয় না! এ দুঃসহ যন্ত্রণা কবে শেষ হবে? বাবা, আমাকে ডেকে নেও গো,—কোথা তুমি,—এসো,—এসে নিয়ে যাও,—মা আমার আয় বলে, হাত ধরে নিয়ে যাও বাবা!

কিশোরী কি ভাবিল,—ভাবিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল ;—না বাবা,—এখন নয়,—আর দুদিন পরে। অনুপ আমার রাজা হবে,—স্বাধীন রাজা হয়ে রাজপাটে বস্‌বে,—অনুপের বিয়ে যে গো!—আমি এখন যাব কোথা? আমার যাওয়া হবে না,—এখন আমি যেতে পার্ব্বো না। হা—বউমা,—মা আমার এসো,—এসো মা এসো। অনুপের সাথে তোকে একবার বুকে করি,—আয় বুক-জুড়ানো ধন আয় মা!

বুক জুড়িয়ে যাবে,—এই ছাই-হওয়া বুক নাকি জুড়িয়ে যাবে! পুড়ে ছাই হয়ে গেলে তার উপর জল ঢাল্‌লে কি হয়? ছাইগুলো ধুয়ে ভেসে যায়। থাকে কি?—যেটা পুড়ে গেল সেটার থাকে কি? কিছুই না। হা-হা! তা হলে ত খুব জুড়িয়ে যাবে! যাক্, তাই যাক্,—শ্মশান ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাক্। আগুন জ্বল্‌ছে,—সব পুড়িয়ে তবু জ্বল্‌ছে। হাহাকারে স্তূপের পর স্তূপ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছে,—শিখা ভর করে ছাই—ছাই—ছাই শুধুই ছাই-ভস্ম—আবর্জ্জনা। কি সে? কিসের ছাই সে? স্মৃতির—আমার আরাধ্যের স্মৃতির। কিশোরি! একেবারে দফা-রফা হয়েছে তোমার! তুমি কার স্মৃতিকে আবর্জ্জনা বল্‌ছ? ছি ছি! স্মৃতি পুড়ে ছাই হয়? স্মৃতির ছাই ছাই নয়—আবর্জ্জনা নয় ত! সে যে বিভূতি!—তোমার সাধনার উপাদানকে তুমি স্বেচ্ছায় ফেলে দিতে চাইছ! এত অধঃপাতে গিয়েছ তুমি!

এই বলিয়া কিশোরী ক্ষণকাল চুপ্ করিল,—পরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল;—

অনুপ রাজা হবে,—আমি রাজমাতা হবো। বেশ মনে পড়ে,—সেই সে দিনের কথা। যুদ্ধ-যাত্রী তুমি। আমার প্রাণ জেনেছিল,—তুমি সেইদিনই তোমার কিশোরীকে চিরতরে ছেড়ে চলেছ। আমি কাতর হয়ে তোমাকে বাধা দিতে ব্যর্থচেষ্টা করেছিলাম। তুমি মায়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে মিষ্ট ভৎর্সনায় আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলে,—কিশোরি, তুমিও ত রাজমাতা হতে চলেছ! আমি তাতে গর্ব্ব করে বলেছিলাম,—প্রভু, মার্জ্জনা করো, আমি বুঝ্‌তে পারিনি, ভাবী রাজমহিষীর,—ভাবী রাজমাতার সাধারণ নারীর ন্যায় শুধু দৈবকে আঁকড়ে থাক্‌লে

চল্‌বে না,-তাকে নারীত্বের সাথে বীরত্বের মিলন করে নিতে হবে। এই আমি ধৈর্য্য ধর্‌লাম;—অশ্রু-নিষেকে তোমার গৌরবের পথ,—আমাদের ভাবী বংশধরের উচ্চাদর্শের পথ পিচ্ছিল কর্ত্তে চাই না। দাও,—তোমার পদধুলির সহিত তোমার অমিত বীর্য্যের কিছু তোমার অর্দ্ধাঙ্গিণী সহধর্ম্মিণীর সীমন্তে ছড়িয়ে দিয়ে যাও,-সে আর কিছুই চায় না। তখন অনুপ কোথায়? হায়! আজ আমি সত্য-সত্যই সেই রাজমাতা হতে চলেছি,—তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে চলেছে। কিন্তু এ কি সফলতা!

দুই বিন্দু অশ্রু কিশোরীর শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল;—

তা হোক্—তাই হোক! তোমার সেই অমিত বীর্য্যের অংশ-ভাগিনী আমি,—আমি ঐ বিজয়-বার্ত্তায় গরিমোজ্জ্বল মুখচ্ছবি নিয়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হতে খুবই উৎসুক। নবকিশোরা আজ রাজ-মাতা—আর তুমি?—গৌড়-সম্রাট্! তুমি,—তুমি কিশোরারও কেউ নও,—অনুপেরও কেউ নও,—তুমি গৌড়-সম্রাট্! তা বেশ! অনুপ রাজা হবে,—অনুপের বিয়ে হবে,—আনন্দ তোমার নয়,—সে আনন্দ সমস্তটুকু কিশোরার প্রাপ্য! তবে তোমার সহিত একটু সংশ্রব আছে, তুমি যে অনুপকে স্বাধীনতা দিয়েছ! অনুপের ঠাকু-মা,—তোমার কেউ নয়, অনুপের ঠাকু-মা, তুমি গৌড়সম্রাট্-তোমার বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন,. তাই তুমি তার স্বাধীনতা স্বীকার করেছ। শুনেছি, সব শুনেছি, বীরত্ব ত তোমার কিছুই শুন্‌তে বাকি নেই! অনুপের ঠাকু-মার ভয়ে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ গৌড়-সম্রাট্ তুমি দুর্গে পালিয়েছিলে, অনুপের ঠাকুমাকে সন্তুষ্ট কর্ব্বার জন্য সমস্ত

গৌড় তাঁর সম্বর্দ্ধনায় নিয়োগ করিয়েছিলে, শেষে গৌড়-ভাণ্ডার শূন্য করে, অনুপের স্বাধীনতা তার ঠাকু-মার হস্তেই পাঠিয়েছ। সব জেনেছি, সব শুনেছি, বিভোর হয়ে, তন্ময় হয়ে সব শুনেছি,—শুনে অবিরল অশ্রুপাত করেছি, কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি,—যেন সীমাহীন অগাধ সমুদ্রে শুধুই সাঁতার দিয়েছি, তীর খুঁজে পাইনি! ওঃ আশমান্! সত্যই তুই আশমান,—নতুবা এ বিশালতার ঠাঁই হবে কেন? তোকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়, কত বড় তুই! একবার দেখা দিবি?

এই অবধি বলিয়া সে যেন আবার কি ভাবিয়া লইল এবং সহসা বলিয়া উঠিল;—

না—না ভাল কথা নয়। তুমি অনুপের গৌরব-বৃদ্ধি করেছ,—সেজন্য আমার ত একটা কর্ত্তব্য আছে! অনুপের রাজ্যাভিষেক,—অনুপের বিয়ে, তোমাকে নিমন্ত্রণ কত্তে হবে, গৌড়সম্রাট্ তুমি,—তোমাকে নিমন্ত্রণ না কল্লে ভাল দেখায় কি? রাজমাতা আমি,—আমিই তোমাকে নিমন্ত্রণ-পত্র দেবো। আমিই ত স্বাধীন সপ্তদুর্গার ভাবী নরপতির জননী, আর তুমি গৌড়-সম্রাট্, তোমাকে পত্র লিখ্‌বার অধিকারী আমি! এখনি লিখ্‌তে হবে, বিশেষ বন্দোবস্ত করে আজই পত্র পাঠাতে হবে। উৎসবের আর মাত্র কটা দিন বাকি, আর দেরী নয়—

এই বলিয়া পাগলিনী গাত্রোত্থান করিল ও অবিলম্বে লেখনী, মস্যাধার ও ভূর্জ্জপত্র লইয়া লিখিতে বসিল;—

অনন্তমহিমনিলয় গৌড়েশ্বর,—

আগামী····· ও······তারিখে স্বর্গত মহারাজ গণেশনারায়ণ শর্ম্ম-খাঁ

মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ অনুপনারায়ণের শুভ-বিবাহ ও স্বাধীন ভাদুড়ী-রাজ্যে পুণ্যাভিষেক যথাযোগ্য অনুষ্ঠানে সম্পন্ন হইবে। তদুপলক্ষে স-বেগমসাহেবা আপনার ভাদুড়ীচক্রে উপস্থিতি, উৎসবের সৌষ্ঠব-সাধন ও ভাবী রাজদম্পতির মঙ্গল-কামনা একান্ত প্রার্থনীয়।

পিতৃনামে পুত্র-পরিচয়ই রীতি। এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেও পিতৃনির্দ্দেশের অসুবিধা হইবে কি? পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ,—সে জন্য ত্রুটী স্বীকার,—বোধ হয় অনাবশ্যক,—ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। বেগম-সাহেবাকে সঙ্গে আনিবেন, যেহেতু, ভাবী রাজদম্পতির মিলন-ব্যাপারে সম্রাট্ দম্পতির শুভাগমন অধিকতর আনন্দের হইবে। ইতি—

আজ্ঞাধীনা,—ভাবীরাজমাতা
নবকিশোরী দেবী।

লেখা শেষ হইলে কিশোরী তদ্গতচিত্তে পত্রখানি পাঠ করিতেছিল, এমন সময় চক্ষু মুছিতে মুছিতে রাণী ত্রিপুরাদেবী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ওমা, আমার মায়ের কাছে কেউ নেই! দাসীরা কোথা গেল?—এই বলিয়া রাণী ধীরে ধীরে কিশোরীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন ও তাহার ললাট-স্পর্শ করিয়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন;—মা, আজ জ্বরটা খুব বেশী হয়েছে যে!

কিশোরী তদবস্থ থাকিয়া শুধু বলিল;—হুঁ!

আমি এত বারণ কচ্চি, তোমায় কিছু কত্তে হবে না, তা ত তুমি শুন্‌বে না! আমি নিজে যখন সব দেখ্‌ছি শুন্‌ছি, তখন তোমার অত পরিশ্রমের দরকার কি? দেখ দেখি আজ জ্বরটা হঠাৎ খুব বেড়ে গেল!

অসুখ করেছে, চুপ করে শুয়ে থাক্‌বে,—না বসে বসে কি কচ্ছ—আমার মাথা আর মুণ্ডু! আর এরাই বা গেলো কোথা!

এই বলিয়া রাণী নিজে পাখা লইয়া কিশোরীকে বাতাস দিতে দিতে পুনরায় সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন;—চিঠি লিখ্‌ছিস্? কাকে কি চিঠি লিখ্‌ছিস্ মা!

কিশোরী কি ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণ অপলকনেত্রে রাণীর পানে চাহিয়া বলিল;—গৌড়েশ্বরকে নিমন্ত্রণ-পত্র দিচ্ছি।

রাণী চমকিয়া উঠিলেন, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—কাকে?

কিশোরী বলিল;—গৌড়েশ্বরকে।

রাণী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন;—গৌড়েশ্বরকে!

কিশোরী গম্ভীরভাবে বলিল;—হাঁ মা,—ছেলের বিয়ে—রাজ্যাভিষেক, আমি নিমন্ত্রণ-পত্র দেবো না? গৌড়ের বাদসাকে আমিই ত পত্র দেবো! এই শোনো না লিখেছি—

এই বলিয়া কিশোরী চিঠিখানির আদ্যোপান্ত পড়িয়া শ্বশ্রূমাতাকে শুনাইল। পরে বলিল;—ঠিক লেখা হয় নি মা!

আজকাল পতি-বিরহ-বিধুরা, পিতৃশোকাতুরা কিশোরীকে রাণী কিছুই বলিতেন না। বিশেষতঃ, তাহার ক্ষীয়মান দেহখানির উপর তাঁহার ভরসা যেন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল। কষ্টসহ ব্রহ্মচর্য্যে, অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার প্রাণের বস্তুটি কীটদষ্ট কুসুমের মতই ধীরে ধীরে যতই শুকাইয়া পড়িতেছিল, তিনি ততই যেন অতি সন্তর্পণে তাহাকে বক্ষোবাসের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন! অন্য সময় হইলে হয়ত তিনি পত্রের অসঙ্গতি প্রকাশ করিতেন, আজ আর তাঁহার সে ইচ্ছা

ছিল না। কিশোরীর অবস্থা বুঝিয়া তিনি উত্তর দিলেন ;—হাঁ মা, পত্র ঠিক লেখাই হয়েছে।

কিশোরী আব্‌দার ধরিল ;—আজই এ পত্র গৌড়ে পাঠাতে হবে মা!

রাণী প্রবোধ দিলেন ;—আজই পত্র পাঠানর ঠিক কচ্ছি।

কিশোরী পুনরায় বলিল ; —ঠিকত আজই—এখনি?

রাণী বলিলেন ;—সেজন্য চিন্তা কি? এখনি পাঠাচ্ছি। তুমি একটু সুস্থ হও দেখি। তোমার মুখ দেখে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে যে মা!

কিশোরী শ্বশ্রূমাতার বুকে মাথা রাখিয়া বিষাদমাখা হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল ,—কেন মা! ভয় কি?

রাণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন ; বলিলেন ;—ভয় আর কি মা। ভয় আমার ভাগ্যের, আমার ত মরণ হবে না!

কিশোরী সোজা হইয়া বসিয়া বলিল ,—তা হলে অনুপকে আমার কে দেখ্‌বে মা!

এমন সময় ফুল্ল গোলাপটীর মত কিশোর অনুপ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। রাণী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন ;—অনুপ ভাই! দেখ্‌ দেখি, আজ যেন মা আমাদের বড় কাতর হয়ে পড়েছে।

অনুপের মুখকান্তি ম্লান হইল। সে তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ের কাছে নতজানু হইয়া মায়ের গাত্রস্পর্শ করিল। পরে উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল ;—এত করে বল্‌ছি—মা একটু ওষুধ খাও,—মা তা কিছুতেই শুনবে না। কি করি বলো ঠাকু-মা! কবিরাজ মশাইকে এখনি ডেকে পাঠাচ্ছি। না হয়, নিজেই যাই—কেমন ঠাকু-মা!

কিশোরী হাসিতে হাসিতে বলিল ; —পাগ্‌লা ছেলে! কাকেও ডাক্‌তে

হবেনা, ও আপনি সেরে যাবে। তুই বরং এই কাজটা কর্,—নিজে যা—এই পত্রখানা এখনি গৌড়ে পাঠানর বন্দোবস্ত করে আয়।

কিশোরী পত্রখানি পুত্রের হাতে দিল। অনুপ পত্রখানি পড়িতে পড়িতে লাল হইয়া উঠিল। রাণী তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন;—যাও অনুপ, এখনি পত্রখানা সেনাপতি এনায়েৎ খাঁর মারফৎ গৌড়ে রওনা করো। আর কবিরাজ মশাইকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এসো।

অনুপ চলিয়া গেল। রাণী তখনও বসিয়া কিশোরীকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তখন বেলা পড়িয়াছে। কিশোরীও অনেকটা শান্ত হইয়াছে।

২

চারি বৎসর হইল, গৌড়ের ভাবী সম্রাট্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই দুগ্ধপোষ্য মানবকটীর অখণ্ড প্রতাপে আশমানতারা প্রায়ই আশমান দেখিতেছে! শিশু-সম্রাট্ বড় দুর্দ্দমনীয় হইয়াছে। তাহার সন্তুষ্টি-সাধনের জন্য সমগ্র গৌড়-প্রাসাদ শশব্যস্ত। এমন কি, সেনাপতি কাসেম-খাঁ অবধি তাঁহার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন! কেবল একমাত্র সম্রাট্‌কে দেখিলে তাঁহার প্রচণ্ডত্ব কেমন বিমূঢ় হইয়া পড়ে! তিনি তখন অতি সুশীল বালকের মত তাঁহার পার্শ্বে গিয়া, কখন্ বা তাঁহার অঙ্ক-ব্যূহে প্রবেশ করিয়া শান্তভাবে অবস্থান করেন। আশ্চর্য্য! শিশু ভয়ানক দুষ্টামি করিতেছে, এমন সময় "ঐ বাদসা আস্‌ছেন" বলিলেই সেই সমীর-চঞ্চল পুষ্পদাম সহসাই শিশির-ভারাবনত সৌম্য-সৌন্দর্য্য ধারণ করে! ভয় কাহাকে বলে শিশু তাহা জানে না, সম্রাট্‌কেও সে ভয় করে না,—অথচ তাহার মধ্যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উন্মেষ হয় যাহা তাহার সেই বীচি-বিহ্বল চিত্তকে নিস্তরঙ্গ করিয়া তুলে!

আজও সে তাহার মায়ের উপর ভারি উপদ্রব করিতেছিল। সে আশমানের নিতম্বলম্বী বেণীটি ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছিল। আশমান সেই আনন্দোচ্ছল অত্যাচারীকে কখন্ বা বাহুপাশবদ্ধ করিয়া, চুম্বনে উৎপীড়িত করিবার জন্য ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, কখন্ বা বেদনা-মধুর হাস্যের সহিত সুন্দর মুখখানি পশ্চাদ্ভাগে হেলাইয়া, নিতান্ত

নিরুপায় ভাবে প্রিয় আততায়ীর বাঞ্ছিত নির্য্যাতন সহ্য করিতেছিল। বালক হাসিতেছিল, নাচিতেছিল, কখন্ বা বেণীটী দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া বিজয়-গর্ব্বে কক্ষময় ভ্রমণ করিতেছিল।

এমন সময় সম্রাট্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শিশু প্রথমে তাহা দেখিতে পায় নাই। সহসা মাতার স্তম্ভিত চরণ ও উচ্চ হাস্যধ্বনি কেমন যেন তাহার ক্ষমতাকে বিদ্রূপ করিতেই, সে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল,—আর ধীরে ধীরে বেণীটী ছাড়িয়া অতি অপ্রতিভ ভাবে মাতার জানু দুইটী ক্ষুদ্র বাহুদ্বারা পশ্চাতে বেড়িয়া সম্রাটের পানে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আশমান হাসিতে হাসিতে পুত্রকে কোলে লইয়া, তাহার অরুণ-গণ্ডে একটী চুম্ব দিয়া বলিল ;—কেমন—জব্দ !

সম্রাট্ও ঈষৎ হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—কে জব্দ আশমান্ !—তুমি না তোমার আমেদ ?

আশমান হাসিতে হাসিতে বলিল ;—আমি জব্দ হতে যাবো কেন ? আমি ত আমার রক্ষাকর্ত্তার আশ্রয়ে,—আমার আবার ভয় কি ?

সম্রাট্ বলিলেন ;—সেও আজ যে আশ্রয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, সে আশ্রয় তোমার আশ্রয় অপেক্ষাও নিরাপদ।

আশমান উত্তর দিল ;—সে ত ভুল করেছে। সে যে আশ্রয় নিয়েছে, নিরাপদ হলেও সে আশ্রয় আমার-নেওয়া আশ্রয়ের অধীন। সে অধীনের অধীনতা স্বীকার করেছে। তার উচিত ছিলো—

আশমান আমেদকে সম্রাটের বুকে দিতে দিতে বলিল ;—এই আশ্রয়ে আশ্রয় নেওয়া—যাতে সে সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় হতে পারত। সে বোকা !

সম্রাট্ আমেদকে বুকে লইয়া বলিলেন ;—সে বোকা নয়, বুদ্ধিমান্। দুর্ভেদ্য জেনেই সে প্রথমে তার প্রধান আশ্রয় অধিকার করেছে, তাকে

হঠানো বড় কঠিন। আজ বোকা ত তুমি আশমান,—তুমি স্বেচ্ছায় তাকে তোমার আশ্রয়টুকু ছেড়ে দিলে!

আশমান বলিল ;—সে আশ্রয়—টুকু নয়, সে বিশ্বজোড়া আশ্রয়,—তাতে শত আমেদ,—শত আশমান সুখে থাকতে পারে। তাতে সীমানা নিয়ে কোনো গোলমালের সম্ভাবনা নেই। যে হৃদয়ে মাতা ত্রিপুরার ঠাঁই, পত্নী কিশোরীর ঠাঁই, পুত্র অনুপের ঠাঁই,—সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের ঠাঁই, আমেদ সেখানে ঠাঁই নিয়েছে বলে আশমানের ভাববার কিছুই নেই, তার ঠাঁই কে নেবে? কেমন আমেদ! সে হৃদয়ে তোমার আমার দুজনের ঠাঁই হবে না?

আমেদ সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান কথাটী তাহার প্রাণে কি এক প্রতিধ্বনি তুলিল! সে আধ-আধ বুলিতে কি বলিতে লাগিল। মাতাই সর্ব্বাগ্রে সন্তানের অর্দ্ধস্ফুট বাণীর মর্ম্ম-গ্রহণ করেন। আশমান পুত্রের পানে চাহিয়া বলিল ,—বলো ত বাবা, সেই গানটা শুনিয়ে দেও ত—

হিন্দু-মুসলমান দুভাই সমান,
একই পিতার দুইটী সন্তান,
কেউ বলে খোদা, কেউ ভগবান,
দুয়ে এক করি শুনে এক কাণ,
দুই মার বুকে একই সুধা খায়,
এক মার বুকে হাসে খেলে গায়,
এক ডাকে মাকে ডাকে দুজনায়,

হয়ে একপ্রাণ রাখে মার মান,

দোঁহে দোঁহা তরে করে প্রাণদান।

আশমান বলিয়া যাইতেছিল আর শিশু আমেদ অতি গম্ভীরমুখে মাতার স্বরে স্বর মিলাইতে লাগিল। প্রেমিক সম্রাট্ অশ্রু-সিক্ত-লোচনে মাতা-পুত্রের সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছিলেন। তিনি ভাব-বিভোর হইয়া পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। কিন্তু সহসা কি একটা স্মৃতির দংশন তাঁহাকে যেন অস্থির করিয়া তুলিল! তাঁহার চিত্ত-ফলকে সেই সে দিনের—পুত্র অনুপের সহিত তত্ত্বকথাতৎপরা কিশোরীর গণেশজননী মূর্ত্তি দীপ্ত প্রতিভায় জাগিয়া উঠিল! তিনি আমেদকে বুক হইতে নামাইয়া দিয়া বলিলেন;— আশমান্! অনুপের বিয়ে,—রাজ্যাভিষেক। কিশোরী আমাকে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়েছে—এই দেখো—

বলিয়া কম্পিত হস্তে কিশোরীর লিখিত পত্রখানি আশমানতারাকে দিলেন। কক্ষতল নিস্তব্ধ! আশমান আগ্রহের সহিত পত্রখানি পুনঃপুনঃ পাঠ করিল। তাহার নেত্র-প্রান্ত বাহিয়া কয়েকটী মুক্তা ঝরিয়া পড়িল। সে জিজ্ঞাসা করিল;—তারপর—কি কর্ত্তব্য স্থির কচ্ছ?

সম্রাট্ বলিলেন;—কি যে কর্ব্বো কিছুই স্থির কত্তে পাচ্ছি না আশমান, আজ যেন আমি একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়েছি! মায়ের ভ্রূকুটী-ভয়াল রণোন্মাদিনী মূর্ত্তিতে একদিন আমি বিচলিত হয়েছিলাম বটে, কিন্তু তাতে আমি লক্ষ্য হারাই নি। আজ আমি একেবারে অধীর হয়ে পড়েছি! কিছুতেই আমি বুক বাঁধ্‌তে পার্চ্ছিনা! এ অভিমানের আমি কি সান্ত্বনা দেবো? এ পত্রের আমি কি উত্তর দেবো? কিছুই ত খুঁজে পাচ্ছিনা! সরলতার লাবণ্যময়ী প্রতিমা কিশোরী আমার,—আমি তাকে সর্ব্বস্বান্ত

করে,—আমি তার জীবনকে ব্যর্থ করে চলে এসেছি,—আজ আমি তার বুকের জলন্ত আগুনে লেখা এ পত্রের কি জবাব দেবো? আশমান! সখি আমার!—আমাকে পথ দেখাও,—আমি দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি। আজ তুমি আমার হাত ধরে নিয়ে চলো।

আশমান বলিল;—এই ত মিলনের একটা সুযোগ এসেছে সম্রাট্! চলো আমরা ভাদুড়ীচক্রে যাই। আমরা দুজনে উপস্থিত থেকে অনুপের বিয়ে দিয়ে, তাকে রাজগদীতে বসিয়ে আসি,—আর সেই সঙ্গে মায়ের পা দুখা'নি ধরে কেঁদে আসি,—সতীর নিকটও ক্ষমা ভিক্ষা করে আসি। সঙ্কোচ কর্ল্লে চল্‌বে না,—চলো আমরা যাই।

সম্রাট্ বলিলেন;—না আশমান, এ সুযোগ নয়, এযে দাবাগ্নির শেষ স্ফুরণ! এখন গেলেও আমরা ছাই হয়ে যাবো। আমরা এখন সেখানে উপস্থিত হলে সমস্ত উৎসব পণ্ড হবে। মায়ের অভিমান-বহ্নি দ্বিগুণ বিভায় জ্বলে উঠ্‌বে। কিশোরী যতই আহ্বান করুক্ না কেন,—আমাদের উপস্থিতিতে সে আরো কাতর হয়ে পড়্‌বে। আর আমরা সমাজের চক্ষে একটা প্রহসনের ঘৃণ্য ভূমিকার অভিনয় করে গৌড়ে ফিরে আস্‌বো। এমনো হয়ত হতে পারে,—আমরা গিয়েছি বলে, কোনো হিন্দুই ভাদুড়ীচক্রে অন্ন-জল গ্রহণ কর্ব্বে না। হিন্দু-মুসলমানে আবার একটা বিরোধের সৃষ্টি হবে। সে হয় না আশমান, আমাদের যাওয়া হতে পারে না।

আশমান বলিল;—কিন্তু পত্রের উত্তর দিতে হবে, নিমন্ত্রণ রক্ষা কত্তে হবে। অনুপের বিয়ে,—অনুপের রাজ্যাভিষেক,—আমাদের কত আনন্দের বলো দেখি? আমরা শুধু সেই অতীতের স্মৃতি নিয়ে, লোক-মন্তব্যের ভয়ে চুপ্ করে বসে থাক্‌বো! তা হবে না সম্রাট্, এ ত পরের কথা নয়! সমাজের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান যতই থাকুক্ না কেন,—আমরা ত তাকে পর

ভাব্‌তে পার্ব্বো না। পত্রের উত্তর দিতে তুমি যদি অসমর্থ হও,—আমিই পত্রের উত্তর দেবো, আমিই আমার পুত্রের জন্য যা কর্ত্তব্য পালন কর্ব্বো,—তোমার কিছুই কত্তে হবে না। এখনি আমি পত্রের জবাব লিখে দিচ্ছি। বলিয়াই আশমানতারা লিখিতে বসিল ;—

শ্রীযুক্তা মহারাণী নবকিশোরী দেবী সীতা-প্রতিমাসু

মহীয়সি,

মহিমান্বিত গৌড়-সম্রাটের নামীয় আপনার পত্রে পরম স্নেহাস্পদ পুত্র শ্রীমান্ অনুপনারায়ণ শর্ম্ম-খাঁর শুভ-পরিণয় ও ভাদুড়ীচক্রে পুণ্যাভিষেক সংবাদে আমরা পরম প্রীতিলাভ করিলাম। স্বর্গীয় মহারাজ গণেশনারায়ণ-প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে ও মসজিদে ভাবী রাজদম্পতির কল্যাণ-কামনায় নিত্য পূজা ও উপাসনার এবং বিবাহ ও অভিষেক-বাসরে দীনদুঃখীকে আহার্য্য, বস্ত্র ও পাথেয়াদি বিতরণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইল। আমাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ শ্রীযুক্ত রাজা জীবন রায় মহাশয় শ্রীমানের অভিষেক ও বৈবাহিক দ্রব্যাদি সহ যাইতেছেন। ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও, আমরা যে অনিবার্য্য কারণে আজ এই বাঞ্ছিত মিলনোৎসবে যোগদান করিতে পারিলাম না, তাহা আপনার অবিদিত নাই। সুদূর গৌড় হইতে দম্পতির শান্তিময় দীর্ঘজীবন সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি। সম্রাট্ যাইতে অসমর্থ বলিয়া বড় মুহ্যমান্ হইয়া পড়িয়াছেন, সে জন্য পত্রের উত্তর আমিই লিখিলাম। আপনার ঔদার্য্যের ছায়াতলে আশ্রয় দান করিয়া আমাদের শত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

আপনার আজ্ঞাধীনা স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী

আশমানতারা।

পত্র লেখা শেষ হইলে আশমান তাহা সম্রাট্‌কে পড়িতে দিল। সম্রাট্‌ অতি অন্যমনস্ক ভাবে পত্রখানি পড়িয়া সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলেন। আশমান বলিল,—তুমি অত চিন্তা কচ্ছ কেন? আনন্দের দিনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলো না,—তাতে পুত্রের অকল্যাণ হবে। আমি এখনি দেওয়ানজীকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

সম্রাট্‌ তখনও অন্যমনস্ক। আশমান অতি কাতরকণ্ঠে বলিল;—প্রভু, আশমানকে দূরে রেখে অত করে ভেবো না, তাকে তোমার ভাবনার—তোমার কষ্টের অংশভাগিনী করো।

সম্রাট্‌ কিছুই বলিলেন না,—শুধু আশমানকে বুকে টানিয়া লইলেন।

৩

কয়দিন ধরিয়া সপ্তদুর্গা তোলপাড় হইতেছে। অনুপের বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—আজ রাজ্যাভিষেক। ঊষালোকের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সপ্তদুর্গা পূর্ণ জাগরণে জাগিয়া উঠিয়াছে। সকলেই আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে প্রাসাদপানে ছুটিয়াছে।

রাণী ত্রিপুরার জরায় যৌবনের উত্তম ফিরিয়া আসিয়াছে। অবসাদ বা বিরক্তি আজ বিস্মৃতির অতল-তলে বিলীন। লোল-চর্ম্ম মুখ মণ্ডলে সার্থকতার স্বর্ণ-জ্যোতিঃ, চিন্তা-বিরল আস্য সদা-হাস্য-মণ্ডিত,—উৎসাহব্যঞ্জক বাক্যে মধুময়। করুণাময়ীর উচ্ছল করুণা আজ সমস্ত সপ্তদুর্গা প্লাবিত করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে কখনও রাণী রাজগদীতে বসিতেন না,—দরবারে পৃথক্ আসনে বসিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। আজ তিনি এক অঙ্কে তাঁহার প্রিয়তম অনুপ এবং অন্য অঙ্কে নববধূকে লইয়া সেই গদীতে উপবিষ্ট হইলেন। রাণী ত্রিপুরাদেবীর জয়,—মহারাজ অনুপনারায়ণ শর্ম্ম-খাঁ বাহাদুরের জয়—ধ্বনিতে দরবার-গৃহ পূর্ণ হইল।

অভিষেক-সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান শাস্ত্রোচিত নিষ্ঠার সহিত সমাহিত হইলে, মণিমুক্তা-মণ্ডিত করি-পৃষ্ঠে রাণী স্বয়ং রাজদম্পতিকে লইয়া নগর-

প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। ঘন ঘন দামামা-ধ্বনি, ঢক্কা-নিনাদ ও বিপুল জনতার নিঃশ্বাসে কোলাহলে সপ্তদুর্গার বাতাস গাঢ় হইয়া উঠিল।

অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার উন্মুক্ত। অন্ন, বস্ত্র, ভূমি, অর্থ প্রভৃতি অবিরাম বিতরিত হইতেছে। আদর, আপ্যায়ন কিছুরই ত্রুটী নাই। কত দরিদ্র ধনী হইল; কত ঋণী ঋণমুক্ত হইল; সমস্ত কয়েদী কারামুক্ত হইল এবং উপযুক্ত অর্থ ও পাথেয় সহ তাহাদিগকে গৃহে পাঠাইবার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত হইল। দাস-দাসী, আশ্রিত, অনুগত প্রভৃতি সকলকেই যথাযোগ্য পারিতোষিকে তুষ্ট করা হইল। অতিথি, আতুর, কাঙ্গাল, ভিক্ষুকের জয়-ধ্বনিতে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অধ্যাপক-মণ্ডলীর আশীর্ব্বাচনে, জ্ঞাতি-কুটুম্বের সন্তোষ-সূচক উল্লাস-বাণীতে সপ্তদুর্গার আকাশ পবিত্র হইল।

সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসবের পর সপ্তদুর্গা ক্রমশঃ নিস্তব্ধতার কোলে বিরাম-লাভের জন্য শায়িত হইল। একে একে অতিথি-অভ্যাগত সকলে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে ফিরিতে লাগিল। রাজা জীবন রায় মহাশয় গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তাঁহার মাসিমাতার নিকট বিদায় লইলেন। রাজমাতা নবকিশোরী তাঁহার মারফৎ বেগম-সাহেবা আশমানতারাকে উপঢৌকন পাঠাইলেন।

উপঢৌকন! কিশোরী আশমানকে কি উপঢৌকন দিবে? তাহার আর কি আছে? আশমানকে দিবার মত তাহার আর কি আছে? সে ত তাহাকে তাহার সর্ব্বস্ব দিয়াছে!—যাহার মূল্য জগতের মরকতে নাই, এমন কি, জীবনের বিনিময়েও যে সম্পদের মূল্য হয় না, তাহাই ত তাহাকে সে দিয়াছে! তবে সে আবার কি ঢৌকনে আশমানের নিকট লৌকিকতা-রক্ষার প্রয়াস পাইতেছে? পাগলিনী কিশোরী পাগলের মতই উপঢৌকন পাঠাইয়া আশমানতারাকে লিখিল;—

আশমানতারা

সুভাগিনি,—স্নেহের আশমান্,

ভগবৎ-কৃপায় ও তোমাদের আশীর্ব্বাদে শ্রীমানের বিবাহ ও অভিষেক-ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। তোমার প্রেরিত দ্রব্য-সম্ভারে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের সৌষ্ঠব-সাধন সম্যক্‌রূপেই হইয়াছিল। আশা করি, তোমার ও তোমার সম্রাটের কৃপা-কটাক্ষ একটাকিয়া-রাজ-কুল-প্রদীপের প্রতি চিরদিন এইরূপ অক্ষুন্ন থাকিবে;—কোনও প্রকার ঝড়-ঝঞ্ঝা তাহাকে পর্য্যুদস্ত করিবে না।

আমি তোমার সম্রাট্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম,—তুমি লৌকিকতা করিয়া আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ; সেজন্য প্রীতি-জ্ঞাপন আমার কর্ত্তব্য,—আমারও কিছু উপঢৌকন দিয়া সে লৌকিকতার সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়। তুমি সম্রাট্-মহিষী, আমি রাজমাতা। সুতরাং, দানের ন্যায় প্রতিদানও বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক হওয়াই উচিত।

কিন্তু বোন্‌টী আমার, আজ আমি তোমাকে কি উপহার দিব? আজ যে আমি একেবারে নিঃস্ব! তাহা হইলেও, আমি রাজমাতা, তোমাকে আমার কিছু দিতেই হইবে, নচেৎ তোমার সম্রাট্ ক্ষুণ্ন হইবেন। বুঝিয়া দেখিলাম,—আমার অলঙ্কার আর কেন? আমার বিচিত্র পরিচ্ছদের আর প্রয়োজন কি? আমার বিলাস-সুখ ত শেষ হইয়া গিয়াছে,—তবে আর কেন?—সেগুলি তোমাকেই পাঠাইলাম। আমার সৌভাগ্য-শশী আজ তোমার ভাগ্যাকাশে সমুদিত। সুতরাং, আমার সৌভাগ্য-সূচক যাহা তাহা তোমারই ব্যবহার্য্য। তুমি পরিধান করিও, তাহা হইলে, তোমার হতভাগিনী ভগিনীটীকে মধ্যে মধ্যে মনে পড়িবে;—তোমার সম্রাট্‌ও খুসী হইবেন।

বেশী কি লিখিব? লিখিতে ভরসা হয় না, পাছে পাগলের খেয়াল

বলিয়া উড়াইয়া দাও। সপুত্রক তোমরা কেমনটী হইয়াছ, দেখিতে বড় সাধ হয়। কিন্তু বোধ হয়, সে সাধ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আমি পরপারে যাত্রা করিব,—পিতার আহ্বান-বাণী শুনিতে পাইতেছি।

আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও। আমার সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছ, তাই পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিতেছি,—তোমার ভাগ্য-লক্ষ্মী অচঞ্চলা হউন্। ভাবী গৌড়-সম্রাট্‌কে – আমার পরম স্নেহের অনুপ-কল্প আমেদকে আমার আশীষ্ জানাইও। তাহার নিকট আমার পরিচয় দিও। তাহার ভাইটীর কথাও বলিও,—যেন বড় হইয়া তাহার সে কথা মনে থাকে।

বোধ হয়, এই আমার প্রথম ও শেষ পত্র। পত্রের উত্তর দিও না, কেননা, তাহা হইলে আমাকে প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে। শীঘ্রই যেখানে যাইতেছি, সেখানে পত্র যায় না; ফিরিবার সম্ভাবনাও নাই, সুতরাং, পত্র দিয়া লাভ কি? হতভাগিনীর অনুরোধ রাখিও,—তাহাকে ভুলিও না, তাহার পুত্রটীকে দেখিও।

আশীর্ব্বাদিকা—ভাগ্যহীনা
নবকিশোরী দেবী।

পুনশ্চ :—এই সঙ্গে তোমার সম্রাট্‌কেও একখানি পত্র দিলাম। একটু অনধিকার চর্চ্চা হইল। উন্মাদিনী ভগিনীর শেষ ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া স্বহস্তে এই পত্রখানি তাঁহাকে দিও এবং আমার হইয়া তাঁহাকে বলিও;—যেন কিছু মনে না করিয়া পত্রোক্ত বিষয়ের সুব্যবস্থা করেন।

নবকিশোরী।

কিশোরী সম্রাট্‌কে লিখিল ;—

আশমানের স্বামী,—গৌড়ের বাদসাহ,

জানিনা, আপনাকে আর কি সম্বোধনে সম্বোধিত করিব। আপনার সহিত এভাবে কখনও পত্র-ব্যবহার করি নাই, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

আপনি গৌড়ের সম্রাট্, সুবিচারক, তাই আপনার নিকট একটী নালিশ করিতেছি ; ভরসা করি, সুবিচার করিবেন। কিশোরীর স্বামী কিশোরীকে ফাঁকি দিয়া, কিশোরীর সর্ব্বস্ব লইয়া, কিশোরীর সহিত শেষ দেখা পর্য্যন্ত না করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। তিনি তখন গৌড়ের প্রজা ছিলেন, এখনও গৌড়েই আছেন। সুতরাং, তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিতে আপনার কোনও অসুবিধা হইবে না। শুনিয়াছি, আপনি সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা, যাহাতে এই অসামঞ্জস্যের প্রতিবিধান হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

কিশোরীর দাবি বিশেষ কিছু নাই। তাহার স্বামী তাহার যাহা লইয়া গিয়াছেন, তাহার কিছুই সে চাহে না, বা তিনি যে কায করিয়াছেন, তাহার শাস্তি-স্বরূপ তাঁহার প্রতি কোনও কঠোর আদেশও সে আপনাকে দিতে বলে না। সে বলিয়াছে,—যদি তিনি অপরাধ স্বীকার করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিবেন,—যেন তিনি কিশোরীর জন্য আর অনর্থক অশান্তি ভোগ না করেন, যেন এখন হইতে তিনি সুখী ও নিশ্চিন্ত হন।

আমি রাজমাতা হইয়া, এই আবেদনের সত্যতা-নিরূপণ-সূত্রে বিচারকালে আপনার মহামান্য দরবারে উপস্থিত হইতে পারিব না, সেইজন্য আপনার সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী আশমানতারা বেগমবাহাদুরাকে সুপারিশ্ ধরিয়া, তাঁহার হস্ত দিয়া এই আবেদন-পত্র আপনার সমক্ষে উপস্থাপিত

করিতেছি। কিশোরীরও সে ক্ষেত্রে উপস্থিতি ঘটিয়া উঠিবে না। পতিই সতীর গতি। কিন্তু কিশোরীর পতি কিশোরীকে ছাড়িয়া এত ছুটিয়া পলায়ন করিয়াছেন যে, কিছুতেই সে তাঁহার নাগাল্ ধরিতে পারে নাই এবং শেষে তিনি এমনই স্থানে পৌঁছিয়াছেন যে, সেখানে কিশোরীর যাইবার সাধ্য নাই। সে স্বপ্ন দেখিয়াছে, পরজগতে তাঁহার সহিত তাহার মিলনের সম্ভাবনা আছে। সেখানে নাকি জাতি-বিচার নাই, সুতরাং, মিলনের কোনও অন্তরায় ঘটিবে না। সেজন্য সে সেই বাঞ্ছিত মিলনের প্রত্যাশী হইয়া, তাহার গতি অন্তিমের পথে চালিত করিয়াছে; বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেও। অতি সত্বর সে তাহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে, সুতরাং, এখন ত আর তাহাকে ফিরাইয়া আনা যাইবে না! আপনি বিচক্ষণ, একজন স্বাধীন নরপতির জননীর লিখিত আবেদন-পত্র ও কিশোরীর স্বামীর মন্তব্য বুঝিয়া বিচার করিবেন। স্বামী জীবিত থাকিতে কিশোরী বিধবা হইল, এই বৈসাদৃশ্যের প্রতীকার করিয়া, আপনার বিশ্ব-বিশ্রুত সাম্য-ধর্ম্মের সার্থকতা রক্ষা করিবেন।

কিশোরী পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইয়াছে, আপনি তাহার স্বামীর নিকট হইতে এইরূপ স্বীকারোক্তি লিখাইয়া লইবেন,—এ জন্ম ত তাহার ব্যর্থই হইয়াছে, যেন জন্মান্তরে তাহার এরূপ কোনও ব্যর্থতা না আসে। আর যেন তিনি তাহাকে ফাঁকি দিয়া না যান, আর যেন তিনি তাহাকে না কাঁদান, এবার যেন তিনি কিশোরীকে তাঁহার চরণ-প্রান্তে স্থান দান করেন। আমারও বিশেষ অনুরোধ, মরণ-পথ-যাত্রীর এই শেষ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।

নিবেদিকা
সপ্তদুর্গার স্বাধীন নরপতির জননী।

৪

পত্র পড়িয়া, কিশোরীর উপঢৌকন দেখিয়া, আশমানতারা স্তম্ভিত হইল। এ কি মর্ম্মোচ্ছ্বাস, এ কি হৃদয়ের অভিব্যক্তি, অভিমানময়ীর এ কি প্রতিশোধ, ঔদার্য্য-মণ্ডিত এ কি ব্যবহার! সে শুধু সেই উপহার-স্তূপের মধ্যে বসিয়া, কিশোরীর পত্র দুইখানি বুকে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল।

প্রাণের আবেগ একটু প্রশমিত হইলে, তাহার দারুণ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল, সে সম্রাটের নামীয় পত্রের কি ব্যবস্থা করিবে? পত্রখানি সম্রাট্‌কে দিবে কি? উপঢৌকনগুলি সম্রাট্‌কে দেখাইবে কি? লুকাইয়া কোথায় রাখিবে? রাখিলেই বা চলিবে কেন? আশমান এতটা স্বার্থপর হইবে? তাহারই জন্য যে হৃদয় শ্মশান হইয়াছে, সে হৃদয়ের প্রতি তাহার কি কোনও কর্ত্তব্য নাই! আছে বই কি!

কিন্তু কি করিয়া সে সেগুলি তাঁহাকে দেখাইবে? নিমন্ত্রণ-পত্র-প্রাপ্তির দিন হইতে সম্রাট্ যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন। অত বড় দৃঢ়চেতা যেন একেবারে নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। সেই হইতে শারীরিক অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়,—মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত হৃৎ-স্পন্দনে তাঁহাকে অভিভূত করিতেছে। অনেক দিনের পর আজ তাঁহার মুখে একটু স্বস্থতার হাসি দেখা দিয়াছে। আবার যদি অসুখ বাড়ে! এ সময় চিত্ত-বিক্ষোভ ভাল নয়। আর দিন কতক যাক্। দিন কতক পরে দেখাইলে ক্ষতি

কি ? সন্দেহ আরও বাড়িবে, তিনি আরও উদ্বিগ্ন হইবেন। সে ত তাঁহাকে স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না! কিশোরীর পত্র, অন্য কাহারও নয়। সে তাহাকে যে বঞ্চনা করিয়াছে, কিছুতেই তাহা শুধ্‌রাইবার উপায় নাই। আবার বঞ্চনা করিবে! এত হৃদয়হীন সে কেমন করিয়া হইবে ?

পত্রে বিদায়ের শেষ-বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দেওয়ানজীও বলিয়াছেন, কিশোরী বেশী দিন বাঁচিবে না, তাহা শরীর বড়ই অসুস্থ। পত্র দিতে বিলম্ব হইলে যদি কোনও বিপদ ঘটিয়া যায়, তখন ত আর আপ্‌শোষের সীমা থাকিবে না! পত্রে যেন তাহার শেষ দেখা দেখিবার ইচ্ছা তাহার আশাহত চিত্তের উচ্ছ্বাসাচ্ছন্ন উক্তিতে পরিব্যক্ত। সতীর শেষ কামনা,—সে কেন বাধা হইবে ?

সে ত দেখা দিবার বিষয়ে কখনও বিঘ্ন-স্বরূপ হয় নাই। বরং, সে সকল সময় সাক্ষাতের পক্ষ সমর্থন করিয়াই আসিয়াছে। সে নিজেকে সমস্ত বৈষম্যের হেতুভূত ভাবিয়া, নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, সেই অপরাধ-ক্ষালনের জন্য বেদনাতুর চিত্ত দুইটীর সম্মুখে লুণ্ঠিত হইতে প্রতিনিয়তই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তাহার দোষ কি ? ঘটনাচক্রে প্রতিবন্ধ আসিতেছে, প্রতিবন্ধে প্রতিবন্ধে অবসরও ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। আর বিলম্ব করিলে চলিবে কেন ?

সে এইবার শেষ প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, যদি একটীবার একদণ্ডের জন্যও অন্ততঃ চাক্ষুষ মিলনও ঘটাইতে পারে। হয়ত তাহাতে সম্রাট্‌ও সুস্থ হইতে পারেন, হয়ত অভিমান আংশিকও প্রশমিত হইলে, সাধ্বীর জীবন দুইদিন টিকিয়া যাইতে পারে। সে শুনিয়াছে, রাণী পৌত্র অনুপের উপর তাঁহার সমস্ত পুত্র-স্নেহ ন্যস্ত করিয়া কতকটা শান্ত হইয়া-

ছেন। এক্ষণে তাঁহার শরণাগত হইলে তাঁহার করুণা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য না হইতেও পারে।

আশমান স্থির করিল, সে আজই যে কোনও উপায়ে সপ্তদুর্গা-যাত্রার সম্মতি সম্রাটের নিকট যাজ্ঞা করিবে, আজই যাইবার দিনস্থির করিবে। সম্রাট্ স্বীকৃত হইলে তখন সে কিশোরীর পত্র ও উপহারাদি তাঁহাকে দেখাইবে। সম্রাট্ও মিলনের পক্ষপাতী। শুধু সঙ্কোচ ও অভিমানরূপ দুই বাহু এই মিলনের পরিপন্থীরূপে দুই পক্ষকে দুই দিকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে এবং সেই সঙ্কোচের বিষম ঝাঁকুরানিতেই সম্রাটের চিত্ত ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। আজ সে সেই সঙ্কোচের প্রতিষেধ করিবেই। সম্রাট্ যাত্রার যতগুলি বিরুদ্ধ কারণ দর্শাইতে পারেন, তখন সে মনে মনে সে গুলি সংগ্রহ করিয়া ফেলিল এবং নিজে প্রশ্ন করিয়া সে গুলিকে একে একে খণ্ডন করিল। অবশেষে তাহার আর কোনও সংশয় রহিল না,—সে সিদ্ধান্ত করিয়া লইল, —সম্রাট্ এবার আর কিছুতেই অমত করিতে পারিবেন না,—বরং, মিলনাশায় তাঁহার হৃদয় অনেকটা দৃঢ় হইবে। সেই সময় তাঁহাকে পত্রাদি দেখাইলে হৃদয়ের ব্যথা সেই মিলনাকাঙ্ক্ষাকে আরও বেশী আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিবে। তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

সে তখনই উপহারগুলি ও পত্র দুইখানি গুছাইয়া সম্রাটের অদৃশ্যস্থানে রক্ষা করিল ও অতি ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

৫

আশমানের চেষ্টা এবার কিন্তু ব্যর্থ হইল না,—সম্রাট্ স্বীকৃত হইলেন। তবে প্রকাশ্যে নয়, গোপনে, জলভ্রমণচ্ছলে, অতি অতর্কিত ভাবে তিনি সপ্তদুর্গায় যাইবেন স্থির হইল। আশমান ও আমেদ সঙ্গে থাকিবে।

সম্রাট্ রাজকার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, ওদিকে বজরা সজ্জিত হইতে লাগিল। সম্রাটের ফিরিতে মাসাধিক বিলম্ব হইতে পারে,—সুতরাং, সব ঠিক-ঠাক করিয়া লইতে একটু সময় লাগিল।

ক্রমে বর্ষা আসিয়া পড়িল। বর্ষাতেই নৌকাযোগে সপ্তদুর্গায় যাতায়াত সুবিধাজনক। একদিন নিরুপদ্রুত মেঘশূন্য সন্ধ্যার শুভ সুযোগে কলনাদিনী মহানন্দার বক্ষে দুইখানি বিশাল বজরা ও তদনুগামী কতিপয় ছিপ্ চলন-বিলের দিকে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল।

নদীপথে আসিতে বিশেষ অসুবিধা হইল না। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিপাত ও কনকোজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে কয়েক দিন বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে বজরা চলিতে লাগিল। মানসিক উদ্বেগ সত্ত্বেও দিনগুলি সম্রাট্-দম্পতির পক্ষে এক প্রকার সুখেই কাটিতে লাগিল।

ক্রমে বজরা চলন বিলে আসিয়া পড়িল। বর্ষাও একটু অনুভবযোগ্য আড়ম্বরের সহিত নামিয়া আসিল। চলন বিল বটে,—কিন্তু বর্ষায় একটী বিশাল হ্রদ বলিলেও চলে। বহুতর নদী-শাখানদী এই হ্রদে আসিয়া লীন হইয়াছে। নাভি-গভীর উত্তাল-তরঙ্গময় প্রকাণ্ড জলরাশি দিক্-চক্রবালে

গিয়া আকাশ চুম্বন করিতেছে। বজরা সেই হ্রদের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপরাণী সপ্তদুর্গা অভিমুখে নাচিতে নাচিতে ধাবিত হইতেছে। হ্রদের কূল-কিনারা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চতুর্দ্দিকে শুধু উচ্ছল জলের কল-কল্লোল,—বায়ু-সন্তাড়িত ফেনিল বীচি-বিভঙ্গ। ঊর্ম্মিমালা যেন বজরার গতি প্রতিহত করিবার জন্যই স্ফীত-গর্ব্বে তাহার গাত্রে আসিয়া আছাড় খাইতেছিল।

আকাশ কয়দিন ঘন-ঘটাচ্ছন্ন। কখন্ বা টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, কখন্ বা নিবিড়তর অন্ধকার দিবসেই সন্ধ্যার সূচনা করিতেছে আর উন্মত্ত ব্যাত্যার সহিত মুষলধারে বারিপাত হইতেছে। দুর্য্যোগ বুঝিয়া মাঝিরা অতি সাবধানে নিকটতর তীর বাহিয়া বজরা চালনা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে বিপদের বিশেষ আশঙ্কা হইলে নঙ্গর মারিতেছিল।

আশমান চলনের এ ভৈরবী-লীলা কখনও দেখে নাই। সে স্ফটিকা-বৃত ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথ দিয়া সেই তাণ্ডব নৃত্য দেখিতেছিল, কখন্ বা হ্রদ-বক্ষ-সন্নদ্ধ গগনচুম্বী জলস্তম্ভের পানে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া, অতি কৌতূহলাবিষ্ট ভাবে সেই নৈসর্গিক হস্তী-শুণ্ডের বিষয় সম্রাট্‌কে জিজ্ঞাসা করিতেছিল;—সম্রাট্‌ও বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তির সহিত প্রাবৃটের সলিল-সংগ্রহ-প্রণালীর বিষয় অতি বিশদভাবে আশমানকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন।

তিন চারি দিন নিশাযোগে নৌকা-চালনা একেবারে দুঃসাধ্য হইল। সন্ধ্যা হইতে না হইতে সূচীভেদ্য তিমিরাবরণে চলনের বক্ষঃ ছাইয়া যাইতে লাগিল। সে কয়দিন সূর্য্যদেব কখন্ কোন্ পথে উদিত হইয়া কোন্ পথে অস্ত-গমন করিতেছেন তাহার সময় ও দিক্ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠিল।

তিন চারি দিন পরে একদিন বৈকালে আকাশ নির্ম্মল হইয়া গেল। মৃদু মন্দ দক্ষিণা বাতাস বহিতে লাগিল। মাঝিরা বুঝিল, আর ভয় নাই। তখন বজরা সপ্তদুর্গার অনেক নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি চলিলে প্রভাতেই বজরা দুর্গ-পরিখায় ভিড়িবে।

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। নির্ম্মেঘ গগনতলে চন্দ্রদেব যেন শারদ-সুষমা লইয়াই হাসিতে লাগিলেন। ঈষচ্চঞ্চল চলন-বক্ষে কোটী কোটী খণ্ড শশধর প্রতিফলিত হইয়া চাঁদের হাট বসিল। বজরা আজ অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি বজরার অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া ছলাক্-ছলাক্ শব্দ করিতেছিল।

কিন্তু সম্রাটের চাঞ্চল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। শত চেষ্টাতেও তিনি যেন আজ তাঁহার বিদ্রোহী হৃদয়কে বশীভূত করিতে পারিতেছিলেন না। কি এক অব্যক্ত মর্ম্ম-জ্বালায়, ব্যর্থ অনুশোচনায় তাঁহার চিত্ত খাক্ হইয়া যাইতেছিল এবং সদ্য-দগ্ধ-দেহে সলিল-সিঞ্চনের ন্যায়ই তাঁহার প্রচেষ্টা নিবৃত্তির সন্ধান দিতে গিয়া দ্বিগুণ প্রদাহের সৃষ্টি করিতেছিল।

যন্ত্রণায় একান্ত অধীর হইয়া সম্রাট্ বজরার বহির্ভাগে আসিলেন। আশমান অক্লান্তচিত্তে সম্রাটের পরিচর্য্যা করিতেছে। দাস-দাসী সকলেই নিদ্রিত। কয়দিন অবিশ্রান্ত উদ্বেগ ও উদ্যমে ক্লান্ত হইয়া, আজ নাবিকের মধ্যে অনেকেই সুপ্তিমগ্ন; কেবল দুই একটী মাঝি জাগিয়া হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। বজরা অনুকূল মৃদুল বাতাসে পাইল-সাহায্যে সপ্তদুর্গা পানে ঈষদ্‌দ্রুত ছুটিয়াছে। সম্রাট্ বাহিরে আসিতেই আশমান নিজেই গালিচা আনিয়া মুক্তস্থানে বিছাইয়া দিল।

সম্রাট্ উপবেশন করিতে করিতে আশমানতারাকে বলিলেন,—তোমার সারঙ্গটী নিয়ে এসো আশমান,—আজ মন বড়ই চঞ্চল। অনেক

দিন তোমার মধুর সান্ত্বনাপূর্ণ সঙ্গীত শুনি নি। আজ অপরাহ্নে আমার তন্দ্রার অবসরে তুমি যে গানটী রচনা করে গুন্ গুন্ করে গাইছিলে,—আমি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম,—বেশ গানটী—গাও দেখি শুনি,—যদি একটু শান্ত হতে পারি।

আশমান দ্বিরুক্তি করিল না,—ধীরে ধীরে সারঙ্গটী আনিয়া তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া ভাব-বিভোর অমৃতময় কণ্ঠে গাহিল ;—

বিষাদ-মগন কেন ?—কেন অশ্রুভরা আঁখি ?
হৃদয়-গগনখানি মেঘ-হারা হবে নাকি ?
বরিষণ গেছে থেমে,
হৃদ-জল নাচে প্রেমে,
বেদন-স্পন্দন কেন তব বুকে থাকি থাকি ?
শেষ-প্রায় অভিমান,
কেন গো আকুল প্রাণ ?
নাহিত নাহিত সখা, মিলনের বেশী বাকি !—
এস প্রিয় হিয়া-মাঝে,
দেখি কোথা ব্যথা বাজে,
জুড়ায়ে দি সব জ্বালা হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি।
আশাভরা হাসিমুখে,
চল গো চল গো সুখে,
সুখী হতে সেধেছে সে,—সুখেতেই নেবে ডাকি ;—
সুখে তারা আশমান
গাহিবে বিজয়-গান,
প্রেমে ভেসে যাবে মান,—বিরহ পড়িবে ফাঁকি।

গান থামিল। সম্রাট্ অনেকক্ষণ ধরিয়া মৌন রহিলেন,—আশমানও চুপ্ করিয়া রহিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রদেব চলনের জলে ডুবিয়া গেলেন। আশমান অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল;—রাত্রি অধিক হয়েছে,—ভিতরে চলো,—একটু ঘুমুবে। এই বলিয়া সে সম্রাটের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে তাঁহার অসংযত কেশগুলি মস্তকের দুই পার্শ্বে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিল। সম্রাট্ সস্নেহে আশমানের চিবুক স্পর্শ করিলেন। পরে বলিলেন;—না—আশমান, আজ আর আমি ভিতরে যাবো না। ঘুম আজ আর আমার হবে না,—কেমন যেন গরম বোধ হচ্ছে। ভিতরে আরো গরম। তোমার ক্লান্তিবোধ হয়েছে,—যাও, ভিতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করো।

আশমান উঠিল না। সম্রাট্ আশমানের পানে চাহিলেন। সে বলিল;—আমার জন্য চিন্তা কি? আমি একটুও ক্লান্ত হইনি। তোমার গরম বোধ হচ্ছে,—আমি বরং বাতাস করি, তুমি আমার কোলে মাথা রেখে একটু শোও দেখি,—ঘুম আস্‌বে এখন।

সম্রাট্ তাহাই করিলেন। আশমান বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সম্রাট্ বলিলেন;—আজ আর চুপ্ করে থাক্‌তে ইচ্ছা কচ্ছে না,—ভাবনা যেন স্তূপে স্তূপে চেপে আস্‌ছে। তার চেয়ে আমি গল্প বলি,—তুমি শোনো,—কেমন?

আশমান বলিল;—বেশ ত—বলো। সপ্তদুর্গায় যাচ্ছি,—ঐ সপ্তদুর্গার কথাই বলো,—আমি খুব মন দিয়েই শুন্‌ছি।

তখন সম্রাট্ ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাল্য-লীলা-স্থলীর কথা, তাঁহার কৌমার ও কৈশোর লীলার কথা, তাঁহার শৈশবসঙ্গীর কথা, তাঁহার

সহপাঠিগণের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃদেবের রাজ-কার্য্য-পরিচালনা, মাতৃদেবীর হিন্দু-মুসলমানের প্রতি নিরপেক্ষ করুণা ও তাঁহার ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠা, ভাদুড়ীবংশের সহিত গৌড়-মসনদের ঘনিষ্ঠতা, সাঁতোড় ও ভাদুড়ীচক্রের দ্বন্দ্ব, কিশোরীর সহিত তাঁহার পরিণয়ে বিরোধের পরিসমাপ্তি, কিশোরীর প্রেম ও সরলতা, অনুপের জন্ম ইত্যাদি বিষয় অনর্গলভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন আর কখন্ বা আনন্দে উচ্ছসিত, কখন্ বা দুঃখাতিশয্যে কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আশমান তাঁহাকে শান্ত করিবার প্রয়াস করিলেই তিনি এই বলিয়া নিরস্ত করিলেন;—ভীত হয়ো না আশমান, এতে আমার বুকের বোঝা অনেক হাল্কা হয়ে যাচ্ছে,—ভালই হচ্ছে। আহা! অতীতের স্মৃতি কত মধুর!

আশমান চুপ্ করিয়া শুনিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঊষার সূচনা হইল। পূর্ব্বাকাশে অরুণিমা উঁকি মারিল। মন্দানিল-স্পর্শে সারানিশি-জাগরণ-ক্লান্ত আশমানের ক্ষুদ্র দেহখানি একটু তন্দ্রাবেশে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সহসা সেই অবসাদ-জড়িত স্তব্ধতার মাঝখানে সম্রাট্ ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিলেন ও আবেগপূর্ণ ঈষদুচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন;—

আর ঘুমিয়ো না আশমান! চেয়ে দেখো,—আমরা এসে পড়েছি। ঐ অদূরে সপ্তদুর্গার সৌধ-চূড়া দেখা যাচ্ছে। ঐ প্লাবিত-পরিখা-সংলগ্ন সু-উচ্চ দুর্গ-প্রাচীর,—ঐ সাত-সাতটী দুর্গ-শিখরে একটাকিয়ার অধীশ্বর আমার প্রাণাধিক অনুপনারায়ণ শর্ম্ম-খাঁ বাহাদুরের স্বাধীনতা-চিহ্নিত বিজয়-পতাকা অম্লানগর্ব্বে পত্ পত্ উড়্ছে। ঐ—ঐ শোনো,—একটু কাণ পেতে থাকো;—এখনি মা-ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে প্রভাতী বাজনা বেজে উঠ্বে। এখনি চলনের কালো জল সেই পূত বাদ্যের তালে তালে

নৃত্য কৰ্ত্তে থাক্‌বে। আশমান! আমার যে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছা কচ্ছে—আশমান—

আশমান ইতিমধ্যে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া লইয়াছে। সম্রাট্ উচ্ছ্বাসভরে বজরার কিনারায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আশমান তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। দুইজনই একাগ্র দৃষ্টিতে সপ্তদুর্গার তীর পানে চাহিয়া!

বজরা আরও নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু তীরে ও কি চাৎকার!—ও কি লোমহর্ষণ-ধ্বনি! সম্রাট্ শিহরিলেন, আশমানও শিহরিল। সম্রাট্ ভীত আকুল কণ্ঠে কহিলেন;—ও কি শব্দ আশমান! ওই ত শ্মশান,—ধূম-শিখা উঠ্‌ছে,—চিতা-ধূমের চন্দন-গন্ধ নাকে লাগ্‌ছে না? কে—কে ও—কার আশমান!

আশমান ব্যস্ত ভাবে ডাকিল;—রুস্তম্!

নেপথ্যে ধ্বনিত হইল;—বান্দা হাজির, কি হুকুম?

আশমান বলিল;—এখনি সন্ধান নেও,—ঐ শ্মশান।

তীরবেগে ছিপ্ ছুটিল, তড়িতের ন্যায় সংবাদ আসিল;—রাজমাতা নবকিশোরী আর নাই, গত রাত্রে সব শেষ হয়ে গেছে!

সম্রাট্ মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। আশমান বুক পাতিয়া সম্রাটের অবসন্ন দেহ জড়াইয়া ধরিয়া, মাঝিদিগকে ডাকিয়া বলিল;—সপ্তদুর্গায় আর যেতে হবে না, বজরা ফিরিয়ে গৌড়ে নিয়ে চলো। দেরী নয়,—এখনি।

তখনই হাকিমের তলব হইল, সম্রাটের মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা চলিতে লাগিল।

বজরা গৌড় অভিমুখে রওনা হইল।

৬

দুঃখের কাহিনী আর বিবৃত না করিলেই ভাল হইত, কেবল আশমানের কর্ত্তব্য এখনও কিছু বাকি বলিয়া, আরও কিছু দূর অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে হইল।

সম্রাট্ আরও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। কেবল আশমানতারার সেবা-পরিচর্য্যায় ও প্রতিক্ষণ অবিরত চিত্ত-বিনোদন-চেষ্টায় অনুতপ্ত সম্রাটের দুর্ব্বহ জীবন কোনও ক্রমে দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিল। তাঁহার অসুস্থতার প্রথমাবস্থা হইতেই, সেনাপতি কাসেম খাঁর সাহচর্য্যে আশমান নিজেই রাজকার্য্য পরিদর্শন করিত, মাত্র বিশেষ কোনও জটিল বিষয়ের সময় সম্রাটের উপদেশ লইত।

কিন্তু জীর্ণ পিঞ্জর কতদিন টিকিতে পারে? সম্রাটের ভগ্ন স্বাস্থ্য ত আর শুধ্রাইল না! আশমানও বুঝিতে পারিল,—আর বেশী দিন নয়,—সম্রাটের আয়ুষ্কাল ক্রমশই পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। পুত্র আমেদ তখনও বালক,—মাত্র দ্বাদশ বৎসরের। কিন্তু আশমান তাহাতে বিচলিত হইল না,—নিজের উপর বিশ্বাস হারাইল না। ভাই কাসেম আছে, ভয় কি? সম্রাট্ চলিলেন,—তাহার হৃদয় আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া কাঁদিল। কিন্তু সে হৃদয়কে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিল,—সে তাঁহার নিকটে যথেষ্টই পাইয়াছে। এই কয়েক বৎসর ধরিয়া সতী তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে সাধ্বী কিশোরীর শেষ-বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেই হইবে।

সে কাঁদিবে,—আজীবন সম্রাটের পুণ্য-স্মৃতি লইয়াই কাঁদিবে,—তবু সে সেই বাঞ্ছিত মিলনের অন্তরায় হইয়া, যাত্রা-পথের কণ্টক-স্বরূপ হইয়া, সম্রাটের জীবনকে স্বার্থ-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার ব্যর্থ-চেষ্টা করিবে না।

সম্রাটের গণা দিন যতই ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, সে তাহার মায়া-বন্ধন ততই শ্লথ করিতে লাগিল। একদিন সম্রাট্ বলিলেন;—একি আশমান!—ক্রমশঃ বিলাস ত্যাগ কচ্ছ কেন?—ব্যাপার কি?

আশমান একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অকপটে বলিল;—আর বিলাস ত শেষ হতে চলেছে, যাঁর জন্য বিলাস,—তিনি আজ মহামিলনের পথিক। আমি আর কার জন্য—বলিতে বলিতে কয়েক বিন্দু অশ্রু আশমানের গণ্ড অভিষিক্ত করিল। শয্যাশায়ী সম্রাট্ আশমানের পানে নীরবে চাহিয়া রহিলেন;—তাঁহারও চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া উপাধান সিক্ত করিল। আশমান সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিল না; সে ছুটিয়া পলাইল। তখনই আমেদ আসিয়া সম্রাটের পার্শ্বে বসিল। সম্রাট্ পুত্রের হাত খানি নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহাকে নানা প্রসঙ্গের উপদেশ দিতে দিতে অন্যমনস্কতার মধ্যে কতকটা সুস্থ হইলেন।

* * * * *

কিন্তু ক্রমে সেইদিন আসিল,—যেদিন সকলেরই একবার করিয়া আসে। হিজরী ৮১২ সালে গৌড়ের কোনও এক অশুভ দিবসে, ভাতড়ীবংশের বীর-সন্তান যদুনারায়ণ, হিন্দু-মুসলমানে সাম্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, গৌড়ের বাদসাহ জালালুদ্দিন তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী আশমানতারার কোলে মস্তক রক্ষা করিয়া, সাহজাদা আমেদকে বিশ্বস্ত সেনাপতি কাসেমখাঁর হস্তে অর্পণ করিয়া, আশমানের মুখপানে নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া আশমানেই বিলীন হইলেন। দেহাবসানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখ হইতে মাত্র এই কয়টী

বাণী নির্গত হইল;—**কাসেম—আশমান—হিন্দু—মুসলমান—এক—ভগবান—অনুপ—আমেদ—সমান—সমান**……

এই পর্য্যন্ত,—সব শেষ।

*   *   *   *   *

সমারোহে সমাধি হইল,—প্রাসাদ-সংলগ্ন সেই উদ্যানে,—আশমানের পিতা আজিম সাহের সমাধি-পার্শ্বে। সমগ্র গৌড় শোক-সাগরে মগ্ন হইল। সে যে কত বড় শোক,—গৌড়বাসীই তাহা বুঝিয়াছিল।

*   *   *   *   *

সংবাদ সপ্তদুর্গায় পৌঁছিল। অনুপ কাঁদিয়া অধীর হইল। আর বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরাদেবীর চক্ষু দিয়া রক্ত গড়াইল, তাহা অশ্রু নয়,—রক্ত!

অনুপ পিতৃকৃত্যে প্রস্তুত হইল। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রমতে পিতার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে একবার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বহু বাক্-বিতণ্ডার পর পণ্ডিতগণ গয়ায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা দিলেন। অনুপ রওনা হইল,—রাণী ত্রিপুরাদেবীও চলিলেন,—তিনি নিজেই অনুপের যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া, অনুপের হাত ধরিয়া নৌকায় উঠিলেন।

এদিকে আশমানতারার ইচ্ছাক্রমে সম্রাটের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে, পাটনায় একটী মসজিদ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আশমানও আমেদকে লইয়া নিজে উপস্থিত থাকিয়া, মসজিদ-উৎসর্গ ও তাহার দ্বারোদ্‌ঘাটনের জন্য পাটনা যাত্রা করিল।

*   *   *   *   *

যথাকালে অনুপ পিণ্ডদান করিয়া ফিরিয়াছে। ভাগীরথীর পূত বক্ষঃ বাহিয়া তাহার বজরা বাঙ্গালা-পানে ছুটিয়াছে। পথিমধ্যে একদিন—

এক শুভ সন্ধিক্ষণে একখানি সুবিশাল বজরা আসিয়া তাহাদের বজরার গায়ে ভিড়িল।

অনুপ ভিতরে ছিল। অত্যধিক কৌতূহলবশে, কাহাকেও কোনও প্রশ্ন না করিয়া, সে বাহিরে আসিল। অমনি অন্য বজরাস্থ কাহার অনুজ্ঞাক্রমে একটী দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক সুন্দর বালক অনুপের বজরায় আসিয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, সুন্দর মুখখানি তাহার বিস্মিত দৃষ্টিতলে রাখিয়া মধুর কণ্ঠে ডাকিল ;—ভাই অনুপ—ভাই—

অনুপ দেখিল,—যেন তাহার মুখখানিরই মত মুখখানি! তাহার ভাই-ই ত বটে! আবার দেখিল,—অন্য বজরায় দাঁড়াইয়া,—এক অলঙ্কার-লেশ-রহিতা, বিষাদময়ী লাবণ্য-প্রতিমা,—মাতৃত্বের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি!

মূর্ত্তিতে বাণী স্ফুরিল ;—বাবা অনুপ! আমি তোমার মা,—আমেদ তোমার ছোট ভাই!

অনুপের আর কোনও সন্দেহ রহিল না। সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সস্নেহে ডাকিল ;—ভাই আমেদ,—আমেদ, ভাই—ভাইটী আমার—

ইতিমধ্যে পুত্র-যুগলের মাতা এ বজরায় আসিয়াছেন। অনুপ মস্তকে তাহার মধুর কর-স্পর্শ পাইয়া, রোমাঞ্চ-দেহে নতজানু হইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিল ;—মা—মা আমার—

বৃদ্ধাও আর থাকিতে পারিলেন না। সহসা অনুপের বহির্গমন ও তাহার পর হইতে—মা!—অনুপ!—আমেদ! ইত্যাদি মধুর আহ্বানসূচক অস্পষ্ট ধ্বনি, তাহার বধিরপ্রায় কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া কেমন এক ঔৎসুক্যের সঞ্চার করিল।

কেরে অনুপ,—কারা এসেছে রে?—বলিয়া তিনি বাহিরে আসিতেই, সেই মাতৃ-মূর্ত্তি তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া, অতি কাতর

কণ্ঠে বলিল ;—মা! ক্ষমা করো মা! মা-হারা আশমানকে একদিন তুমি কোলে নিতে আগ্রহ জানিয়েছিলে,—আজ তার সমস্ত অপরাধ ভুলে গিয়ে তাকে পায়ে ঠাঁই দেবে না মা!

বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরাদেবী আশমানের হাত ধরিয়া উঠাইতে উঠাইতে গাঢ়স্বরে বলিলেন ;—সবই ত ফুরিয়ে গেছে,—আশমান,—মা আমার, আছি আমি,—আর আছিস্ তুই। আর কেন?—আয় মা—আয়—তাদের জন্য কাঁদিগে আয়। আজ আর পায়ে কেন?—আমার বুকেই আয় মা!—

বলিয়া বৃদ্ধা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হাত বাড়াইলেন। আর আশমান তাঁহার বুকে মাথা লুকাইল। আমেদ আসিয়া রাণীর চরণ-স্পর্শ করিল, রাণী তাহাকেও বুকের দিকে টানিয়া লইয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অনুপ আশমানের হাত ধরিয়া বলিল ;—মা! এখন আমরা দুভাই কিন্তু সাতগড়ায় যাবো,—সাতগড়া হয়ে তারপর গৌড়। তোমাকেও ছাড়্‌ছি না। কেমন ঠাকু-মা!—কেমন ভাই!

আমেদ সোৎসাহে বলিল ;—হাঁ—ভাই!

রাণী তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তিনি আশমানকে বলিলেন ;—চল্ মা চল্—ছেলেদের আব্‌দার রাখ্‌তে সাতগড়ায় আগে চল্। অনুর আমার বউ দেখ্‌বি না?—তোর বউমাকে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বি না?—আদর কর্ব্বি না?

আশমানের না বলিবার কিছুই ত ছিল না!

অনুপের বজরাতেই সকলে রহিলেন। সুরধুনীর পূতত রঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে অনুকূল বায়ুভরে বজরা ছুটিয়াছে। সেই নৃত্যের

তালে তালে সুকণ্ঠ আমেদের কণ্ঠে সেই মধুময় মিলন-গীতি উত্থিত হইল ;—অনুপও স্থির থাকিতে পারিল না,—আমেদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সেও গাহিল ;—

হিন্দু-মুসলমান দুভাই সমান,
একই পিতার দুইটী সন্তান,
কেউ বলে খোদা, কেউ ভগবান,
দুয়ে এক করি শুনে এক কাণ।
দুই মার বুকে একই সুধা খায়,
এক মার বুকে হাসে খেলে গায়,
এক ডাকে মাকে ডাকে দুজনায়,
হয়ে এক প্রাণ রাখে মার মান,
দোঁহে দোঁহা তরে করে প্রাণ-দান।